বিহাইন্ড ফেমিনিজম

নারীবাদের বাস্তবতা

অনুবাদ ও সংকলন
মারিয়াম তানহা

যাদের প্রবন্ধ-নিবন্ধ অবলম্বনে সংকলনটি তৈরি—

১। ড্যানিয়েল হাকিকাতজু
লেখক, দাঈ The Muslim Skeptic এবং সহ-প্রতিষ্ঠাতা, Alasna Institute.

২। উম্মে খালিদ
মা, লেখিকা এবং ইন্সট্রাক্টর, Alasna Institute.

৩। জারা ফারিস
গবেষক, লেখক, এবং আন্তর্জাতিক বক্তা, Muslim Debate Initiative (MDI).

৪। নুর গোডা
প্রাক্তন নারীবাদী। লেখিকা, এবং হোস্ট, Between Arabs.

৫। শাইখ আবু নাওয়ার
ইঞ্জিনিয়ার ও ইমাম, যুক্তরাষ্ট্র

৬। শাইখ আবু কাতাদাহ
সালাফি স্কলার, জর্ডান

৭। আবদুল্লাহ আল-আন্দালুসি
ইন্সট্রাক্টর এবং অক্সিডেন্টলজির ডিপার্টমেন্ট হেড, The Quran Institute (TQI), এবং সহ-প্রতিষ্ঠাতা, The Muslim Debate Initiative (MDI).

বিহাইন্ড

ফেমিনিজম

নারীবাদের বাস্তবতা

সংকলন ও অনুবাদ

মারিয়াম তানহা

সম্পাদনা

ইরফান সাদিক

পাবলিকেশন্স

সূচিপত্র

প্রকাশকের কথা

বিশ্বজুড়ে নারীবাদী আন্দোলন জনপ্রিয় হয়ে উঠে যদিও উনিশ শতকের দিকে; তবে এর উৎপত্তি মূলত আরও কয়েকশত বছর আগের ইউরোপের সামাজিক প্রেক্ষাপটে। যেখানে নারীর সামাজিক মর্যাদা ও অধিকারের ন্যূনতম বালাই ছিল না। নারীর সাথে আচরণ করা হতো কৃতদাসীর মতো, বাজারে বিক্রি হতো নারী। কিন্তু সেই সময়ের মুসলিমবিশ্বের নারীদের অবস্থা ছিল ইউরোপীয় নারীদের জন্য ঈর্ষার কারণ। ১৮ শতকের ইউরোপীয় পর্যটক, নাট্যকার ও লেখিকা লেডি এলিজাবেথ কর্তৃক তৎকালীন তুর্কি নারীদের সম্পর্কে একটি বিবরণ থেকে এমনটাই অনুমেয় হয়। মূলত ইসলাম তার জন্মলগ্ন থেকেই নারীর সামাজিক মর্যাদা ও অধিকারের বিষয়ে যারপরনাই গুরুত্ব দিয়েছে। ইতিহাসের পাতায় পাতায় রয়েছে এর জ্বলজ্যান্ত সাক্ষী।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, ইউরোপের নারীবাদী আন্দোলন মুসলিম ভূখণ্ডে কেন ছায়া বিস্তার করল? কোন প্রেক্ষাপটে? মূলত মুসলিম ভূখণ্ডে ইউরোপের শত বছরের বেশি ঔপনিবেশিক শাসন এই ভূখণ্ডগুলোকে মধ্যযুগীয় ইউরোপের দিকে টেনে নিয়ে গেছে। ফলে তৎকালীন ইউরোপ নিজেকে পরিশুদ্ধ করতে যেসব মতবাদ তৈরি করেছিল, উপনিবেশিত মুসলিম জনগোষ্ঠীও সেইসব মতবাদের মধ্যেই নিজের মুক্তি খুঁজতে শুরু করেছে। এরই নাম দেওয়া হয়েছে প্রগতিশীলতা। এই চিন্তাই মূলত উত্তর ঔপনিবেশিক মুসলিমদের সামগ্রিক উন্নতির পথে সবচেয়ে বড় বাধা হিসেবে কাজ করছে, এখন অবধি।

ফেমিনিজম। নারী অধিকারের চটকদার বুলিসর্বস্ব এই তথাকথিত মুভমেন্টের দাবি-দাওয়াগুলো শুনতে মধুর হলেও এই নামের আড়ালেই রয়েছে জমাটবাঁধা অন্ধকার। এইসব অন্ধকারের পর্দা উন্মোচন করেছে এই বই। তথাকথিত নারী স্বাধীনতার নামে বিশ্বজুড়ে নারীর নৈতিক অধঃপতন, নারীমুক্তির দেশে নারী নির্যাতনের নোংরা চেহারা, হিজাব নিয়ে পশ্চিমের বর্ণবাদী রাজনীতি, লিবারেলিজম কেন হিজাব-নিকাবে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, পুরুষতন্ত্রের মিথ্যা জুজুর ভয় দেখিয়ে ফেমিনিজমের ভিকটিম কার্ড খেল, পশ্চিমা সাহিত্য ও পপ কালচারে নারীবাদ ও ইসলামবিদ্বেষের ভয়াবহ রূপ, উত্তর-ঔপনিবেশিক মুসলিম নারীবাদ,

নারীবাদী ধর্মতত্ত্ব বা ইসলামি নারীবাদের নামে ইসলামের শাশ্বত চিন্তার সিলসিলায় নগ্ন হস্তক্ষেপ, লিঙ্গ ভারসাম্য বা লৈঙ্গিক সমতার নামে সৃষ্টিকর্তার চিরাচরিত নিয়মে ব্যাঘাত ঘটানো-সহ এ প্রসঙ্গের বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচিত হয়েছে এই বইয়ে। এসব আলোচনা মূলত বিশ্ববিখ্যাত স্কলারদের বইপত্র, প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও বক্তৃতা-বিবৃতি থেকে বেছে বেছে সংকলন করেছেন লেখিকা মারিয়াম তানহা। এই কাজটির অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য বলা যায় এটিকে যে, নারী-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এখানে একজন নারীই কলম ধরেছেন। আল্লাহ এই বোনকে উত্তম প্রতিদান দান করুন এবং তাকে দাওয়াতের ময়দানে প্রতিষ্ঠিত রাখুন, এই দোয়া করি। পুরো কাজটিকে অত্যন্ত যত্ন সহকারে সম্পাদনা করে দিয়েছেন ইরফান সাদিক, তার প্রতিও বিশেষ কৃতজ্ঞতা।

পরিশেষে পাঠকদের বলতে চাই, বইটি যদি ভালো লাগে, তাহলে অফলাইনে প্রিয়জনদের মাঝে এবং অনলাইনে বন্ধুদের মাঝে আপনার অভিব্যক্তি প্রকাশ করতে ভুলবেন না। বইটিকে আলোর মুখ দেখাতে এ পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরে ও নানা সূত্রে যারা এর সাথে যুক্ত ছিলেন, তাদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং প্রিয় পাঠক, আপনার জন্য রইল অগ্রিম শুভেচ্ছা।

প্রকাশনার পক্ষে
আবদুর রহমান আদ-দাখিল
ডেমরা, ঢাকা

সম্পাদকের কথা

২০০৯ সালের মে মাসে "The Paradox of Declining Female Happiness" শিরোনামে প্রকাশিত হয় এক সাড়া জাগানো রিসার্চ। প্রবন্ধটি লিখেছেন দুজন অর্থনীতিবিদ—বেটসি স্টিভসন ও জাস্টিন উলফারস। দুজনেরই সন্তান ও বাড়ি আছে। ১৯৭০ থেকে ২০০৫ সালের মধ্যে আমেরিকার পরিবারগুলোর ওপরে একটা জরিপ চালান তারা। পুরো রিসার্চের মূল ফোকাস ছিল মূলত নারীদের কাজ ও মানসিক অবস্থা। তাতে বের হয়ে আসে অবাক করা এক ফলাফল।

স্টিভসন ও উলফারস আবিষ্কার করেন, ১৯৭০ এর দশকে মার্কিন নারীরা সামগ্রিকভাবে তাদের জীবন নিয়ে পুরুষদের চেয়ে বেশি সুখী ছিল। তারপর থেকেই নারীদের সুখের মাত্রা কমতে থাকে। কিন্তু জীবন নিয়ে পুরুষদের সুখের মাত্রা অবাক-করা-ভাবে মোটামুটি একই থাকে। ১৯৯০ এর দশকে এসে দেখা গেল, নারীরা পুরুষদের চেয়ে বেশি হতাশ। দশকের পরিবর্তনে নারীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে পরিবর্তন এলেও পুরুষরা ঠিক আগের মতোই আছে। স্টিভসন ও উলফারস এই রিপোর্টকে 'প্যারাডক্স' বলার কারণ হলো—বর্তমানে চলছে নারী ক্ষমতায়নের যুগ। বর্তমানে নারীরা পৃথিবীর ইতিহাসের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি শিক্ষিত, বেশি ক্ষমতাবান, বেশি বহির্মুখী। যে নারীরা কম শিক্ষিত, পুরুষতান্ত্রিক সমাজের কর্তৃত্ব মেনে নেয়, পারিবারিক দিক সামলায়—তাদেরকে স্বাভাবিকভাবেই দেখা হয় জুলুমের শিকার হিসেবে। তাহলে নারীমুক্তির এ যুগে এসে নারীরা কেন অসুখী? কেন ৭০-এর দশকে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে তারা বেশি সুখে ছিল?

প্রশ্নটি জটিল। তবে উত্তরটি সহজ।

ফিতরাহ। আল্লাহ মানুষকে একটি নির্দিষ্ট পন্থায় সৃষ্টি করেছেন। একেকজনকে সৃষ্টি করেছেন ভিন্ন ভিন্ন যোগ্যতা ও সম্মান দিয়ে। আল্লাহ মানুষকে দুই লিঙ্গে সৃষ্টি করারও যেমন কারণ আছে, জেন্ডার রোল ঠিক করে দেওয়ারও কারণ আছে। যার কারণে আমরা দেখতে পাই পৃথিবীর ইতিহাসের ৯০%-এর বেশি সভ্যতা নারী-পুরুষের আলাদা জেন্ডার রোল মেনেই পরিচালিত হয়েছে। ৯০%-এর বেশি সমাজ

ছিল পুরুষতান্ত্রিক। স্বাভাবিকভাবেই একগাদা ডিগ্রি নিয়ে শেষজীবনে স্বামী-সন্তান ছাড়া একা একা মৃত্যুবরণ করা নারীর চেয়ে, ডিগ্রিহীন অবস্থায় ঘরভরতি সন্তান ও নাতিদের নিয়ে মৃত্যুবরণ করা নারী বেশি সুখী।

অথচ নারীবাদ এসে ঘুরিয়ে দিয়েছে পৃথিবীর রোখকে। নারীকে বঞ্চিত করেছে শালীনতা, স্নেহ ও ভালোবাসা থেকে, পুরুষের হাতে পরিয়ে দিয়েছে চুড়ি। নারীকে স্বামী-পিতার নিরাপত্তা থেকে বের করে বানিয়েছে ভোগের বস্তু। অর্থ দিয়ে তার সম্মান সংজ্ঞায়িত করে তাকে লাগিয়ে দিয়েছে এক অসীম র‍্যাট রেইসে, কবরের মাটি ছাড়া তা থেকে মুক্তি আসে না। কেড়ে নিয়েছে তার সম্মান, পরিবার, বাবা-মায়ের শাসন-ভালোবাসা, স্বামীর গাইরাত ও সন্তানের আনুগত্যকে। বর্তমানে তাই নারীরা সবচেয়ে বেশি ক্ষমতায়িত হলেও সবচেয়ে বেশি নির্যাতন, যৌন নির্যাতন ও ধর্ষণ হয় এ যুগেই বেশি। নারীরা এখন সবচেয়ে বেশি অসুখী, সুইসাইড রেইটও তাদের মধ্যে সর্বাধিক, এখন তারা সবচেয়ে বেশি উন্মুক্ত ও অনিরাপদ।

আমাদের বোনেদের বোকা বানানো হচ্ছে। একদল পুঁজিবাদী নিজেদের স্বার্থে আমাদের বোনদের বানাচ্ছে ভোগের বস্তু, বাবা-স্বামীর হাত থেকে বের করে এনে নিজেরা শাসন করছে, চিবিয়ে চিবিয়ে শেষ করে দিচ্ছে। আর তাদের কথাতেই আমাদের বোনেরা স্বাধীনতার বুলি আওড়ায়। নারীদের সিগারেট খাওয়া নর্মালাইজ করা ব্যক্তি এডওয়ার্ড বার্নেইসও দিয়েছিলেন নারী স্বাধীনতার স্লোগান। কিন্তু এ কাজ তিনি কেন করেছিলেন? তাঁর টোব্যাকো কোম্পানির বিক্রি বাড়াতে। রকফেলার পরিবার তো বলেছেই, অর্ধেক জনগোষ্ঠীকে ট্যাক্স করতেই তারা নারী স্বাধীনতার প্রমোটার। পর্নগ্রাফিতে নারী পাচার, নারী নির্যাতন থেকে নিয়ে কী না হয়? অথচ তাতেও নারীরা যাচ্ছে 'স্বাধীন', 'স্বাবলম্বী' হতে। অফিসের পুরুষ বস, কলিগের হাতে কোনো না কোনোভাবে হ্যারেজমেন্টের শিকার হননি এমন কজন আছে? তাও কেন দাঁত কামড়ে পড়ে থাকে তারা?

কারণ নারীবাদ। টাকা ছাড়া, এক পশলা ডিগ্রি ছাড়া সম্মান নেই।

নারীবাদ আমাদেরকে কী দিয়েছে? নারীবাদ দিয়েছে আমাদেরকে ভঙ্গুর সমাজ। মাকে আলাদা করেছে সন্তান থেকে, স্ত্রীকে স্বামী থেকে, কন্যাকে বাবা থেকে। নারী এখন যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি অনিরাপদ, নির্যাতিত, ধর্ষিত। বিজ্ঞাপন, পর্ন, মুভি থেকে নিয়ে সবখানেই নারী এখন সবচেয়ে বেশি সেক্সুয়ালি অবজেক্টিফাইড, নারী মানেই কেবল একটি মাংশপিণ্ড। পরিবারগুলো ভেঙে পড়েছে। এত বেশি ডিভোর্স আর কখনোই হয়নি। যৌনতায় ভেসে যাচ্ছে সমাজ। নারীদেহ ব্যবহার করছে বয়ফ্রেন্ড থেকে নিয়ে ইন্ডাস্ট্রির মালিকরা—সবাই। নারীকে পেতে এখন দায়িত্ব নিতে হয় না। নারীর দেহ এখন সবার জন্য, বলা হচ্ছে তোমার

নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক দায়িত্ব তোমারই। বর্তমানের মতো শিশুহত্যাও আগে কোনোদিন হয়নি।

ফ্রান্সিস ফুকোয়ামা বলেছেন, বর্তমান পশ্চিমা সভ্যতা নাকি সকল সভ্যতার সব সেরা বিষয় নিয়ে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সভ্যতা। অথচ পৃথিবীর ইতিহাসে যত অনাচার ছিল, অসভ্যতা ছিল সবকিছুই রাষ্ট্রীয়ভাবে, অস্ত্র দিয়ে প্রতিষ্ঠা করছে বর্তমান সভ্যতা। যে উপলক্ষ্যগুলোর কারণে আল্লাহ একেকটি সভ্যতা ধ্বংস করে দিয়েছেন তার সবই তাদের মধ্যে আছে। বর্তমানের মতো এত বেশি ভঙ্গুর, দায়িত্বহীন সমাজ, জনগোষ্ঠী ও প্রজন্ম কখনো আসেনি। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, বর্তমান পশ্চিমা সভ্যতা আগের সকল সভ্যতার সব খারাপ দিক নিয়ে সর্বনিকৃষ্ট সভ্যতা।

বোনদের বুঝতে হবে। যৌবনের শক্তিতে আমরা দুনিয়াকে বৃদ্ধাঙ্গুল দেখাই। আমরা মনে করি আজকে আমি যা ইচ্ছা তাই করতে পারি। দুনিয়াকে ইচ্ছামতো উপভোগ করতে পারি। এখন না হলে কখন? রূপে-যৌবনে দুনিয়াকে নাচিয়ে আমরা মনে করি আমরা খুব সফল। চরিত্র, লজ্জা এবং সকল নৈতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধকে অস্বীকার করি কেবল কিছু মজার জন্য। কিন্তু ৩০-৩৫ পেরোলেই এক নতুন বাস্তবতা দেখতে পাই সবাই। কী করেছি? কেন করেছি? আজ কে আছে আমাদের পাশে? কার হাত ধরে কবরে যাব? আমি ভালো আছি তো? টাকার বিনিময়ে যে সম্মান ধরে রাখতে চেয়েছি আজ তারা আমাকে সম্মান করছে তো? আমার স্বামী-সন্তান কি আমার আছে?

নারীবাদের ব্যাপারে একদম মৌলিক কিছু ফ্যাক্ট ও প্রশ্ন তুলে এনেছেন মারিয়াম তানহা তাঁর এই সংকলনে। পশ্চিমা নারী স্বাধীনতার বাস্তবতা থেকে নিয়ে নারীবাদের ইসলামবিদ্বেষ, ধ্বংসাত্মক ফলাফল, নারীবাদের বৈষম্য, নারীদের অবজেক্টিফিকেশন, মুসলিম নারীবাদের জগাখিচুড়ি, নারী অধিকারের নামে চালানো যুদ্ধ ও উপনিবেশবাদ-সহ বিভিন্ন ইস্যুতে গভীর ও টু দ্য পয়েন্ট আলোচনা এসেছে। সবচেয়ে সুন্দর বিষয় হলো, নারীদের ব্যাপারে মুসলিমদের অবস্থান ও নারীদের আসল সম্মান নিয়ে বইয়ের শেষে সুন্দর উপসংহার এসেছে। আমার ধারণা বাংলা ভাষায় এভাবে গোছানো কাজ আগে তেমন হয়নি। বইটি পড়তে গিয়ে আমি অনেক বেশি অবাক হয়েছি, নিজের অনেক ভুল ধারণা ভেঙেছে।

হুমায়ূন আহমেদ তার এক বইয়ে একটি সুন্দর গল্প বলেছেন। এক রিক্সাচালক নিজের স্ত্রীর ব্যাপারে যাচ্ছে-তাই বলছিল। উপসংহার টানল এই বলে, আরে কইয়েন না, মাইয়া মানুষ মানেই ঝামেলা। মাইয়া মানুষের লাইগাই আদম দুইন্যাতে নাইমা আইসে। (কথাটা সত্য নয়। ইসলামে এর কোনো ভিত্তি নেই।)

হুমায়ূন আহমেদ তখন জবাব দিলেন, 'নারীর কারণে যদি আমরা জান্নাত থেকে বিতাড়িত হই তবে নারীই পারবে আমাদেরকে জান্নাতে ফিরিয়ে নিতে'।

বইটি বাংলার ঘরে ঘরে পৌঁছানো প্রয়োজন। টাকা থাকলে নিজে দাইয়ুস হওয়া থেকে বাঁচতে, পৃথিবীর অনির্মল অশ্লীলতা ও পরকালে সুন্দর মুখগুলোকে পোড়াতে না চাইলে নিজের মা, বোন, মেয়ে, মাহরামদেরকে বইটা পড়তে দিন, পড়তে বলুন। বই পড়ার অভ্যাস না থাকলে সাপ্তাহিক আলোচনা করুন বইয়ের টপিক নিয়ে। বোনদের যদি বে-দ্বীনদার বান্ধবী থাকে তাদের উপহার দিন। সোনালি দিন ফিরে পেতে হলে নারীদেরকে স্বর্ণের হতে হবে।

নারীকে বাঁচান। কেননা নারী বাঁচলেই বাঁচবে পৃথিবী।

ইরফান সাদিক
irfansadik35@protonmail.com
১ মার্চ, ২০২২

অনুবাদকের কথা

আজ থেকে অনির্দিষ্টকাল পরে যখন ইসলামি খিলাফাহর শিশুরা আমাদের সময়ের ইতিহাস পড়বে, তখন তারা কীভাবে দেখবে আমাদের নারীদের? তারা দেখবে একটি অসুস্থ সমাজ, একটি অসুস্থ বিশ্ব। তারা পড়বে ২-৩ বছর বয়সী অসুস্থ বাচ্চাদের কথা, যারা মায়ের আদর পায় না, মায়ের উষ্ণতা পায় না। কাজের বুয়ার আদরে, 'মোটু পাটলু'র সাথে বড় হওয়া শিশুদের ভবিষ্যৎ দেখে চমকে উঠবে ওরা। অবাক হয়ে ভাববে, 'এ বাচ্চারা মায়ের কোলে শুয়ে মুসআব বা আসহাবে সুফফার গল্প শোনে না? কীভাবে সম্ভব? রান্নাঘরে মায়ের পাশে বসে সাহায্য করতে করতে আড্ডা দেয় না?' সন্তান এবং মায়ের হাজার বছরের যে সম্পর্ক, তা এ সভ্যতায় এসে কীভাবে ধ্বসে পড়ল, তা দেখে অবাক হবে তারা। বারবার সিজদায় পড়ে যাবে এই সভ্যতায় তাদের না জন্মের জন্য। আল্লাহকে ধন্যবাদ জানাবে মাকে অনেক আপন করে পাওয়ার জন্য। মায়ের স্নেহ তাদের কাছে ফর গ্রান্টেড হবে না।

তারা পড়বে অসহায় কিছু নারীর গল্প। পরিবার, চাকরি সব চালিয়ে নেওয়ার লড়াইয়ে বিবর্ণ কিছু চেহারা দেখবে। দেখবে রাজাবাদশাদের আমলের বাইজিদের মতো জীবন বেছে নেওয়ার জন্য কীভাবে শিক্ষাব্যবস্থা, মিডিয়া, রাস্তার বিলবোর্ড—সবকিছু তাদেরকে চাপ দিয়েছে। তাদের ভালোবাসা, মর্যাদা, মাতৃত্ব সবকিছু কীভাবে ভুলে গিয়েছে পৃথিবী এবং বাধ্য করেছে শরীর বেঁচে টাকা জোগাড় করতে। টাকা বাদে কোথাও সম্মান রাখা হয়নি তাঁর—না পরিবারে না সমাজে। তারা তাদের মা-বোনদের জন্য আল্লাহর কাছে শুকরিয়া জানাবে, মাকে জড়িয়ে ধরবে, কেঁদে কেঁদে মাকে ধন্যবাদ দেবে, তাদের মায়েরা তাদেরকে এ সভ্যতার মাদের মতো টাকার জন্য, শরীর বেঁচার জন্য ছেড়ে দেয়নি যে!

তারপর তারা পড়বে একদল পুরুষের গল্প। সেসব পুরুষ—যাদের কাছে স্বার্থ বাদে আর কোনোকিছুর কোনো মূল্য নেই। তারা স্বার্থের জন্য সব করতে পারে। স্বার্থের জন্য পরিবারকেও ব্যবহার করতে পারে। শিশু থেকে শুরু করে সবকিছুকেই তারা ব্যবহার করেছে তাদের ব্যবসার জন্য। এ পুরুষরাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর তাদের কাজে নারীদেরকে ইচ্ছামতো ব্যবহার করেছে, দুর্বল দেখে টাকা না দিয়ে কাজ

করিয়ে নিয়েছে অনেক বেশি। তাদের অধিকার রক্ষায় পুরুষও ছিল না কোনো। একদিন নারীরা যখন ঘুরে দাঁড়াল, নিজেদের অধিকার নিয়েই সোচ্চার হলো, সে পুরুষরা টেবিল ঘুরিয়ে দিলো। নারীদের শরীরকে ব্যবহার করতে শুরু করল, শরীর বেচে নিজেদের ব্যবসা বড় করল। নারীদের কেড়ে নিলো তাদের পরিবার থেকে, বাচ্চাদের থেকে। নারীকে বলা হলো, টাকাই তোমার সম্মান, সন্তান-পরিবারের জন্য জন্ম হয়নি তোমার। এমনকি নারীর 'নারী' পরিচয় পর্যন্ত কেড়ে নিয়েছে তারা। ঘোষণা করেছে, যে কেউ নিজেকে 'নারী' দাবি করতে পারবে।

সনাতন ধর্মের সতীদাহ প্রথা দেখে আমাদের যেমন অবাক লাগে, নাক সিঁটকে উঠি আমরা, ঠিক সেভাবেই মনের ভেতর থেকে এ সভ্যতার সবকিছুকে ঘৃণা করবে খিলাফাহর যুগের শিশুরা। তাকে ইতিহাসের বই পড়াবার সময় মাকে সে প্রশ্ন করবে না, কেন এ সভ্যতার গুরুরা এমন ছিল। কারণ সে জানে, আবু জাহল, ফেরআউন-সহ যুগে যুগেই জালিম-কাফিররা এমন। তারা সবসময় স্বার্থবাদী। আল্লাহকে নিয়ে তারা ভাবে না, নিজেদের খোদা মনে করে তারা। জাহিলিয়াহ অনেক বেশি বর্বর হবে, বিকৃত হবে এটিই স্বাভাবিক। জাহিলিয়াহর হাতে পৃথিবীর সবাই কষ্ট পাবে, এটিই বাস্তব। বরং অবাক হয়ে সে প্রশ্ন করবে, 'মা! সে সভ্যতায় ইমাম ইবনে তাইমিয়ার মতো কেউ ছিল না, যে তাতারদের মতো লিবারেলদেরকে তাড়িয়ে দেবে? ছিল না আইয়ুবির মতো কেউ? ইমাম আহমদের মতো কেউ ছিল না যে মুতাজিলাদের মত খণ্ডন করে অসাড় করে দেবে নারীবাদীদের যত কুযুক্তি? আচ্ছা সে সভ্যতায় কি কোনো মুসলিমই ছিল না?'

সত্যিই তো? মুসলিম কি নেই?

এটিই সবচেয়ে হতাশার জায়গা। ৯০% মুসলিমের এ দেশেই নয়, সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে, সমগ্র আরব বিশ্ব, মুসলিমবিশ্বজুড়ে মুসলিম নামের নারীরা সরে গিয়েছে ইসলাম থেকে অনেক দূরে। স্কুল-কলেজের বারান্দা দিয়ে খিলখিল করে দৌড়াতে থাকা বালিকাদের জিজ্ঞেস করুন, নারীবাদীদের মতো উত্তরই পাবেন। ফিকহের পাতা উলটে, শরিয়তের কাছে এসে জিজ্ঞেস করার মতো সময় কারও নেই, আল্লাহ কী বলছেন, রাসুল ﷺ কী বলছেন। তারা জানে কী বলছেন। কারণ তাদেরকে 'আসল ইসলাম' শিখিয়েছে সেক্যুলার শিক্ষাব্যবস্থা, সেক্যুলার মিডিয়া। সে ইসলামে সব আছে, শুধু আল্লাহ যা বলেছেন তা বাদে। সে ইসলামে সব করা যায়, কেবল সাহাবিরা যা করেছেন তা বাদে। এ ইসলামের সাথে কোনোকিছুর কোনো সংঘর্ষ নেই। নারীবাদের একটি ইসলামি ভার্সনও দাঁড় করানো হয়েছে—মুসলিম নারীবাদ। এ বিষয়টি নিয়েও বইয়ে একাধিক অধ্যায়ে আলোচনা হয়েছে।

জাহিলিয়াহ নারীকে কখনোই শান্তি দিতে পারেনি। স্বামী মারা গেলে স্বামীর দেহের

সাথে স্ত্রীকে পুড়িয়ে ফেলা, কন্যাসন্তানকে দুর্বলতা মনে করে সামাজিক চাপে জীবন্ত মাটিতে পুঁতে ফেলা, স্ত্রীর গলায় কুকুরের মতো শেকল পরিয়ে বাজারে বিক্রি করে দেওয়া, ফোরাত নদে পানি আনার জন্য নারীবলি দেওয়া-সহ অসংখ্য জুলুম নারীর ওপর চাপিয়ে দিয়েছে জাহিলিয়াহ। সকল জাহিলিয়াহ-ই মানুষের সৃষ্ট এবং মানুষ যুগে যুগে তাদের উগ্র যৌন উন্মাদনা এবং শক্তির বড়াই চাপিয়ে দিতে চেয়েছে নারীর ওপর। ঠিক এ কারণেই জাহিলিয়াহ উন্মুক্ত যৌনতায় ভরতি—হোক তা সনাতন ধর্মের বেদ কিংবা সিগমুন্ড ফ্রয়েড, আলফ্রেড কিনসির চিন্তাভাবনা। সমাজকে নিজের স্বার্থমতো চালানো একদল পুরুষের কাজ এসব। তাদের চাপে শ্রদ্ধেয় বাবা, স্নেহের ভাই—সবাই চোখের জল ফেলে বাধ্য হয় নিজের পরিবারের ওপর এসব করতে। আজকের জুলুম আরও ভয়াবহ। আগে নারীরা জুলুমকে জুলুম বলে বুঝত, এখন প্রোপাগান্ডার তোড়ে জুলুমকেই মনে করে সম্মান। কোনো জাহিলিয়াহতে মুক্তি নেই নারীর।

সেক্যুলার শিক্ষাব্যবস্থা এবং সেক্যুলার দেশে থাকা একজন নারী হিসেবে আমার কাছে নারীবাদ ও নারী অধিকারই ছিল বাস্তব, 'কমনসেন্স'। আমি যে একটি ফিতরাহ নিয়ে জন্মেছিলাম, নারী হিসেবে আমার যে মাতৃত্ব, লজ্জাশীলতা, তেজের মতো কিছু বৈশিষ্ট্য এককালে ছিল, তা পুরো পৃথিবী মিলে ভুলিয়ে দিচ্ছিল আমাকে। বুঁদ হয়েছিলাম 'সফল' হওয়ার আশায়। জীবনে আর কোনো অর্থ আছে বলে মনে হয়নি। কিন্তু যখন আল্লাহর কাছে এলাম, শারিআহর কাছে এলাম, মনে হলো যেন নিজেকে ফিরে পেলাম। মনের কোণে যে অসন্তুষ্টিকে চাপা দিয়ে রেখেছিলাম, বুঝ দিচ্ছিলাম, তা চলে গেল এক নিমিষে। আল্লাহপ্রদত্ত নারীত্ব, লজ্জাশীলতা—সব যেন ফিরে এলো।

সব ঠিকঠাক চলছিল। কিন্তু একটি হতাশা কুঁড়েকুঁড়ে খাচ্ছিল। অন্য বোনদেরকে নিয়ে হতাশা। এ মেয়েরা আমার সাথেই পড়েছে, আমার মতোই এক অলীক স্বপ্নের পেছনে দৌড়াচ্ছে। তারা বুঝতে পারছে না তাদের জীবনের অবস্থা। তাদের যা শেখানো হয়েছে তাই বুঁদ করে রেখেছে তাদেরকে। বলা হচ্ছে এর চেয়ে ভালো জীবন হয় না। জীবন বদলাতে চায় না তারা, ভাবতে চায় না বাক্সের বাইরে। ঠিক এ সময়টিতেই আমার শাইখ আবু নাওয়ার, ড্যানিয়েল হাক্কিকাতজু, উম্মে খালিদ, জারা ফারিসদের জগতে প্রবেশ। অসাধারণ একটি অনুভূতি হলো, 'আরে! এসবই তো খুঁজছি আমি'। যতই পড়লাম, লজ্জিত হলাম। কত জাহিলিয়াহতে ডুবে আছি, কিন্তু বুঝতেই পারছি না সেগুলো জাহিলিয়াহ। জাহিলিয়াহর একেকটি বন্ধন ছিন্ন করতে এক অন্যরকম প্রশান্তি অনুভূত হচ্ছিল। অনুশোচনা, ভালো লাগা, লজ্জা, তৃপ্তি—সবমিলে এক মিশেল অনুভূতি। খুব ইচ্ছে হচ্ছিল আমার বোনদেরকে ধরে ধরে পড়াই, বুঝাই। সেখান থেকেই মাতৃভাষায় কাজগুলো নিয়ে আসার চিন্তা।

সত্য বলতে, আন্তর্জাতিকভাবে নারীবাদের ফিতনা নিয়ে অনেক কাজ হয়েছে। সবগুলো এক মলাটে আনা সম্ভব না। পরবর্তীকালে আল্লাহ আরও কাজ আনার সুযোগ দিন। প্রথম অনুবাদ হিসেবে অনেক ভুল থাকা স্বাভাবিক। আশা করি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এবং মৌলিক ভুলগুলো আমাকে মেইল করতে পারেন। এ বইটির পেছনে সম্পাদক, প্রকাশক-সহ যারাই কষ্ট করেছেন, যাদের ক্রমাগত কষ্টের কারণে এ বইটি মলাটবদ্ধ হয়েছে, আলোর মুখ দেখেছে—তাদের সবাইকে আল্লাহ উত্তম প্রতিদান দিন। এ বইয়ের সব ভালো কিছু কেবল আল্লাহর পক্ষ থেকে, ভুলের জন্য কেবল আমি ও শয়তানই দায়ী। আল্লাহ সকল ভালো বিষয়গুলো আমাকে ও পাঠক বোনদের আমল করার তৌফিক দিন এবং সকল ভুলগুলো সকলের অন্তর থেকে মুছে দিন। আমিন।

মারিয়াম তানহা
tanhamarium37@gmail.com
১ ফেব্রুয়ারি, ২০২২

স্বাধীনতা নাকি নৈতিক অধঃপতন : পাশ্চাত্যের দ্বিচারিতা

[১]

পশ্চিমের নৈতিক অধঃপতনের যেন কোনো সীমা নেই। পশ্চিমা নারীরা এখন রীতিমতো উলঙ্গ হয়ে প্রকাশ্যে উলঙ্গ হওয়ার অধিকারের জন্য আন্দোলন করছে। হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছেন, উলঙ্গ হওয়ার অধিকার।

> 'ফ্রান্সে একজন মহিলাকে টপলেস রৌদ্রস্নান (Sunbath) করতে দেওয়া হয়নি। তাঁর প্রতিবাদেই কিছু নারী—কোনো স্তনবৃন্তই স্বাধীন নয় যতদিন না সব স্তনবৃন্ত স্বাধীন হয়—স্লোগানে আন্দোলনে নামেন। সংবাদমাধ্যমে বলা হয়, পার্কের কর্মকর্তা বার্লিনের সে নারীকে জামা পরে পার্ক থেকে বের হয়ে যেতে বলেন। তিনি টপলেস অবস্থাতেই বাচ্চাদের প্যাডলিং পুলের পাশে রৌদ্রস্নান করছিলেন।'
>
> —South China Morning Post[১]

এসব পেডোফিলিক পশ্চিমাদের কাছে বাচ্চাদের সামনে উলঙ্গ হওয়া কোনো সমস্যাই না। কেন নয়? তাদের দাবি, দেহ নিয়ে লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই। তাই যতবেশি পারো বাচ্চাদের সামনে উলঙ্গ হও। বাচ্চাদের জন্য প্রচারিত একটি ডাচ টিভি শোতে[২] অনেক প্রাপ্তবয়স্ক মানুষকে উলঙ্গ দেখানোর কারণও এটাই। পরবর্তী সময়ে দেখা যায়, এ উলঙ্গ লোকদের অনেকেই সময়ে সময়ে বাচ্চাদেরকে যৌন হয়রানির দায়ে অভিযুক্ত হয়েছে। অবাক করা বিষয়!

প্রকাশ্যে উলঙ্গ হয়ে আন্দোলন করা এসব উন্মাদদের সাথে আলোচনা করা কীভাবে সম্ভব? প্রকাশ্যে বাচ্চাদের সামনে উলঙ্গ হয়ে নিজেদের গোপনাঙ্গ প্রকাশ করে তৃপ্ত হওয়া, স্বাধীন অনুভব করা, বাচ্চাদেরকে যৌন হয়রানি করা এসব মানসিক বিকৃত

---

[১] Women demonstrate topless in Berlin for right to bare breasts in , *South China Morning Post,* https://www.scmp.com/news/world/europe/article/3140643/women-demonstrate-topless-berlin-right-bare-breasts-public

[২] Dutch TV show for kids features naked adults, https://www.independent.co.uk/news/world/europe/holland-tv-show-naked-adults-children-b1814563.html

মানুষকে কীভাবেই-বা শালীনতা, নৈতিকতার বুঝ শিক্ষা দেওয়া সম্ভব?

এদেরকে এভাবে আন্দোলন করার অনুমতিই-বা কেন দেওয়া হয়? কেন পুলিশ এসব উন্মাদদের ছত্রভঙ্গ করে দিয়ে সামাজিক শৃঙ্খলা নিশ্চিত করছে না? কেন তারা সামাজিক শালীনতার পক্ষে অবস্থান নিচ্ছে না? সত্য বলতে পশ্চিমা সরকারগুলো চায় এসব হোক। তারা এসব নৈতিক অধঃপতনকে অনুমোদন করে। সামাজিক অশালীনতাই তাদের হাতিয়ার। সাধারণ মানুষের প্রবৃত্তিপূজাই তাদের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার হাতিয়ার।

জাতীয়ভাবে 'সবার স্তনই সমান' স্লোগানে একটি আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়েছে। এ আন্দোলনের নারীকর্মীরা পুরুষদের মতোই জামা ছাড়া প্রকাশ্যে টপলেস চলাফেরা করার অধিকার চায়। তাদের অনলাইন পোর্টালের দাবি অনুসারে, স্তনকে যৌনতার রূপ না দিয়ে স্বাভাবিক করা হোক।

অধঃপতনের মাত্রা বুঝে ওঠা আসলেই কষ্টকর। তারা যা ইচ্ছা তাই করছে। তাদের প্রবৃত্তির চূড়ান্ত প্রদর্শনী করছে। এসব নারীবাদীরা বাচ্চা-সহ সবার সামনেই নিজেদেরকে উলঙ্গ করার অধিকার চায়, অথচ তারা কথা বলে ছেলেদের উলঙ্গ হওয়ার বিরুদ্ধে। তাদের মতে, এ MeToo আন্দোলনের যুগে পুরুষরা তাদের শরীরের কোনো কিছু প্রকাশ করার ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। সামনে থাকা নারীদের অনুমতি ছাড়া এ কাজ করা নাকি এক প্রকার হয়রানি। এ কোন ধরনের ডাবল স্ট্যান্ডার্ড?

এসব নারীরা নিজেদেরকে উলঙ্গ করে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য। কিন্তু যখন তাদের অপছন্দের কারও দৃষ্টি তাদের ওপর পরে যায়, একে তারা যৌন হয়রানি বলে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে থাকে। চলুন তাদের আরও কিছু ডাবল স্ট্যান্ডার্ড দেখি। একই অবস্থা, একই প্রেক্ষাপট, শুধু মানুষ ভিন্ন।

২০১৬ সালে ফ্রান্সে 'বুরকিনি' নিয়ে ব্যাপক আলোচনা সমালোচনা শুরু হয়। হিজাব পরিহিত মুসলিম নারীদের সাঁতারের জন্য শালীন একধরনের পোশাকের নাম বুরকিনি। এ বিষয়টি নিয়ে রাজনৈতিক মহলে প্রবল বিভক্তি দেখা দেয়। বিরাট অংশ মনে করে, বুরকিনি নিষিদ্ধ করা উচিত। সমুদ্র তীরবর্তী অনেক রিসোর্টে বুরকিনি পুরোপুরি নিষিদ্ধ করা হয়। এদিকে ২০১৬ সালের ২৩ অক্টোবর, দুজন ফ্রেঞ্চ পুলিশ অফিসার সমুদ্রতীরে একজন নিকাবি নারীকে সবার সামনে নিকাব খুলে ফেলার আদেশ দেয়। ইউরোপীয় কোনো নারীনেত্রী সেদিন বুরকিনির পক্ষে দাঁড়ায়নি, নারী স্বাধীনতার কোনো লম্বা বুলি আওড়ায়নি। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কোনো আন্দোলনই দানা বেঁধে ওঠেনি। নারী স্বাধীনতা সেদিন মিথ্যা হয়ে

গিয়েছিল।

দিনশেষে তাদের লড়াই শালীনতার বিরুদ্ধে, ইসলামের বিরুদ্ধে। তারা স্বাধীনতার জন্য লড়াই করে না, তারা তাদের নৈতিক অধঃপতনের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করে। যেন সকল প্রকার অশালীনতাই প্রকৃত স্বাধীনতা।

[২]

এনলাইটেনমেন্ট বোদ্ধারা মনে করেছিলেন, রাষ্ট্র ও ধর্মকে আলাদা করতে পারলেই বুঝি ধর্মগুলোর মধ্যে শান্তি ও সম্প্রীতি বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু আজকের বাস্তবতা বলছে ভিন্ন কথা। ২০১৭ সালে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালত একটি রুলিং দিয়ে কোম্পানিগুলোকে ধর্মীয় চিহ্ন নিষিদ্ধ করার অনুমতি দেয়। এখানে ইয়ারমুলক, ক্রস নিষিদ্ধ করা হয় এবং অবশ্যই হিজাবও। তাদের আগের অবস্থানকে বৈধ করতে ইউরোপীয় ইউনিয়ন এখন আবার কেসটি খুলেছে।

‘ইউরোপীয় ইউনিয়নের ব্যক্তিগত কর্মজীবিরা তাদের প্রতিষ্ঠানে সকল ধর্মীয় চিহ্ন নিষিদ্ধ করার অধিকার রাখে। এগুলোর মধ্যে মাথার স্কার্ফও আছে। ব্লকের সর্বোচ্চ আদালত নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করতে এমন রায় দেয়।’—The Guardian.[৩]

২০১৭ সালের সিদ্ধান্তকে আবারও সঠিক ঘোষণা করে বলা হয়েছে, কোম্পানিগুলো তাদের পলিসির অংশ হিসেবে সকল ধর্মীয় ও রাজনৈতিক চিহ্ন নিষিদ্ধের অংশ হিসেবে মাথার স্কার্ফও নিষিদ্ধ করতে পারবে। সর্বশেষ রায়ে কোন চিন্তা থেকে এ কাজ করতে পারবে কোম্পানি মালিকরা, তাও পরিষ্কার করে বলা হয়েছে। এভাবে নাকি ক্রেতা ও ব্যবহারকারীর যোগাযোগ সহজ হয়। তারা সকল প্রকার রাজনৈতিক ও ধর্মীয় পরিচয় ছুড়ে ফেলে তাদের মতো করেই তাদের আপন হতে হবে, তাদের চাহিদা বুঝতে হবে।

ইইউর মতে, এ কাজ করেছে তারা সেক্যুলারিজম প্রতিষ্ঠায়, নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করতে। তারা কোম্পানিদেরকে মানুষের ধর্মীয় স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করার ফ্রি লাইসেন্স দিয়ে দিলো। তারা প্রমাণ করে দিলো, ঘরের দেয়াল বা উপাসনালয়ের বাইরে ধর্ম, এমনকি ধর্মীয় পোশাকে আসাও কাম্য নয়। এটাই সেক্যুলার আগ্রাসন। এভাবে ধার্মিক মানুষদেরকে সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন করা হবে, না-মানুষ করা হবে।

দুজন জার্মান মুসলিম নারী এ মামলা দায়ের করেন। তাদের একজন ছিলেন চাইল্ডকেয়ার কর্মী, আরেকজন ছিলেন একজন কেমিস্টের সেলস অ্যাসিস্টেন্ট।

---

[৩] EU companies can ban employees wearing headscarves, court rules, https://www.theguardian.com/world/2021/jul/15/eu-companies-can-ban-employees-wearing-headscarves-religious-symbols

মাতৃত্বকালীন ছুটির পর কাজে ফিরে তারা দুজন হিজাব পরার সিদ্ধান্ত নিলে তাদেরকে বাধা দেওয়া হলো। তাদেরকে হিজাব খুলে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়। সেই চাইল্ডকেয়ার সেন্টারে যেকোনো ধর্মীয় চিহ্নই নিষিদ্ধ, হোক তা খ্রিষ্টানদের ক্রুশ কিংবা ইহুদিদের কিপ্পাহ। এ নারীকে দুইবার সাসপেন্ড করা হয় এবং লিখিতভাবে সতর্ক করে দেওয়া হয়। সে নারী জার্মান কোর্টে এ আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে মামলা করেন।

খুবই জঘন্য কৌশল। তারা এমন একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা দাঁড় করিয়েছে যাতে নারীরা বাইরে কাজ করতে উৎসাহিত হয়। তারাই এক শতক ধরে নারীবাদী প্রোপাগান্ডা ছড়িয়ে গৃহিনী নারীদেরকে নিন্দিত, লজ্জিত করেছে। তাদেরকে তুলনা করেছে দাসের সাথে, নীচুশ্রেণির মানুষদের সাথে। এতকিছু করার পরে তারা এবার মুসলিম নারীদের শেষ ধর্মীয় পরিচয়ও কেড়ে নিতে চায়। হয় হিজাব নয় চাকরি। এ ধরনের আইনের পরিণতি দুই ধরনের—মুসলিম নারীদের ওপর এমন বিধিনিষেধ আরোপ করে সেক্যুলার সমাজে তাকে খুব বেশি সমাজবিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হবে, এক ঘরে করে দেওয়া হবে। আরেকটি হলো, মুসলিম নারীরা দ্বীন রক্ষার জন্য আরও বেশি বেশি গৃহিণী হওয়ার দিকে ঝুঁকবেন।

প্রেসিডেন্ট এরদোগানের মুখপাত্র ইবরাহিম কালিন[৪] উদ্‌বেগ প্রকাশ করে বলেন,

> 'কর্মক্ষেত্রে হিজাব পরিধানের বিরোধিতা করে ইউরোপীয় কোর্ট অফ জাস্টিসের এ সিদ্ধান্ত মুসলিম নারীদের অধিকারের ওপর আরেকটি বড় আঘাত। এভাবে ইউরোপের মুসলিমবিদ্বেষী ক্রুসেডার, সাদা আধিপত্যবাদীরা উৎসাহিত হবে। ধর্মীয় স্বাধীনতা বলতে আসলে কী বোঝায়? এ স্বাধীনতা থেকে মুসলিমদেরকে ঘোষণা দিয়ে বের করে দেওয়া হলো?'

ইবরাহিম কালিন ইউরোপের ভণ্ডামি নিয়ে ঠিকই বলেছেন। ধর্মীয় স্বাধীনতা, বাকস্বাধীনতা, নারী স্বাধীনতা, নারী ক্ষমতায়ন—এগুলো কেবল কিছু অর্থহীন স্লোগান। যখনই এগুলো তাদের কোনো কাজের প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়ায়, তারা এগুলোকে ছুড়ে ফেলে।[৫]

---

[৪] Turkey says EU headscarf ruling 'grants legitimacy to racism', https://www.theguardian.com/world/2021/jul/18/turkey-says-eu-headscarf-ruling-grants-legitimacy-to-racism

[৫] Muslim Skeptic এ প্রকাশিত হুদ লেম্প্রিতের *Feminist Protest: Let Us Get Naked in Front of Your Children!* আর্টিকেলের অনুবাদ।

দি আফ্রিকোম ফাইলস
মার্কিন সেনাবাহিনীর নারী চিকিৎসা[৬]

২০১৭ সালের ৫ই জুন আফ্রিকার এক ক্যাম্পের আলফা কোম্পানিতে আমেরিকার এক নারীসেনা তাঁর প্রথম শিফট শুরু করেন। এ ক্যাম্পটি আগে থেকেই যৌন হয়রানির জন্য কুখ্যাত। তাই তিনি চাননি এখানে কাজ করতে, কিন্তু তাঁর কিছু করারও ছিল না। নারী স্বাধীনতা, নারী ক্ষমতায়নের সামাজিক বাস্তবতার বলি হয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁকে এখানেই কাজ করে যেতে হবে।

রাত তখন ১২টা। কখন যে রুমে তিনি একজন সিনিয়র নন কমিশন অফিসারের সাথে একা হয়ে পড়েছেন, কাজের চাপে খেয়ালই করেননি সেই নারীসেনা। সেই অফিসার নারীসেনাকে যৌন সঙ্গমের আহ্বান জানান। তিনি নাকি ৯ মাস ধরেই এমন ইচ্ছা পোষণ করছেন। নারীসেনা বাধা দিলেন না। তিনি ভয় পাচ্ছিলেন তাঁকে আবার শারিরীকভাবে আক্রমণ করা হয় কিনা। পরবর্তী সময়ে একদিন সেই অফিসার জোর করে তাঁর ওপর প্রচণ্ড সহিংস যৌন নির্যাতন করতে চায়। শারিরীক নির্যাতনের ভয়ে সেই নারীসেনা জনৈক অফিসারের সাথে কো-অপারেট করেন।

এই হলো নারীর বিরাট শুভাকাঙ্ক্ষী, নারীবাদের জন্মদাতা, আফগানিস্তানের তথাকথিত 'বন্দি' 'অবহেলিত' নারীদের রক্ষায় উঠেপড়ে লাগা আমেরিকার সেনাবাহিনীর অবস্থা। এটা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, এমনকি একমাত্র ঘটনাও নয়। এমন ঘটনার অভিযোগ এসেছে ১৫৮টি। তার মধ্যে আছে যৌন হয়রানি, যৌন নির্যাতন, ধর্ষণের মতো অভিযোগ। আসল ঘটনার সংখ্যা যে আরও বেশি তা বলাই বাহুল্য।

Intercept এবং Type Investigations আমেরিকার সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনীর এমন কিছু তথ্য বের করে এনেছে। ১৫৮টি অভিযোগ তো কেবল আফ্রিকাতে। আমেরিকার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় পেন্টাগন প্রায় অর্ধেকের মতো অভিযোগ অস্বীকারই করেছে। এই ১৫৮টি অভিযোগ-সংবলিত ফাইলের নাম—

---

[৬] স্ক্রিপ্টটি গ্রহণ করা হয়েছে অনলাইন দাওয়াহ প্লাটফর্ম 'ফ্রন্টিয়ার' থেকে। ভিডিওর লিংক :
https://youtu.be/hJDIDEIrK6o
মূল রিপোর্ট- The Africom Files,
https://www.typeinvestigations.org/investigation/2021/07/06/the-africom-files/

দি আফ্রিকোম ফাইল।

শুধু আফ্রিকাতেই না, আমেরিকার মানবতাবাদী সেনাবাহিনীর এ সমস্যা দেশজুড়ে, সারা বিশ্বজুড়ে। কোনো নারীসেনাকে বাইরের কোনো দেশে পাঠানো হলে তা যেন সাক্ষাৎ নরক হয়ে আসে ওই নারীসেনার জন্য। এক সমীক্ষায় বলা হয়েছে, আফগানিস্তান বা ইরাকের নারীসেনারা তাদের সাথে হওয়া যৌন হয়রানি এবং যৌন নিপীড়নের অভিযোগ করতে পাহাড়সম বাধার সম্মুখীন হন। পেন্টাগনের সমীক্ষায় বলা হয়, প্রতিবছর প্রায় ২০,৫০০ জন পরিষেবা সদস্য যৌন নিপীড়নের শিকার হয়। SAPRO-র সাম্প্রতিক রিপোর্ট অনুযায়ী ২০২০ সালে মাত্র ৬,২৯০টি যৌন নিপীড়নের অভিযোগ করা হয়েছে। এ বছর Government Accountability Office-এর অনুসন্ধানে উঠে এসেছে যে, যেসকল সাধারণ কর্মীদের ওপর যৌন নির্যাতন হয়েছে তাদের প্রায় ৯৭ শতাংশ অভিযোগ পেন্টাগন গ্রহণই করেনি।

লজ্জা, গোপনীয়তা, ভয়ের মতো অনেক কারণে অনেকেই অভিযোগ দায়ের করেন না। যারা অভিযোগ করেন তাদেরকে অনেক হয়রানির শিকার হতে হয়। নামকাওয়াস্তে যা বিচার হয়, তাতে কারও কোনো শাস্তি হয় না। মাত্র ০.৯ শতাংশ ঘটনার মামলা দায়ের হয়, বিচার হয় খুবই কম। ওকলাহোমা বেইজে যৌন হয়রানি ও যৌন নির্যাতনের অতি সাধারণ একটি সংস্কৃতি তৈরি হয়েছে। নারী সৈনিকদের এখানে সহজেই যৌন উপায়ে ব্যবহার করা যায়। তারা অভিযোগ করতেও অনেক ভয় পায়। কেননা তাদেরকে একঘরে করা হয় কিংবা আরও বেশি করে যৌন নির্যাতনের শিকার হতে হয়।

এই হলো বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্রের প্রচার করা, মুসলিম বন্দি নারীদের বিশ্বজুড়ে মুক্ত করার মিশন চালানো আমেরিকার সেনাবাহিনীতে নারীদের অবস্থা। এই হলো নারী স্বাধীনতার বাস্তবতা। এগুলো হাজার বছর, শতবর্ষ আগের কথা না, সাম্প্রতিক ঘটনা। এরাই যখন আফিয়া সিদ্দিকিকে দিনের পর দিন ধর্ষণ করে, ১৪ বছর বয়সী আবির আল-জানাবিকে ধর্ষণ করে পরিবার-সহ আগুনে জ্বালিয়ে দেয়—সেগুলো কি খুব বেশি অবাক করা বিষয়? বিশ্বজুড়ে নারী অধিকারের পক্ষে লড়াই করে যাওয়া এ দেশগুলোই নারীকে যৌনতা দিয়ে সংজ্ঞায়িত করেছে দিনের পর দিন। নারী কেবল সাম্রাজ্যবাদ জায়িজ করার একটি কার্ডমাত্র।

কী গ্রহণ করবেন? নারী অধিকারের কথা বলে সেই নারীদেরকেই জাতিগতভাবে ধ্বংস করা পশ্চিমাদের? নাকি শাশ্বত সেই বিধানকে, যা দেড় হাজার বছর ধরে নারীকে দিয়ে যাচ্ছে তার যথার্থ সম্মান, মর্যাদা ও অধিকার?

লিবারেলিজম কেন আপনার নিকাব পরিধানে বাধা দেয়?

'তাদের পর্দার আড়াল থেকে বের করে আনো,
যেখানে তারা নিজেদের লুকিয়ে রাখে।'

মুসলিমদেরকে যারা বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে দমন করতে চায়, তারা অনেকদিন থেকেই মুসলিম নারীদের অবস্থাকে তাদের প্রধান হাতিয়ার বানিয়েছে, বিশেষত হিজাব। ঔপনিবেশিক সময়কালে মিশরে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক কর্মকর্তারা তাদের উপনিবেশবাদ বৈধ করার জন্য মুসলিম নারীদের পর্দা এবং ইসলামে নারীদের অধিকারের কথা বলতেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বুশ প্রশাসন ইরাক যুদ্ধ শুরু করার মূল কারণ হিসেবে নারী মুক্তির কথা বলেছে। উপনিবেশবাদ-বিরোধী দার্শনিক এবং বিপ্লবী ফ্রাঞ্জ ফ্যাননের মতে, ঔপনিবেশিক আমলে আলজেরিয়ায় ফরাসি রাজনৈতিক নীতি ছিল—'আলজেরিয়ায় সামাজিক কাঠামো ধ্বংস করতে এবং তাদের প্রতিরোধ-ব্যবস্থাকে নিষ্ক্রিয় করতে হলে প্রথমেই নারীদের দিকে নজর দিতে হবে। নারীদের অবশ্যই পর্দার আড়াল থেকে বের করে আনতে হবে, যেখানে তারা নিজেদের লুকিয়ে রাখে।'[৭]

ঔপনিবেশিক সময় থেকে শুরু করে বর্তমান উদার পাশ্চাত্যেও একইভাবে বিভিন্ন সময় মুসলিম নারীর নিকাবকে নিয়ে প্রোপাগান্ডা ছড়িয়ে অন্যদের মধ্যে মুসলিমদের প্রতি ভয় এবং তাদের সাথে দূরত্ব তৈরি করা হয়েছে। গত বছর যুক্তরাজ্যে এমপি স্যারাহ ওলাস্টন (Sarah Wollaston) প্রকাশ্যে স্কুলগুলোতে নিকাব নিষিদ্ধের আহ্বান জানান। যার কারণে দেশব্যাপী নিকাবের বিষয়টি নতুনভাবে আলোচনায় আসে। সে নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হয়নি কিন্তু সামাজিকভাবে নিকাব যে নিষিদ্ধ করা উচিত এমন ধারণার বীজ জনমানসে বুনে দেওয়া হয়েছে। এরপর থেকে জাতীয় বিতর্কের নামে এবং সংবাদপত্রে 'সভ্য সমাজের কি নিকাবের বিষয়টি কঠোরভাবে নেওয়া উচিত না?' এমন শিরোনাম প্রকাশের মাধ্যমে সেই বীজের পরিচর্যা করে চলছে। বিভিন্ন কারণ ও অজুহাত দেখিয়ে এ

---

[৭] Fanon, Frantz, "Algeria Unveiled", in *Dying Colonialism* (New York: Grove Press, 1965), pp37-38

জাতীয় নিষেধাজ্ঞার যৌক্তিকতা নিয়ে মানুষের মনে ধারণা আরও বদ্ধমূল করা হয়েছে। মানুষকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে—নিষিদ্ধ না করলেও অন্ততপক্ষে নিকাবকে দৃঢ়ভাবে নিরুৎসাহিত করা উচিত।

নিকাব-বিরোধীরা নিকাবকে নারীর সুরক্ষা এবং ব্যক্তিগত পরিচয়ের পথে বাধা হিসেবে দেখে। নিপীড়িত হওয়া, কাজে বাধাগ্রস্ত হওয়া এবং এমনকি নিকাবের উপস্থিতিতে আশেপাশের লোকজনের অস্বস্তিবোধ-সহ নিকাবের বিপক্ষে যুক্তি হিসাবে এমন হাজারো অজুহাত দেখায় তারা।

গত সপ্তাহে লন্ডনে উদার দৃষ্টিভঙ্গি পোষণের জন্য বিখ্যাত এমন একটি স্কুলে একজন শিক্ষার্থীর নিকাবকে নিষিদ্ধ করা হয়। কর্তৃপক্ষ দাবি করে যে ছাত্র-শিক্ষকের খোলামেলা আলোচনায় বাধা হয়ে দাঁড়ায় এমন যেকোনো পোশাকের বিরুদ্ধে তারা ব্যবস্থা নেবে। সেই সাথে অস্ট্রেলিয়াতেও 'নিরাপত্তার' উদ্দেশ্যে সংসদে নিকাব পরিহিতা নারীদের আলাদা করা হয়েছে। শর্তে বলা হয়েছে যে যদি কোনো মুসলিম নারী ক্যানবেরায় সংসদীয় কার্যক্রম দেখতে চায়, তবে তাকে আলাদাভাবে কাচের রুমে বসে দেখতে হবে। শুধু তাই নয়, নিকাব পরিহিতা নারীকে সব ধরনের চেক করা হলেও তাকে সেই কাচের রুমের মধ্যে অবস্থান করতে হবে। অথচ এসব কাচের রুমে বাচ্চারাও থাকে। মূলত স্কুলের বাচ্চাদের জন্য এ রুম নির্ধারিত। যদি এই নারীরা আসলেই নিরাপত্তা ঝুঁকি হয়ে থাকে, স্কুলের বাচ্চাদের সাথে একই রুমে কেন তাদেরকে রাখা হয়? আসলে এটি একান্তই নিকাব ও শারিআহর প্রতি ঘৃণা থেকে করা হয়।

To cover up, or to cover-up?

উদারপন্থী দেশগুলো পর্দার ওপর নিষেধাজ্ঞার পক্ষে জনসাধারণের সমর্থন পাওয়ার জন্য অনেক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে আসছে। এসব পরিকল্পনাসমূহ তাদের নীতির সাথেই সাংঘর্ষিক। নিকাব পরিহিতা নারীদেরকে তারা বিভ্রান্তকারীদের শিকার কিংবা ভুক্তভোগী হিসেবে আলাদা শ্রেণিভুক্ত করে এবং তাদেরকে উদ্ধারের স্লোগান দেয়। এটা স্পষ্ট যে তাদের এমন দাবির মূলে অন্য কোনো গোপন উদ্দেশ্য আছে।

নিকাবের বিরুদ্ধে স্ব-বিরোধী যুক্তিগুলো সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরছি—

- 'নিকাবের মাধ্যমে পুরুষকে 'যৌন উত্তেজক' হিসেবে ছোট করা হয়, আবার পুরুষরাই নিকাব পরতে নারীদেরকে বাধ্য করে', তার মানে কি তাহলে পুরুষরা নিজেদের ছোট করার জন্য নারীদের ওপর নিকাব আরোপ করেছে?

- ‘নিকাব নারীদের নিজ পরিচয়ে পরিচিত হতে না দিয়ে অন্তরালে পাঠিয়ে দেয়’, কিন্তু ওই একই লোকেরা আবার দাবি করে যে নিকাব পরিহিতা নারীদের দিকে সকলের নজর যাচ্ছে এবং নিকাব পরিহিতা নারীদের দেখে ‘জনগণ ভীত’।
- ‘নিকাব নারীদের ওপর তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়’, এ কারণে কি যেসব নারী নিকাব পরতে চায় তাদেরকেও জোর করে নিকাব থেকে বের করে আনতে হবে?
- ‘নিকাব নারীদের ব্যক্তিজীবনের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে বাধা’, কাজেই একজন নারী যদি নিকাব পরতে চায় তবে তার সে পছন্দকেও অস্বীকার করা উচিত?
- ‘নিকাব নারীকে যৌন বস্তু হিসেবে উপস্থাপন করে’, তাই মুসলিম নারীদের আরও খোলামেলা পোশাক পরতে এবং তাদের নগ্নতাকে প্রকাশ করতে বাধ্য করা উচিত? সে ক্ষেত্রে নারী যৌন বস্তু হবে না?
- ‘নিকাব একজন নারীকে অসামাজিক করে তোলে’, কাজেই নিকাবকে হয় নিষিদ্ধ করতে হবে অথবা তাদেরকে বাড়িতে আবদ্ধ করতে হবে?
- ‘নিকাব নারীর যোগাযোগকে বাধাগ্রস্ত করে’, বিশেষত যখন কোনো নিকাব পরিহিতা নারী আমাদের সাথে অন্য কোনো উপায়ে যোগাযোগ করতে চায়। মুখ খুলে না আসলে কথা বলতে না পারাটা কীসের ইঙ্গিত দেয়?
- ‘নিকাব পরিহিতা একজন নারী নিপীড়িত এবং তাঁর কোনো মূল্য থাকে না’, কিন্তু তারাই বলেন নিকাব পরিহিতা নারীরা নাকি ‘বিপজ্জনক এবং প্রতারক’।
- ‘নিকাবের ফলে নারীদের স্বাভাবিক যৌন চাহিদাকে বিপজ্জনক মনে হয়’। যারা নিপীড়িত তারাই আবার বিপজ্জনক?
- ‘নিকাবকে নারীর যৌনতা নিয়ন্ত্রণের জন্য উদ্ভাবন করা হয়েছে’, পাশাপাশি তারা নিকাবকে পুরুষের যৌনতা নিয়ন্ত্রণের বিকল্প হিসেবেও দেখে।
- ‘নিকাব পুরুষের জন্য চরম অবমাননাকর। কেননা নিকাব প্রমাণ করে যে পুরুষেরা নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে সক্ষম নয়’—হ্যাঁ, একই কারণে একটি দরজার তালা যেকোনো অপরিচিত ব্যক্তির জন্য অবমাননাকর।
- ‘নিকাব নারীর দেহ নিয়ে সামাজিক উদ্‌বেগের প্রতীক’, কাজেই চলুন নারীদের দেহ নিয়ে জাতীয় বিতর্কের আয়োজন করি।(!)

টেলিগ্রাফে যখন 'সভ্য সমাজের কি উচিত না নিকাবের বিষয়টি কঠোরভাবে নেওয়া?' শিরোনামে সংবাদ প্রকাশিত হলো তখন তারা কি ভেবেছিল 'অসভ্য' মুসলিমরা নিজেদের ঈমানের সাথে আপস করে যৌক্তিক কোনো কারণ ছাড়াই শুধু তারা বলেছে বলে মেনে নেবে? তাদের নিজেদের দাবিই প্রমাণ করে যে নিকাবের বিরুদ্ধে দ্বন্দ্ব আসলে নিকাবকে নিয়ে নয়। যেমনটা ভিক্টর হুগো লিখেছিলেন, 'পুণ্যের একটি পর্দা থাকে আর বিদ্বেষের থাকে মুখোশ'। আর আমরাও সামনে দেখতে পাব যে পর্দার বিরুদ্ধে অভিযানের মুখোশের আড়ালে এক নোংরা বিদ্বেষ লুকিয়ে আছে। কেবল নিকাব পরিহিতা নারীর আশপাশের কয়েকজন অস্বস্তি বোধ করে বলে তারা নিকাবের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়নি। পর্দার বিরুদ্ধে এটি কোনো যৌক্তিক কারণ হতে পারে না। বরং লিবারেলিজম আসলে তার সাথে মৌলিকভাবে সাংঘর্ষিক আদর্শ ইসলামের প্রতিই বিদ্বেষ লালন করে। ইসলাম হলো আল্লাহর দাসত্ব, তাকেই সর্বেসর্বা বলে মানা। আর লিবারেলিজমে ব্যক্তিই সব, সর্বেসবা। (Individualism)

জোরপূর্বক শোষণ : লিবারেলিজমের করাল থাবা

পাশ্চাত্যে লিবারেল গণতন্ত্রের অধীনে থাকা নারীদের নিকাব না পরার অধিকার যেমন আছে, ঠিক তেমনই কি নিকাব পরার অধিকার থাকা উচিত ছিল না? প্লাস্টিক সার্জারি, অজাচার (জার্মানিতে), সমকামী বিয়ের সমর্থন-সহ সকল প্রকার ব্যক্তিস্বাধীনতার পক্ষে কথা বলে এ লিবারেলিজম। যে কেউ সহজেই মনে করতে পারে এখানে বুঝি ব্যক্তির সকল প্রকার স্বাধীনতাকেই বৈধতা দেওয়া হয়। কিন্তু বাস্তবে লিবারেলিজম কখনোই নিকাবকে সমর্থন করবে না। লিবারেলিজম না কেবল, কোনো আদর্শই শতভাগ স্বাধীনতা নিশ্চিত করবে না। তারা নিজেদের মতো করে স্বাধীনতার সংজ্ঞা বানিয়ে নেয় এবং মানুষকে স্বাধীন হতে 'বাধ্য' করে। এটি লিবারেলিজমের আদর্শের সাথে সাংঘর্ষিক নয়; বরং এটিই লিবারেলিজম।

লিবারেলিজমের মূল লক্ষ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রাজনৈতিক তাত্ত্বিক জুডিথ শকলার (Judith N. Shklar) বলেন, 'লিবারেলিজম ব্যক্তিস্বাধীনতা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় যেকোনো রাজনৈতিক পদক্ষেপ নেবে। নির্দিষ্ট আদর্শের আওতায় প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির সমান স্বাধীনতা থাকবে যে সে তার জীবনের সকল বিষয়ে নির্ভয়ে যেকোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। এতে কারও সমর্থনের প্রয়োজন নেই। এই বিশ্বাসই লিবারেলিজমের মৌলিক এবং একমাত্র সমর্থনযোগ্য ব্যাখ্যা।'[৮]

[৮] Shklar, Judith, "The Liberalism of Fear", in *Liberalism and the Moral Life*, ed. Nancy L. Rosenbaum (Cambridge: Harvard University Press, 1989), pp21.

সমান স্বাধীনতার এ মূলনীতিই লিবারেলিজমের মধ্যকার ফাটলগুলো উন্মোচন করে দেয়। এই মূলনীতি থেকেই প্রমাণিত হয় যে, যেকোনো ধরনের স্বাধীনতায় সবার সমান অধিকার থাকে না; বরং কিছু নির্দিষ্ট স্বাধীনতায় প্রত্যেকের সমান অধিকার থাকে। অর্থাৎ প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিই সমানসংখ্যক নির্দিষ্ট কিছু স্বাধীনতা লাভ করবে। ধরুন আপনি ঠিক করে দিলেন, 'তুমি অমুক অমুক এবং অমুক জিনিসের মধ্যে কোনো একটি পছন্দ করো।' এটা কিন্তু স্বাধীনতা নয়। আপনি তার সীমা ঠিক করে দিয়েছেন। স্বাধীনতা যদি আগে থেকেই ঠিক করে দেওয়া থাকে তবে তা তো স্বাধীনতা নয়; বরং পূর্বনির্ধারিত কিছু অপশনমাত্র।

শকলারের দৃষ্টিভঙ্গিকে সমর্থন করে রাজনৈতিক দার্শনিক জোসেফ রাজ বলেন, 'একজন ব্যক্তিকে তখনই স্বাধীন বলা যায় যখন তার কাছে পছন্দ করার মতো বিভিন্নরকম গ্রহণযোগ্য অপশন থাকে এবং সে যেকোনোটিকে বাছাই করে সে অনুযায়ী তার জীবন পরিচালনা করতে সক্ষম হয়।[১] যে স্বাধীনতা ব্যক্তিকে ভালোর দিকে পরিচালিত করে না সে স্বাধীনতা অর্থহীন। তাই মূল্যহীন এবং খারাপ অপশনগুলোকে স্বাধীনতার অন্তর্ভুক্ত করা এবং তা রক্ষা করার কোনো মানেই হয় না। মানুষের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য যেসব পদক্ষেপ নেওয়া আবশ্যক সেসব পদক্ষেপ গ্রহণে মানুষকে বাধ্য করা এমনকি বলপ্রয়োগ করাও বৈধ। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে সভ্য করে তুলতে যেকোনো প্রকার পদক্ষেপ নেওয়া বৈধ। এতে করে যদি তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি বিলুপ্তও হয়ে যায় কিংবা তাদের ওপর বিভিন্ন প্রক্রিয়া আরোপের কারণে তাদের সংস্কৃতি বিকৃত হয়ে যায় তবুও'।

এসব নীতি থেকে বোঝা যায় যে লিবারেল আদর্শের এক রহস্যময় বিচারক আছে যে ঠিক করে দেয় কোনটা 'ভালো', 'খারাপ', 'মূল্যহীন' এবং কখন কোনো ব্যক্তির বা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের 'ব্যক্তিস্বাধীনতায়' হস্তক্ষেপ করা 'আবশ্যক'। এই সূত্রানুসারে 'ব্যক্তিস্বাধীনতা' কিন্তু নির্দিষ্ট ব্যক্তির জন্য সংরক্ষিত, যে ঠিক করবে মানুষ কখন কতটুকু স্বাধীনতা পাবে।

এসব বৈষম্য লিবারেলিজমের সাথে মোটেই সাংঘর্ষিক না; বরং তা এই নীতি বিবর্জিত আদর্শের অস্তিত্ব রক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া। এমন একটি আদর্শ কখনোই মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা পালনের অধিকার দেয় না। বরং তারা নিজেদের মতো ভালো খারাপের মানদণ্ড নির্ধারণ করে দেয় এবং একজন ব্যক্তির স্বাধীনতার 'গ্রহণযোগ্য অপশনগুলো' কী হবে তা ঠিক করে দেয়। কাজেই লিবারেল সমাজ ব্যবস্থায় একজন নারীর নিকাব পরার স্বাধীনতা অস্বীকার করাটাই

---

[১] Raz, Joseph, *The Morality of Freedom* (Oxford: Clarendon Press, 1986), pp2, 204, 411, 416, 424

স্বাভাবিক। নিকাবের বিরুদ্ধাচরণ তাদের মূল্যবোধের সাংঘর্ষিক না। তাদের দৃষ্টিতে নিকাবকে নিষিদ্ধ করা অবৈধ কিছু না; বরং লিবারেলিজমের নীতিই হলো ভিন্ন সংস্কৃতির সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে নিজের মতো 'সভ্য' করতে বলপ্রয়োগ করা।

অটোম্যান খিলাফাহর মতো অতীতের ইসলামিক সমাজব্যবস্থা বুঝতে পেরেছিল যে বিভিন্ন সংস্কৃতির এবং ধর্মের একাধিক সম্প্রদায়কে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হলে তাদেরকে তাদের নিজস্ব রীতিনীতি চর্চার সুযোগ দিতে হবে। তাই অটোম্যান খিলাফাহর বহুসাংস্কৃতিক সমাজব্যবস্থায় খ্রিষ্টান এবং ইহুদিদেরও অন্য সকলের মতো নিজস্ব সংস্কৃতি উদ্‌যাপন করতে দেখা গিয়েছিল। তারা তাদের পছন্দ অনুযায়ী ব্যবসা পরিচালনা করত এবং তাদের ছিল নিজস্ব খাদ্যাভ্যাস এবং ভাষা। এমনকি তাদের ছিল নিজস্ব আদালত, যেখানে তাদের নিজেদের ধর্মীয় আইন অনুসারে বিচারকার্য সম্পন্ন হতো। পুরোপুরি ভিন্ন সংস্কৃতির বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠী সম্প্রতির সাথে একত্রে বসবাস করত। কখনোই সংখ্যালঘুদের তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের ওপর কোনো ধরনের আঘাতের সম্মুখীন হতে হয়নি। কিংবা তাদেরকে কখনো মুসলিমদের অনুকরণে কিছু করতে বাধ্য করা হয়নি।

জোরপূর্বক আত্তীকরণের (forced assimilation) ধারণাটি হলো লিবারেলিজমের অধীনে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক বা ধর্মীয় গোষ্ঠীকে নিয়ন্ত্রণ করার পদ্ধতি। সর্বোচ্চ নৈতিক মূল্যবোধ নিশ্চিত করার জন্য প্রচেষ্টা চালানোর বদলে লিবারেলিজম সব আদর্শকে বল প্রয়োগ করে বা প্রোপাগান্ডা চালিয়ে শেষ করে দেয়। এজন্যই লিবারেল সমাজব্যবস্থায় বহুজাতিক সমাজ গড়ে ওঠা প্রায় অসম্ভব বললেই চলে। আর শেষমেশ আমরা দেখতে পাই লিবারেল গণতন্ত্রের অধীনে খ্রিষ্টান বা ইহুদি ধর্মের সেক্যুলার সংস্করণ; যা মূলত লিবারেলিজমেরই আরেক রূপ।

ব্যক্তিস্বাধীনতা নয়, ঈমান; প্রভু নই, মুমিন

ইসলামের একটি দৃঢ় বুদ্ধিবৃত্তিক আদর্শিক ভিত্তি এবং মানবজীবনের সুসংহত সামগ্রিক পরিকল্পনা থাকার কারণে তার মোকাবিলা করা লিবারেলদের জন্য বরাবরই অনেক কঠিন। ইসলামের আদর্শের সাথে লিবারেল আদর্শের মৌলিক পার্থক্য হলো স্বাধীনতার বিষয়টি।

যখন আমিনা টাইলার (Amina Tyler) উলঙ্গ হয়ে দাবি করেছিল—'আমার শরীর আমার, তা অন্য কারও সম্মানের উৎস না' (নিঃসন্দেহে তার শরীর সেসময় কারোরই সম্মানের উৎস ছিল না) তখন নারীবাদীরা তাকে পূর্ণ সমর্থন দিয়েছিল। সে তখন তার নিজের সংস্কৃতিকে উপেক্ষা করে লিবারেল নারীবাদের অন্যতম মূলনীতি তুলে ধরছিল—'নিজের শরীরের ওপর নিজের মালিকানা'।

এভাবেই নারীবাদীদের নারী স্বাতন্ত্র্যের আন্দোলন শক্তিশালী হয়।

লিবারেল নারীবাদীরা দীর্ঘদিন ধরেই এক অযৌক্তিক অভিযোগ করে আসছে যে, নারীদেরকে কেবল শারীরিক সত্তা হিসেবে দেখা হয়, তাদের শরীরের ভেতর যে একটা বুদ্ধিবৃত্তিক সত্তা রয়েছে তাকে নাকচ করা হয়। তারা এই ধারণাকে 'আবদ্ধকরণ' (enmeshment) বা 'মূর্তকরণ' (embodiment) বলে থাকে। নারীবাদীদের মতে, 'নারীরা পুরুষের চেয়ে বেশি জৈবিক, বেশি দৈহিক, এবং বেশি প্রাকৃতিক'।[১০] তারা তর্ক জুড়ে দেয়, 'আমি কেবল আমার দেহই নই, আমি আমার শরীরের মালিক'।

পুরুষ কিংবা নারী—কেউই আমরা নিজেদের শরীরের মালিকানা দাবি করতে পারি না। মালিকানা বলতে যদি নিয়ন্ত্রণ করা বোঝায় তাহলে মূলত আমাদের কারোরই নিজ শরীরের মালিকানা নেই। আমরা কি নিজেরা নিজেদের জন্ম দিয়েছি? নিজেদের তৈরি করেছি? কিংবা নিজেদের আকার-আকৃতি নির্ধারণ করেছি? মালিকানা বলতে যদি রক্ষণাবেক্ষণ বোঝায় তবে আমরা কি শিশু এবং বৃদ্ধ বয়সে নিজেদের রক্ষণাবেক্ষণ করতে সক্ষম? নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা এবং মানসিক সুস্থতার জন্য কি আমরা আমাদের চারপাশের পরিবেশ এবং সমাজের ওপর নির্ভরশীল নই? আমাদেরকে ভাষা কে শিখেয়েছে? আমাদের চিন্তাশক্তি কে দিয়েছে? শত শত বছরের আহরিত জ্ঞান কি আমরা নিজে নিজেই একবারে আবিষ্কার করে ফেলেছি? ইসলাম স্বীকার করে যে আসলে এ দেহের মালিক আমরা নই। আর এ কারণেই আমরা আমাদের দেহের সাথে যা ইচ্ছা করতে পারি না। এ শরীর আমাদের নিকট আমানতস্বরূপ এবং আমাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে এর রক্ষণাবেক্ষণ করা। যেসব মুসলিম নারী নিকাব পরেন তারা ইচ্ছা হয়েছে বলে বা স্বামী জোর করেছেন বলে পরেন না (যেমনটা লিবারেলদের ধারণা); বরং তারা নিকাব পরেন ঈমান এবং দায়িত্ববোধ থেকে।

নারীবাদীরা নারীদের 'আবদ্ধকরণ' নিয়ে অভিযোগ করে বলে, নারীদের এ অবস্থা ছিল ঔপনিবেশিক সময়ের নিম্নশ্রেণির জনগোষ্ঠীতে।[১১] বিষয়টা হাস্যকর ঠেকে যখন তারা মুসলিম নারীদেরকে পর্দায় আবৃত একটি বিবেকহীন দেহ হিসেবে বিবেচনা করে। নিকাব পরিহিতা মুসলিম নারীদেরও যে যৌক্তিক চিন্তাভাবনা করা ক্ষমতা আছে এবং সে নিজেও চিন্তাশক্তি দিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারে নিজের স্রষ্টার

---

[১০] Grosz, Elizabeth, *Volatile Bodies: Towards a Corporeal Feminism* (London: Routledge, 1994), pp14

[১১] Mc Clintock, Anne, *Imperial Leather: Race, Gender and Sexuality in the Colonial Contest* (New York: Routledge, 1995); Alcoff, Linda Martin, Visible Identities, Race, Gender, and the Self (New York: Oxford University Press, 2006) pp103.

কাছে আত্মসমর্পণ করবে কি-না ও পর্দা অবলম্বন করবে কি-না, বিষয়টি তারা নিজেরাও ভাবে না। নারীবাদের ব্যাখ্যায় আমেরিকার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মন্তব্য করেন, 'নারীবাদীদের ধারণা পশ্চিমারা ব্যতীত অন্য সবাই নিজস্ব সংস্কৃতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং পশ্চিমারাই কেবল যৌক্তিকভাবে চিন্তা করে'।[১২]

একজন মুসলিম নারীর জনজীবনে অংশগ্রহণের পূর্বশর্ত হলো নিজেকে আবৃত করা। আরবিতে পর্দার (নিকাব) ব্যুৎপত্তিগত শব্দ হলো 'ন-ক-ব' যার অর্থ ভেদ করা, খনন করা, অন্বেষণ করা এবং ভ্রমণ করা। নিকাব পরিহিতা নারীরা সম্পূর্ণ সুরক্ষার সাথে সমাজে চলাফেরা করতে পারে, সামাজিক কার্যক্রমে নিজের উপস্থিতি তুলে ধরতে পারে, লোকজনের গবেষণার বস্তুতে পরিণত না হয়েই বিশ্বকে পর্যবেক্ষণ করতে পারে। আর নিকাবই তাদের এসব অধিকার নিশ্চিত করে।

নারীবাদীদের মতে নারীর লজ্জাশীলতা কিংবা পোশাকের ব্যাপারে একজন নারীর ন্যূনতম যে সামাজিক মূল্যবোধ, তা নারীকে পরাধীন করে। এসব প্রমাণ করে একজন নারীর দেহ মূলত তার নিজের নয়। তারা মনে করে এসব পোশাক যে কেবল নারীর পরিচয় কেড়ে নেয় তা-ই নয়; বরং তা পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাকেও শক্তিশালী করে যেখানে পুরুষ বলে দেবে নারীর কি করা উচিত এবং কি করা উচিত নয়। অথচ এসব লিবারেল নারীবাদীরাই কর্তা হয়ে উঠতে চায়, একে নিজের জন্মগত অধিকার ভাবে!

পাশ্চাত্যে লিবারেল গণতন্ত্রের অধীনে থাকা নারীদের নিকাব না পরার অধিকার যেমন আছে ঠিক তেমনই কি নিকাব পরার অধিকার থাকা উচিত ছিল না? আমরা দেখেছি যে লিবারেল স্বাধীনতার ধারণাকে নিকাবের অধিকারের পক্ষে যুক্তি হিসেবে ব্যবহার বোকামি ছাড়া কিছু না। লিবারেলিজম আসলে মানুষকে সকল প্রকার স্বাধীনতা দেওয়ার কথা বলে না। তারা তাদের স্বার্থ দেখেই নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে স্বাধীনতা দেয়। এই 'স্বাধীনতা' অন্য সকলের ওপর চাপিয়ে দেয়। এই নীতি লিবারেল আদর্শের সাথে সাংঘর্ষিক নয়; বরং এটিই লিবারেলিজম। লিবারেলিজম নিজের আদর্শ, স্বার্থ রক্ষার্থে ভিন্ন মতাবলম্বী জনগোষ্ঠীর মৌলিক অধিকার হরণ করে। এই ক্ষয়িষ্ণু লিবারেল গণতন্ত্রের বিকল্প হিসেবে আমাদের উচিত ইসলামের ইতিহাসের দিকে নজর দেওয়া, ইসলামি সমাজের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা। অনেক সংস্কৃতি, অনেক আদর্শের এ পৃথিবীতে কেবল ইসলামই নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্যতা রাখে।[১৩]

---

[১২] Volpp, Leti *Feminism versus Multiculturalism*, in Columbia Law Review, Vol. 101, No. 5 (Jun, 2001), pp1181-1218.

[১৩] আন্তর্জাতিক বক্তা ও লেখিকা জারা ফারিসের নিজস্ব ওয়েবসাইটে প্রকাশিত '*Why Liberalism does not want you to wear the niqab?*' প্রবন্ধ অবলম্বনে।

নারী নেতৃত্ব

নারীর ক্ষমতায়ন কি ন্যায়বিচার নিশ্চিত করে?

ক্ষমতাসীনদের সব মানুষের প্রতিনিধিত্ব করা উচিত, বিশেষ কোনো গোষ্ঠীর নয়। নারীবাদীরা অভিযোগ করে যে নারীরা ক্ষমতায়ন এবং প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রে পিছিয়ে আছে বলে নারীদের ক্ষমতায় যাওয়া উচিত।[১৪] তাদের মতে, প্রশাসনে নারীর উত্থান এবং প্রবেশাধিকার বাড়ানো হলো 'সামাজিক ন্যায়বিচার' এর অংশ।[১৫] যদি নারীরা ক্ষমতায় না যায় তবে নারীর ওপর ইচ্ছামতো আইনি নিষ্পেষণ চালু রেখে পুরুষতন্ত্র আজীবন টিকে থাকবে, তাদের আধিপত্য থেকে যাবে স্বমহিমায়। নারীবাদী ফসেট সোসাইটি (Fawcett Society) বলেছে, "ক্ষমতার শীর্ষ চূড়ায় নারী অনুপস্থিত [...] যদি আপনি টেবিলে না থাকেন, তাহলে আপনাকে অবশ্যই মেনুতে থাকতে হবে"।[১৬]

এসব দাবি করার সময় নারীবাদীরা ভুলে যায় ক্ষমতার শীর্ষে পুরুষ থাকলে যদি নারীকে মেনুতে থাকতে হয়, তাহলে গুটিকয়েক সেসব ক্ষমতাধর পুরুষ বাদে বাকি সব পুরুষকেও মেনুতেই থাকতে হয়। সব পুরুষ সমান নয়—তাদের মধ্যে বুদ্ধি, দায়িত্ব, শক্তি, সম্পদ, চেহারা এবং শ্রেণির পার্থক্য আছে। শুধু বিশেষ একটি অভিজাত শ্রেণিই নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ পায়। ক্ষমতায় থাকা একটা ক্ষুদ্র অংশ সমগ্র পুরুষ জাতির প্রতিনিধিত্ব করে এমন বলা যেমন হাস্যকর, ঠিক তেমনই ক্ষমতায় থাকা নারীদের একটি ক্ষুদ্র অংশ সকল নারীর প্রতিনিধিত্ব করবে বলে দাবি করাটাও একইভাবে হাস্যকর। তারা জুলুমতন্ত্র বদলাতে চায় না বরং এর মধ্যেই ফিট করতে চায়। অন্যায়-অপশাসনের বিরুদ্ধে কোনো অবস্থান না রেখে সে অপশাসনের প্রশাসনেই তারা একটি চেয়ার দাবি করে। নারীবাদীরা যদি তাদের ন্যায়বিচারের আহ্বানে আন্তরিক হতো, তবে নারী জাতির মধ্যে এ শ্রেণি বৈষম্য নিজেরাই তৈরি করতে চাইত না। বরং সম্পূর্ণরূপে একটি বিকল্প ব্যবস্থার দাবি নিয়ে আসত।

---

[১৪] http://www.fawcettsociety.org.uk/activity/women-and-power/

[১৫] প্রাগুক্ত।

[১৬] http://www.fawcettsociety.org.uk/women-and-politics/

নারীদের উপকারের জন্য যা করা উচিত তা না করে যা করা অনুচিত তাই করে নারীবাদীরা। নারীবাদীদের মৌলিক একটি দাবি হলো, পুরুষরা প্রতিনিয়ত নারীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে। কারণ হলো, তারা পুরুষ। নারীরা অবশ্যই ন্যায়বিচার করবে, কারণ তারা নারী। তাদের মতে, পুরুষই সমস্যা, বিপরীতে নারী হলো সমাধান। নারীদের বিরুদ্ধে সাধারণভাবে এ ধরনের সেক্সিস্ট অভিযোগ করা হলে নারীবাদীরা কি ক্ষুব্ধ হতো না? উল্লেখযোগ্য পরিমাণ নারী না থাকলেই যে পুরুষরা প্রতিটি সময় নারীদের বিরুদ্ধে বৈষম্য করে তা সর্বৈবই মিথ্যা। উদাহরণস্বরূপ এই বছরের শুরুর দিকে, 'Counting Women In' সংস্থা থেকে 'Sex and Power ২০১৩ : Who runs Britain?' নামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। সেখানে বলা হয় 'ক্ষমতা থেকে নারীদের বাদ দেওয়া নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্যই ক্ষতিকর'। হাইকোর্টের বিচারকদের মধ্যে যে মাত্র ১৫.৬% নারী তা নিয়ে এ রিপোর্টটিতে দুঃখ প্রকাশ করা হয়েছে। তবুও এ 'পুরুষ শাসিত' আদালতে একই অপরাধের জন্য একজন নারীর তুলনায় একজন পুরুষের বেশি শাস্তি হয়।[১৭] প্রতিবেদনটিতে আরও অভিযোগ করা হয়েছে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের মাত্র ১৪.২% নারী। অথচ HESA পরিসংখ্যান (Higher Education Statistics Agency) অনুসারে, ২০১০/১১ সেশনে বিশ্ববিদ্যালয়ে নারীরা পুরুষের তুলনায় অনেক বেশি এগিয়ে ছিল। ডিগ্রি অর্জনে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের মধ্যে পুরুষের তুলনায় নারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল বেশি। প্রথম শ্রেণির ডিগ্রিধারী শিক্ষার্থীর মোট সংখ্যা ৫৭%। তাদের মধ্যে প্রথম শ্রেণির এবং উচ্চতর দ্বিতীয় শ্রেণির ডিগ্রিধারী নারী গ্র্যাজুয়েটের সংখ্যা ৬৬% যেখানে পুরুষ গ্র্যাজুয়েটের সংখ্যা ৬১%।[১৮] তাও কিনা পুরুষতন্ত্রই নারীর অবনতির জন্য দায়ী!

নারী-মাত্রই কি ন্যায়বিচার করে? যদিও এটি খুবই অযৌক্তিক সেক্সিস্ট ধারণা, তাও যুক্তির খাতিরে একে সাময়িক মেনে নিয়ে বিনোদন নেওয়া যাক। রুয়ান্ডা, আলজেরিয়া, ইরাক, তিউনিসিয়া, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, দক্ষিণ সুদান এবং উগান্ডা—এরা প্রত্যেকে দরিদ্র রাষ্ট্র এবং নারীবাদীরা এসব দেশকে নারীদের বিরুদ্ধে সহিংস হিসেবে দেখায়। অথচ সংসদীয় প্রতিনিধিত্বের কথা বললে উল্লিখিত প্রতিটি দেশে সরকারি কাজে আমেরিকার চেয়ে বেশি নারী নিয়োজিত।[১৯] রুয়ান্ডায় পার্লামেন্টে নারীর সংখ্যা পুরুষের চেয়ে বেশি। তবুও

---

[১৭] For the UK, see the Hansard debate with MP Philip Davies:
http://www.theyworkforyou.com/whall/?id=2012-10-16a.32.1. See also for the US: http://www.huffingtonpost.com/2012/09/11/men-women-prison-sentence-length-gender-gap_n_1874742.html

[১৮] http://www.bbc.co.uk/news/education-16530012

[১৯] http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm

রুয়ান্ডার জনসংখ্যার ৪৫% দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে। রুয়ান্ডার নারী উন্নয়ন মন্ত্রী একজন নারীবাদী কর্মী। তিনি গণহত্যার জন্য দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন। তিনি সেনাবাহিনী কর্তৃক বর্বরভাবে হাজার হাজার উদ্বাস্তুকে হত্যার পুরস্কার হিসেবে তাদের নারীদেরকে ধর্ষণ করতে বলেছিলেন। সুতরাং একজন নারী ক্ষমতায় যাওয়া যেখানে ন্যূনতম মানবতা নিশ্চিত করারই সামান্যতম গ্যারান্টি দেয় না, সেখানে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা তো বহু দূরের ব্যাপার। ভারত, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশে একইভাবে নারী শাসক ছিল। কিন্তু তারা ক্ষমতায় থাকা উচ্চবিত্ত শ্রেণির নারীদের পদবি ভারী করা ছাড়া সাধারণ নারী-পুরুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য কোনো ভূমিকা রাখতে পারেননি। আদতে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং পার্লামেন্টে নারীসংখ্যা বৃদ্ধি এ দুয়ের মধ্যে স্পষ্টভাবেই কোনো সম্পর্ক নেই।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নারী সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটার থাকা সত্ত্বেও (৫৩%) পার্লামেন্টে নারী প্রতিনিধিত্বের সংখ্যায় আমেরিকা এ দেশগুলোর পিছিয়ে ছিল।[২০] অবাক করা বিষয় হলো, নারীরা নারীকে নির্বাচন না করে 'ভুল লিঙ্গ' অর্থাৎ একজন পুরুষ প্রার্থীকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করছে। এ ক্ষেত্রে নারীবাদীদের উচিত ছিল নারীদের পছন্দকে সম্মান করা। কিন্তু তারা তা না করে নারী ভোটারদেরকেই দোষারোপ করতে থাকে। এরাই পার্লামেন্টে আবার সংরক্ষিত মহিলা কোটার কথা বলে।

ন্যায়বিচার পাওয়ার জন্য নারীর ক্ষমতার প্রয়োজন নেই। নারী ক্ষমতায়ন ন্যায়বিচার নিশ্চিত করে না।

প্রশাসনে নারী অবস্থান আন্দোলন জুলুমতন্ত্রকেই শক্তিশালী করে

নারীবাদীরা দাবি করে যে নারী ক্ষমতায় যাওয়ার মানেই হলো নারীর অধিকার নিশ্চিত করা, সুযোগ বৃদ্ধি করা। বাস্তবে নারীদের ইচ্ছার কোনো পাত্তাই নেই তাদের কাছে। তারা নিজেদের মতো কিছু আইন বানায়, এরপর তা প্রকাশ করে দাবি করে যে এগুলোই আসলে নারীর জন্য ভালো, আর কিছুই ভালো না। সব সেক্সিস্ট। জুলুমতন্ত্র, পুঁজিবাদের এ যুগে পুরুষরা যেসব নিপীড়ন ভোগ করে তারা চায় নারীরাও তাই ভোগ করুক। এটাই নাকি সম্মান। যদি জ্যাক পাহাড়ের নিচে পড়ে যায় তবে কি জিলকেও পরে যেতে হবে?

নারীবাদীরা দাবি করে নারীরা ক্ষমতার নতুন সংজ্ঞা দেবে। ২০১৩ তে ফোর্বস কর্তৃক বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাধর একশজন নারীর নামের তালিকা প্রকাশকালে

---

[২০] http://www.bbc.co.uk/news/magazine-20231337

ফোর্বস এর মহিলা সম্পাদক বলেন, তিনি পুরোনো রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তির সংজ্ঞায়নে নয়; বরং ক্ষমতার নতুন চিন্তা লালনকারী নারীদের নির্বাচন করতে চেয়েছেন। তার তথাকথিত 'নতুন' তালিকাটিতে ছিল প্রায় ৯জন রাষ্ট্রপ্রধান যাদের সম্মিলিত জিডিপি ১১.৮ ট্রিলিয়ন ডলার, ২৪ জন সিইও যারা ৮৯৩ বিলিয়ন ডলার নিয়ন্ত্রণ করেন এবং ১৪ জন বিলিয়নিয়ার যাদের কাছে ৮২ বিলিয়ন ডলারের বেশি টাকা আছে। বিয়ন্স (#১৭), অ্যাঞ্জেলিনা জোলি (#৩৭), এবং সোফিয়া ভার্গারা (#৩৮) সবাই ইংল্যান্ডের রানির (#৪০) আগে ছিলেন; কিন্তু সবার সামনে ছিলেন মিশেল ওবামা (#৪)। কেননা তিনি পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষমতাশালী পুরুষ বারাক ওবামার স্ত্রী! আসলে নারীবাদীদের ক্ষমতার এ নতুন সংজ্ঞা কোনোদিক থেকেই পুরুষতন্ত্রের চেয়ে ভিন্ন নয়।

নারীবাদীরা প্রকৃত পরিবর্তন চায় না; বরং দীর্ঘদিন যাবৎ যার দায়ে তারা পুরুষদেরকে অভিযুক্ত করে আসছে ক্ষমতা আত্মসাৎ করে ঠিক একই নিপীড়নমূলক নিয়ম সবার ওপরে চাপিয়ে দিতে চায়।

নারীবাদীরা দাবি করেন, পুরুষশাসিত পুঁজিবাদী ব্যবস্থা দীর্ঘদিন ধরে নারীদেরকে অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু করে রেখেছে, তাদেরকে পুরুষদের ওপর নির্ভর হতে বাধ্য করেছে (কারণ পুরুষরা স্বাভাবিকভাবেই আর্থিক দায়িত্ব পালন করতে পছন্দ করে)। নারীবাদীরা মনে করে, পুঁজিবাদ তাদের উন্নয়নের পথে বাধা হিসেবে রেখে দিয়েছে পুরুষকে। বাস্তবে পুঁজিবাদ পুরুষের উন্নয়নের পথে বাধা হিসেবে রেখেছে চাকরিকে। পুঁজিবাদ বলতে নারীর ওপর পুরুষের নিপীড়ন বোঝায় না, বোঝায় দরিদ্রের ওপর ধনীর শোষণ। সামাজিক ন্যায়বিচারের পক্ষে দাঁড়ানো এবং লাখ লাখ পুরুষকে দেউলিয়া করে ছাড়া পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করার বদলে নারীবাদীরা নারীকেও দেউলিয়া বানাতে চায়। তারা ঘরের বাইরে নারীকে কাজ করতে বাধ্য করছে, নারীকে শালীনতা বিসর্জন দিয়ে শোষণের পথে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান করছে। ফলে ক্ষমতাবান অভিজাতরা খুব ভালোভাবে নারীকে বিনা বাধায় শোষণ করতে পারবে, দাস বানাতে পারবে এবং তাদের ওপরও ট্যাক্স বসাতে পারবে। উন্নয়ন!

নারী ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে পুঁজিবাদ এবং নারীবাদ দুই আদর্শই পারিবারিক বন্ধনকে ছিন্ন করতে, Divide & Rule করতে সর্ববস্থায় একাট্টা। নারীবাদী আন্দোলনকে তুঙ্গে তোলার অন্যতম কারিগর সিমোন ডি বোভোয়ার (যার বই অনুবাদ করে 'দ্বিতীয় লিঙ্গ' নামে প্রকাশ করেছেন হুমায়ূন আজাদ) বলেছেন, "কোনো নারীরই সন্তান লালনপালনের জন্য ঘরে থাকা উচিত নয় [...] ইচ্ছা করলেও নারীদের এমনটি করা উচিত নয়। স্বেচ্ছায় এমন পছন্দের উদাহরণ তৈরি হলে অনেক নারীই

এমনটা বেছে নেবে। এভাবে নারীকে ভুল পথে টেনে নেওয়া হয়"।

বোঝাই যাচ্ছে, নারীর সহজাত চাওয়ার কোনো মূল্য নেই নারীবাদীদের কাছে। নারীবাদ আসলে একটি বিশ্বাস, একটি ওয়ার্ল্ডভিউ। এটিই তারা মানুষের ওপর চাপিয়ে দেয় নারীদের ভালোত্বের মুখোশে।

নেতৃত্বে অল্পকিছু পুরুষের প্রভাব এবং আধিপত্য বিস্তার নিয়ে নারীবাদীরা অভিযোগ করে অথচ এ সত্যটি কখনোই উল্লেখ করে না যে প্রায় প্রতিটি পুরুষকে গড়ে তোলেন একজন নারী। একজন শিশুর বেড়ে ওঠার পেছনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে নিঃসন্দেহে তার 'মা'। প্রত্যেক তথাকথিত পুরুষতান্ত্রিক পুরুষই কোনো না কোনো নারীর স্নেহ, মমতা, ভালোবাসা এবং আদর্শেই প্রতিপালিত হয়েছেন। নারীবাদীরা নিজেদের অধিকারের দাবিতে সবসময় সোচ্চার, কিন্তু দায়িত্বের কথা আসলে কেন চুপ হয়ে যান তারা? একজন নারীর কাছে সন্তান লালনপালন করার চেয়ে বড় দায়িত্ব আর কী হতে পারে? পরবর্তী প্রজন্মকে মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার চেয়ে মৌলিক কাজ আর কি হতে পারে? পরম যত্ন দিয়ে চোখের সামনে তাদেরকে পরিপূর্ণ মানুষ করে তোলা এবং নিজের আদর্শে উজ্জীবিত হওয়া সন্তানদের ভালো মন্দের বিচার করতে দেখা—এর চেয়ে প্রশান্তির আর কি হতে পারে? ইসলামে একজন স্ত্রীকে ঘরের পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে অথচ কজন পুরুষের কাজের জায়গায় তাদের সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব থাকে? নারীবাদীরা এটিকে উপেক্ষা করে কেননা এটি স্বীকার করলে অকপটে স্বীকার করতে হবে যে নারীরাই মোটের ওপর ক্ষমতাশীল। সম্ভবত পুরুষের চেয়েও বেশি। সেইসাথে এটাকেও স্বীকার করতে হবে যে প্রকৃত ক্ষমতা মানে একনায়কতন্ত্র নয়, বরং ক্ষমতা মানে দায়িত্বশীলতা।

মায়ের দায়িত্ব থেকে নারীদেরকে পুরোপুরি বের করে আনা শুধু যে নারীদেরকেই বঞ্চিত করছে তা নয়; বরং চাইল্ডকেয়ার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সরকারকেও সুযোগ করে দিচ্ছে বাচ্চাদেরকে সরকারের পছন্দমতো বানিয়ে নিতে। বাচ্চারা এভাবে কম বয়সেই বাইরের শিক্ষায় লালিত হয়। এমন ধরনের সিস্টেমে নারীদের ক্ষমতায় যাওয়ার কোনো দরকার নেই, যে সিস্টেমে জুলুমতন্ত্র শক্তিশালী হয়।

ক্ষমতা অধিকার নয়, দায়িত্ব

নারীবাদী এবং পশ্চিমা চিন্তায় ক্ষমতার সংজ্ঞায়নেই মূলত ভুলটা হয়ে যায়। অবশ্য ভোগবাদী এসব আদর্শে এর চেয়ে বেশি কিছু আশাও করা যায় না। ক্ষমতা কোনো সুযোগ নয়, এটি একটি বোঝা। ক্ষমতা মানে দায়িত্ব, অধিকার নয়। ক্ষমতা সবসময়

দুর্নীতির দিকে টানে[২১] এবং ক্ষমতায় যারা থাকেন তাদেরকে সবসময় সংযম চর্চা করতে হয়। ক্ষমতা আরোপ করার বিষয়, চেয়ে নেওয়ার বিষয় নয়। একজন সুশাসক সকল জনতার জন্য চিন্তা করেন, তাদের সবার অধিকার রক্ষায় দিনরাত কষ্ট করেন, নির্দিষ্ট কোনো দলের বা গ্রুপের স্বার্থ নয়। একটি সুশাসনে একজন নেতা নিজের ইচ্ছামতো শাসনকার্য পরিচালনা করতে পারে না। তাকে নির্দিষ্ট আইন অনুসারে পরামর্শ করে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে হয়। রাষ্ট্রের মৌলিক নীতিমালার উৎস শারিআহ—যার মর্যাদা সবার আগে। এ নীতিমালা নারী ও পুরুষ উভয়ের অধিকার রক্ষার নিশ্চয়তা দেয়। রাষ্ট্র 'কে' পরিচালনা করছে তার কোনো প্রভাব জনগণের ওপর পড়ে না বরং নেতাকে তাঁর প্রতিটি কাজের জন্য জবাবদিহি করতে হয়। যে ক্ষমতা পাওয়ার আবেদন করে সে ইতিমধ্যেই ক্ষমতা পাওয়ার অযোগ্য। একজন নেতা শাসন নয়, সেবা করতে বাধ্য। আর এটিই ইসলামে ক্ষমতা বা নেতৃত্বের ধারণা।

ইসলামে রাজনীতি এবং সরকারে নারী অংশগ্রহণ করতে পারে। তবে তা ইসলাম যতটুকু অধিকার দিয়েছে ততটুকুই। হাদিস ও ইসলামি আইনশাস্ত্রে একজন নারী অভিজ্ঞ হতে পারেন, মানুষকে শিক্ষা দিতে পারেন এবং বিচারকার্যে অবদান রাখতে পারেন। নারী-পুরুষ উভয়েরই দায়িত্ব রাষ্ট্রীয় অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো। খলিফা বা রাষ্ট্রপ্রধানদেরকে ম্যান্ডেট দেওয়া বা আনুগত্য প্রদানের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ সমান। যদি কোনো হারবি কাফিরকে কোনো নারী আশ্রয় দেয়, সে ক্ষেত্রে খলিফাকে নারীর বিবেচনার ওপর আস্থা রেখেই তাঁর সিদ্ধান্তকে সম্মান করতে হয়, সুরক্ষা দিতে হয়।

ইসলামে রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার 'অধিকার' নারী-পুরুষ কাউকেই দেওয়া হয়নি। পুরুষকে এ 'দায়িত্ব' দেওয়া হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই নারীকে এ দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। ইসলামি রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান বর্তমান বিশ্ব নেতাদের মতো কোনো অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা কিংবা ভাতা পান না। জনসেবায় নিয়োজিত না থাকলে তিনি যে পরিমাণ অর্থ উপার্জন করতেন সে অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ হিসেবে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ তাঁকে দেওয়া হয়। ইসলামে রাষ্ট্রপ্রধান রাষ্ট্রের সকল জনগণের ব্যাপারে দায়িত্বশীল, প্রতিটি নাগরিকের অধিকারের ব্যাপারে তাঁকে জবাবদিহি করতে হয়। নেতৃত্বের ব্যাপারটি অনেকটাই বাধ্যতামূলক সামরিক ড্রাফটিং এর মতো। কিন্তু সেখানে নারীকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। দেশরক্ষার দায়িত্ব শুধু পুরুষকেই দেওয়া হয় সে ক্ষেত্রে।

নারীরা যদি সত্যিই সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে চায়, সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত

[২১] Herbert Dune

অধিকারের বাস্তবায়ন চায় তাহলে নারীবাদীদের অসামঞ্জস্যপূর্ণ এসব জগাখিচুরি বক্তব্যে তাদের বিভ্রান্ত হলে চলবে না। এভাবে চলতে থাকে পুরোনো সাইকেল, অবস্থার কোনো পরিবর্তন আসে না। একজন নারীর উচিত আল্লাহর প্রতি তার কর্তব্য পালন করা। আল্লাহপ্রদত্ত আইন বাস্তবায়নে নিজেকে নিয়োজিত করা। যে আইন ক্ষমতায়নের চেয়ে ন্যায় প্রতিষ্ঠাকে বেশি গুরুত্ব দেয়। যে আদর্শের নারী-পুরুষ এবং সংখ্যালঘু গোষ্ঠীকে দারিদ্র্য, শোষণ এবং নিপীড়ন থেকে রক্ষার ঐতিহাসিক খ্যাতি রয়েছে। স্রষ্টাপ্রদত্ত মূল্যবোধ মেনে নেওয়া ছাড়া মানবজাতি অন্য কিছুতেই ন্যায়বিচার পাবে না। নারী ক্ষমতায় গেলেই ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা হয়ে যাবে না, নারী ক্ষমতায় গেলে জুলুমতন্ত্র পরিবর্তন হয় না। আর ক্ষমতায় যাওয়া কারও 'অধিকার' নয়। ক্ষমতা শুধু আল্লাহর, মানুষ কেবল তাঁর দেওয়া দায়িত্বই পালন করে।[২২]

---

[২২] আন্তর্জাতিক বক্তা ও লেখিকা জারা ফারিসের নিজস্ব ওয়েবসাইটে প্রকাশিত *'Do Women Need Power?'* অনুবাদ।

পুরুষতন্ত্র : নারীদের চাহিদা

Psychology Today[২৩]: রিসার্চে বলা হয়েছে, নারীরা আসলে সেক্সিস্ট পুরুষদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। গুল এবং কুফার প্রকাশির রিসার্চে বলা হয়, তারা অনেক ব্যক্তির ওপর রিসার্চ চালিয়েছে। তারা বিভিন্ন নারীর কীসের প্রতি আকর্ষণ, আকর্ষণের পেছনের কারণ খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছে।

সেক্সিস্ট শব্দটিকে খারাপভাবে দেখা হলেও, সেক্সিজম আমাদের সবার মধ্যেই আছে। সেক্সিজমের মানে হলো কেবল নারী-পুরুষের ভিন্নতাকে স্বীকার করে নেওয়া, তাদেরকে ভিন্নভাবে কাজে লাগানো এবং ভিন্ন আশা রাখা। সবাই বিষয়টি তাদের অন্তরের গহিনে লালন করে এবং আল্লাহর কিতাবেও বিষয়টি সত্য বলেই বলা হয়েছে, 'পুরুষ নারীর মতো নয়।' [আল কোরআন, ৩:৩৬]

আগের রিসার্চগুলোতে বলা হয়েছে, বিবর্তনবাদী জীববিজ্ঞানের মাধ্যমেই এগুলোর ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। দেখা যায়, নারীরা সবসময় অধিক পুরুষত্ব সম্পন্ন পুরুষদেরকেই পছন্দ করে, শারীরিক সুস্থতার দিকেও নজর রাখে। গুল এবং কুফারের (Gul and Kupfer) গবেষণা অতীত গবেষণার সাথে সম্পর্কিত হলেও তারা একটু ভিন্ন দিক নিয়ে চিন্তা করেছেন। তারা বলেন যে, সেক্সিস্ট পুরুষ, বিশেষ করে যেসব পুরুষ 'হিতৈষী সেক্সিজম' প্রদর্শন করে তাদের প্রতি নারীদের ঝোঁক বেশি থাকে। কারণ নারীরা মনে করে এ ধরনের পুরুষ নারীদের প্রতি বেশি যত্নবান, নিজেদের যাবতীয় বিষয়াশয় তারা স্ত্রী ও পরিবারের পেছনে ব্যয় করতে চায়।

ইসলাম যে পুরুষতন্ত্রের কথা বলে তাঁকে বোঝানোর জন্য 'হিতৈষী সেক্সিজম' একটি সুন্দর টার্ম হতে পারে। পুরুষতন্ত্রের সংজ্ঞা খুবই সাধারণ : একটি সামাজিক সিস্টেম যেখানে পুরুষ নারীর চেয়ে বেশি ক্ষমতা রাখে। পৃথিবীর ইতিহাসের প্রায় সব সমাজব্যবস্থাই পুরুষতান্ত্রিক ছিল। মুসলিম হিসেবে আমাদের এতটুকুই বোঝা জরুরি যে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সমাজ ছিল পুরুষতান্ত্রিক। সে সমাজে নিঃসন্দেহে পুরুষরা নেতৃত্বে ছিল, নারীদের চেয়ে পুরুষদের ক্ষমতা বেশি ছিল। আল্লাহও এমন

---

[২৩] https://www.psychologytoday.com/gb/blog/women-who-stray/201812/feminists-think-sexist-men-are-sexier-woke-men

পুরুষতান্ত্রিক সমাজের কথাই খুব পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করেছেন,

> ‘পুরুষরা নারীদের তত্ত্বাবধায়ক, এ কারণে যে, আল্লাহ তাদের একের ওপর অন্যকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং যেহেতু তারা নিজেদের সম্পদ থেকে ব্যয় করে।’ [আল কোরআন, ৪:৩৪]

কিছু এপোলজিস্টের ‘সৃজনশীল’ সব অনুবাদকে বাদ দিলে, আয়াতের শাব্দিক অর্থ খুব পরিষ্কার। ‘কাওওয়ামুন আলা’ খুব পরিষ্কার শব্দ। আল্লাহ নারীর ওপর পুরুষকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। কেননা তিনি এভাবেই তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তাদের কাজও ঠিক করে দিয়েছেন। কেবল তাই না, উদাহরণ হিসেবে রাসুলুল্লাহকেও ﷺ প্রেরণ করেছেন। কোরআন-সুন্নাহ যা দেখিয়েছে, তা-ই হিতৈষী পুরুষতন্ত্র। পুরুষরা তাদের বৈশিষ্ট্যের কারণেই নেতৃত্বে থাকবে। তারা নারীদের খেয়াল রাখবে, নিরাপত্তা দেবে, যেকোনো বিপদাপদ থেকে সাধ্যমতো রক্ষা করবে, সন্তানদের যাবতীয় চাহিদা পূরণ করবে ইত্যাদি। এ পুরুষতন্ত্রের কথাই ইসলাম বলে। এ পুরুষতন্ত্রই সবার জন্য উপকারী।

আল্লাহ নারী-পুরুষকে ভিন্ন ক্ষেত্রের জন্য ভিন্ন, কিন্তু সম্পূরক যোগ্যতা দিয়ে বানিয়েছেন, এটি আল্লাহর অন্যতম একটি প্রজ্ঞা। নারী-পুরুষ এভাবেই সভ্যতা, বিশ্বকে গড়ে তোলে।

নারীবাদীরা পুরুষতন্ত্রকে স্বভাবতই একটি জঘন্য সিস্টেম হিসেবে দেখে। তাদের মতে, পুরুষ নিজের স্বার্থে ও নারীদেরকে ধ্বংস করার জন্য নারীদের ওপর পুরুষতন্ত্র চাপিয়ে দিয়েছে। এ ধরনের পুরুষতন্ত্র আসলে নারীবাদীদের সৃষ্ট কাল্পনিক বুগিম্যান। হ্যাঁ, স্ত্রী ও কন্যার শরিয়াহ প্রদত্ত অধিকার হরণ করে তাদের সাথে খারাপ আচরণ করা পুরুষ অবশ্যই আছে। কিন্তু এটি কোনো সিস্টেম হয়ে ওঠেনি। পুরুষরা জাতিগতভাবে কোনোদিন নারীদেরকে ধ্বংসের উদ্যোগ নেয়নি। কিছু নারী তাদের স্বামী ও পুত্রের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করলে আমরা তাকে ‘নারীতান্ত্রিক বৈষম্যমূলক সিস্টেম’ বলে চালিয়ে দিই না।

যদিও হিতৈষী সেক্সিজম রোমান্টিক এবং শৌখিন, কিন্তু নারীরা যে কেবল এসবই চায় তা নয়। আগের গবেষণায় দেখা যাচ্ছে, অনেক ক্ষেত্রে সেক্সিস্ট পুরুষ কর্তৃক নারীদের স্বাধীনতা, মুক্তি এবং ব্যক্তিনিয়ন্ত্রণের (পশ্চিমা মানদণ্ডে) অধিকার হরণকেও তারা ভালো নজরেই দেখছে। বিষয়টি লিঙ্গ-সমতাকেও প্রভাবিত করছে।

হ্যাঁ, অবশ্যই এ সিস্টেম অসাধারণ। একজন স্বামী জীবন দিয়ে তাঁর স্ত্রীকে রক্ষা করবে, তাঁর রক্ত, ঘাম ও অশ্রুর মূল্য দেবে। এবং স্ত্রী স্বামীকে ভালোবাসবে, অনুগত হবে এবং মান্য করবে। এটি কমনসেন্স।

এ ধরনের বৈশিষ্ট্য যে নারী ও পুরুষের মধ্যে আছে, তাঁর প্রতিই আকৃষ্ট হয় বিপরীত লিঙ্গের মানুষ। সংক্ষেপে বললে, স্বামী রোজগার করবে এবং রক্ষণাবেক্ষণ করবে, অন্যদিকে স্ত্রী মায়ের ভূমিকা পালন করবে এবং আগলে রাখবে। নারী-পুরুষ সত্তাগতভাবেই এমন এবং পৃথিবীর ইতিহাসে এমনই হয়ে এসেছে। হাজার বছর ধরে চলে আসা এ রীতিকে কেবল তারাই অস্বীকার করে যারা 'বুঁদ' হয়ে আছে আধুনিক সব ব্যাখ্যায়। এ ধরনের পুরুষকে নারীরা কেন পছন্দ করে, কেন আকৃষ্ট হয় তা বোঝার জন্য গুল এবং কুফার (Gul and Kupfer) বেশ কিছু এক্সপেরিমেন্ট করেছে। দেখা গেল, যারা সেক্সিস্ট পুরুষদেরকে পছন্দ করে তারাই এমন পুরুষদেরকে পছন্দ করে যারা স্ত্রীদের খেয়াল রাখে, তাদেরকে নিরাপত্তা দেওয়ার মানসিকতা লালন করে এবং সম্পর্কন্নোয়নে কাজ করে। এ নারীরা ভালোবাসায় অন্ধ কেউ ছিল না, তারা তাদের চোখ খোলা রেখেই, মনকে মুক্ত রেখেই তাদের অভিমত জানিয়েছে।

অন্যভাবে বললে, স্মার্ট নারী জানেন কোন ধরনের পুরুষ তাঁর এবং তাঁর সন্তানদের খেয়াল রাখবে। স্পষ্টতই, নারীদের অধিকারের জন্য হম্বিতম্বি করা পুরুষদের তর্জনগর্জন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। বাস্তব জীবনে তারা একজন দায়িত্বশীল বাবা, স্বামী হয়ে উঠতে পারে না।

যে নারীদের ওপর এক্সপেরিমেন্ট করা হয়েছে তাদের অনেকেই কমবেশি নারীবাদী। তাই তাদেরকে কম 'জাগ্রত' নারী বলার সুযোগ নেই। খুবই অবাক করা বিষয়।

যতই চেষ্টাই করুক, নারীবাদীদের অন্তর থেকে নারীত্ব মুছে ফেলা এত সহজ বিষয় নয়। আল্লাহ তাদেরকে এভাবেই বানিয়েছেন, এটিই ফিতরাহ। যেসকল নারীরা সেক্সিস্ট পুরুষদেরকে পছন্দ করছে, তারা কি নারীজাতির ধ্বংস ডেকে আনতে চাইছে? নাকি তারা জানেই না সেক্সিস্ট পুরুষ কেমন হয়? তা অবশ্যই না। তারা বুদ্ধি খাটিয়েই সিদ্ধান্ত নিয়েছে, ভারসাম্য রক্ষা করছে। তারা মনে করে, পরিবারকেন্দ্রিক চিন্তা করে, পরিবার এবং স্ত্রীর জন্য নিজেকে উৎসর্গ করতে পারে এমন পুরুষই তাদের সঙ্গী হিসেবে বেশি যোগ্য। তারা স্বাধীনতা চায়নি, সেই স্বাধীনতা যা পশ্চিমা নারীবাদী পুরুষরা তাদেরকে গ্রহণ করতে বাধ্য করে। পশ্চিমের ঠিক করে দেওয়া স্বাধীনতার চেয়ে এটাকেই তারা প্রাধান্য দিয়েছেন বেশি।

প্রথমত, বোঝাই যাচ্ছে সেক্সিস্ট পুরুষের প্রতি আকর্ষণ কোনো ব্রেইনওয়াশিং এর কারণে তৈরি হয় না কিংবা ভুল চিন্তার কারণেও না। তারা শুধু ফিতরাহর দিক থেকেই সেক্সিস্ট পুরুষ পছন্দ করে তা নয়; বরং তারা যুক্তি দিয়েও বোঝে যে তাদের ও তাদের পরিবারের জন্য সেক্সিস্ট পুরুষই বেশি জরুরি।

দ্বিতীয়ত, দেখা যায় যে নারীদের অধিকারের জন্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তর্জন গর্জন করা অধিকাংশ পুরুষরাই বাস্তব জীবনে অকর্মণ্য ও নারীদের প্রতি সহিংস। গবেষকরা বলেন, ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে অনেক নারীই বিষয়টি তুলে এনেছেন। তাই যেকোনো কিছুর মধ্যে তারা সেক্সিস্ট পুরুষদেরকেই গ্রহণ করে নিয়েছেন।

নারীদের নারী হয়ে ওঠার এখনই সময়। পশ্চিমা আধুনিকতার কাছে নিজের অনন্যতা, স্বাভাবিক চাহিদাকে বন্ধক দেবেন না। পুরুষদেরও সময় হয়েছে পুরুষ হয়ে ওঠার এবং পৃথিবীকে আবার হিতৈষী সেক্সিজম উপহার দেওয়ার। পৃথিবীর আজ তাই দরকার।[২৪]

---

[২৪] দাঈ, লেখক এবং আলাসনা ইন্সটিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা ড্যানিয়েল হাক্কিকাতজুর নিজস্ব ওয়েবসাইটে প্রকাশিত *The Research Is In: Women Prefer Patriarchy* এর অনুবাদ।

নারীবাদ কি সেক্সিস্ট?

সাম্প্রতিক একটি সাক্ষাৎকারে নারীবাদী সাংবাদিক এবং স্বঘোষিত 'রাজনৈতিক লেসবিয়ান' জুলি বিন্ডেল বলেন যে তিনি যদি পারতেন তাহলে তিনি সব পুরুষকে ওয়ার্ডেন দিয়ে একটি ক্যাম্পে রাখতেন এবং তাদের নারী আত্মীয়রা লাইব্রেরির বইয়ের মতো তাদেরকে দেখতে আসতেন।

বিন্ডেল দ্য গার্ডিয়ানেও লেখালেখি করেন। তাকে একটি সাক্ষাৎকারে প্রশ্ন করা হয়—'নারী মুক্তির আন্দোলনের সাথে কি হেটোরোসেক্সুয়ালিটির[২৫] মৃত্যু হবে?' তার উত্তর ছিল—'হ্যাঁ হবে, যদি না পুরুষরা তাদের কাজ ঠিক করে করছে, তাদের কাছ থেকে তাদের ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হচ্ছে এবং নিজেদের আচরণ ঠিক করছে। আমি বলতে চাচ্ছি যে, আমি আসলে তাদের সবাইকে একধরনের ক্যাম্পে রাখব। সেখানে তারা সবাই কোয়াড বাইক বা সাইকেল অথবা সাদা ভ্যানে করে ঘুরে বেড়াতে পারবে। আমি তাদের গাড়ির বিভিন্ন চয়েজ দেবো। কিন্তু তাদেরকে পর্ন দেখতে দেবো না, তারা মারামারি করতে পারবে না। সেখানে অবশ্যই আমাদের ওয়ার্ডেন থাকবে! যেসব মহিলা তাদের ছেলে বা পুরুষ প্রিয়জনকে দেখতে চান তারা সেখানে গিয়ে তাদের সাথে দেখা করতে পারবেন। ইচ্ছা হলে তাদেরকে সাথে নিয়ে ঘুরতে যেতে পারবেন। কিন্তু একটা নির্দিষ্ট সময় পর তাদেরকে আবার ক্যাম্পে ফিরিয়ে দিয়ে যেতে হবে; লাইব্রেরির বইয়ের মতো।'[২৬]

তাঁর এ মাস্টারপ্ল্যান নারীবাদী মহল সামগ্রিকভাবে গ্রহণ করেনি। কিন্তু তাকে 'র‍্যাডিকেল' বা উগ্রবাদী নারীবাদী বলা হয়। পুরুষদের প্রতি বিন্ডেলের মতো ঘৃণা প্রায় সব নারীবাদীর মধ্যেই আছে। তারা মনে করে, পুরুষদের আসলে এভাবেই ঘৃণা করা উচিত।

'নারীরা করলে তা আর সেক্সিজম থাকে না...'

নারীবাদী আন্দোলনকে অনেক সময় 'পুরুষবিদ্বেষী' আন্দোলনও বলা হয়। অনেক নারীবাদীই এমন ট্যাগিং-এর বিরোধীতা করেছেন। তবে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক

---

[২৫] http://www.radfemcollective.org/news/2015/9/7/an-interview-with-julie-bindel

[২৬] Robin Morgan, author and editor for Ms. Magazine; Going Too Far (1978), p.178

নারীবাদী পুরুষবিদ্বেষকে নৈতিক এবং রাজনৈতিক হাতিয়ার বলে মনে করে। নারীবাদী এক্টিভিস্ট এবং সাংবাদিক রবিন মর্গান বলেন, 'আমার মতে পুরুষবিদ্বেষ খুব কার্যকরী রাজনৈতিক অবস্থান। আমাদের এ অবস্থানকে শ্রদ্ধা করা উচিত। নির্যাতিত শ্রেণির অবশ্যই অধিকার আছে নির্যাতনকারী শ্রেণিকে ঘৃণা করার।'[২৭]

মর্গানের মতো নারীবাদীদের ভাষ্য হলো, তাদের এমন ঘৃণা প্রচার করার অধিকার আছে কিন্তু এর প্রতিক্রিয়া দেখানোর অধিকার পুরুষের নেই। পুরুষদের মেনে নিতে হবে সব, কেননা তারা নির্যাতক। একটা সময় এমন ছিল না। উগ্রবাদী নারীবাদীরাই একসময় মানবজাতির কোনো শ্রেণিকে ঘৃণা করার বিরুদ্ধে কথা বলত, অথচ এখন তারা-সহ LGBTQ আন্দোলনের প্রায় সবাই এমন করাকেই যৌক্তিক মনে করে।

আইডেন্টিটি গ্রুপ রাজনীতির প্রচলিত ভাষায়, যখন 'নিপীড়িত' গোষ্ঠী ধরে নেওয়া 'নিপীড়ক' গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে শ্রেণিবিদ্বেষ প্রচার করে, একে বলা হয় 'বিপরীত নির্যাতন'। নারীবাদের ক্ষেত্রে একে বলা হয় 'বিপরীত সেক্সিজম' (Reverse sexism)।

'... কারণ পুরুষরা প্রাতিষ্ঠানিক বৈষম্যের শিকার হয় না।'

নারীবাদীরা দাবি করে 'বিপরীত সেক্সিজমে' নাকি কোনো প্রকার সেক্সিজম নেই। তাদের দাবি, সেক্সিজমে কেবল লিঙ্গের কারণে কাউকে ঘৃণা করা হয় না। এখানে তারা একটি সিস্টেমিক বৈষম্যের কথা বলে। অর্থাৎ, একটি গ্রুপ কেবল তাঁর লিঙ্গের কারণে প্রাতিষ্ঠানিক বিষয়াশয়ে বৈষম্যের শিকার হওয়া। যেমন সরকার, আইন, অর্থনীতি ইত্যাদি। এর ওপর ভিত্তি করেই নারীবাদীরা দাবি করে, পুরুষদের বিরুদ্ধে কোনো প্রকার সেক্সিজম আরোপ করা হচ্ছে না। কেননা নারীরা যেভাবে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বৈষম্যের শিকার হয়, পুরুষরা তাদের প্রতি ঘৃণার কারণে এমন কোনো বৈষম্যের শিকার হবে না। তাই এটি সেক্সিজম না।

ঠিক এ কারণেই মর্গানের মতো নারীবাদীদের কাছে নিচের উক্তিটি সেক্সিজম হবে না; বরং 'শ্রদ্ধেয়' এবং 'কার্যকরী রাজনৈতিক অবস্থান' হবে।

'পুরুষ আসলে অসম্পূর্ণ নারী। তারা একটি গর্ভপাতের প্রোডাক্ট। জিন স্টেইজে তাদের গর্ভপাত হয়েছে। পুরুষ হওয়া লজ্জাজনক, তাদের আবেগ সীমাবদ্ধ। পুরুষত্ব আসলে একটি রোগ, অনেক অনেক অসম্পূর্ণতা পুরুষত্বের মাঝে। পুরুষরা

[২৭] Valerie Solanas, founder of S.C.U.M. (Society for Cutting Up Men), S.C.U.M. Manifesto (1967)
http://suwon.weebly.com/uploads/1/3/5/4/13540638/scum_manifesto.pdf

আবেগের দিক থেকে পঙ্গু। [...] একজন পুরুষকে পশু বলা আসলে তাকে সম্মান দেওয়া। সে আসলে একটি মেশিন, একটি চলাফেরা করা লিঙ্গ।'[২৮]

—ভ্যালারিয়া সোলানাস (SCUM Manifesto)

'পুরুষতন্ত্রের অধীনে সব নারী মেয়েশিশু ভিক্টিম—অতীত, বর্তমান বা ভবিষ্যতে। পুরুষতন্ত্রের অধীনে সব নারীর ছেলেশিশু সম্ভাব্য বিশ্বাসঘাতক। অথবা অবশ্যম্ভাবী একজন ধর্ষক কিংবা আরেকজন নারীকে ধ্বংসের কারিগর।'[২৯]

—এন্ড্রিয়া ডর্কিন, Our Blood

'মানবজাতিতে পুরুষের সংখ্যা কমাতে হবে। তাদেরকে কখনোই ১০%-এর বেশি হতে দেওয়া যাবে না।'[৩০]

—স্যালি মিলার গিয়ারহার্ট, The Future – if there is one – is Female

প্রথমত, আসুন স্পেইডকে স্পেইড বলি। বিপরীত সেক্সিজম বলে কিছু নেই। শুধু আছে সেক্সিজম। আমরা কখনো বলি না, 'বিপরীত ধর্ষণ' কিংবা 'বিপরীত সন্ত্রাস'। ভুল কাজ ভুলই, সেটাই যেই করুক না কেন, যার সাথেই করা হোক না কেন।

নারীবাদীরা বলে কেবল প্রাতিষ্ঠানিক বৈষম্য হলেই তা সেক্সিজম। যদি তর্কের খাতিরে এ সংজ্ঞাকে সঠিক ধরেও নিই, তাহলেও সুরাহা হয় না। নারী-পুরুষের ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক বৈষম্য বাইনারি কোনো বিষয় না। পুরুষদের ওপর কোনো প্রাতিষ্ঠানিক বৈষম্য হয় না বলাটা একটি মিথ্যাচার। বাস্তবতা অনেক ভিন্ন। বর্ণবাদের ক্ষেত্রে অ-সাদা পুরুষ কিংবা খেটে খাওয়া মজদুর—এদেরকে বিবেচনায় আনলে সমীকরণ বদলে যায়। পুরুষদের জীবনকেও নারীদের থেকে কম মূল্য দেওয়া হয় (সামরিক ক্ষেত্রে নিয়োগ, কোনো উদ্ধারকাজে 'নারী ও শিশু প্রথমে' ইত্যাদি)। এ ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে যোগ্যতা ও কোটায়, একই অপরাধে ভিন্ন শাস্তি, আত্মহত্যা দমন, ক্যান্সার রিসার্চ, পারিবারিক সহিংসতার রিসার্চ, কাজের কারণে মৃত্যুর হার-সহ অনেক অনেক ক্ষেত্রে পুরুষের প্রতি বৈষম্য লক্ষ করা যায়।

সেক্সিজমের সংজ্ঞার ব্যাপারে নারীবাদীদের অবস্থান মেনে নিলে বলতে হয় কাউকে

---

[২৮] Andrea Dworkin, author and feminist activist; Our Blood (1976) p.20

[২৯] Sally Miller Gearhart, author and former professor of women's studies at San Francisco State University; The Future – If There Is One – Is Female, Section III (1981)

[৩০] Sally Miller Gearhart, author and former professor of women's studies at San Francisco State University; The Future – If There Is One – Is Female (1981) p.273-4

প্রথমে অবশ্যই কোনো না কোনো প্রাতিষ্ঠানিক সমস্যার মধ্য দিয়ে যেতে হবে। তারপর তাকে আমরা সেক্সিজম ধরে নেবো এবং তা রুখতে কাজ করব। অন্যভাবে বললে, নারীবাদীদের মতে যদি পুরুষজাতি অধীনস্থ জাতি হয়, নারীতন্ত্রের অধীনে পেষণ হয়, প্রাতিষ্ঠানিক সকল প্রকার বৈষম্যের শিকার হয় তাহলেই কেবল সে নিরাপত্তা পাবার যোগ্য বিবেচিত হবে। এর বাইরে তাঁর সাথে যাই করা হোক না কেন সেটা নিপীড়ন বলে গণ্য হবে না। এ ধারণা পুরো মানবতাকেই হুমকির মুখে ফেলে দেয়। পুরো তত্ত্বটির মানে হলো যদি সব মানুষকে নিজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হয় তাহলে কোনো এক পক্ষকে শোষক ও আরেক পক্ষকে শোষিত হতে হবে। এটা তারা লিঙ্গের ভিত্তিতে আরপ করে। রীতিমতো নারী-পুরুষের মধ্যে যুদ্ধ। আসলেই ভাবার বিষয়, নারীবাদীরা আসলেই সুবিচার চায় নাকি নিজেদের কাল্পনিক 'নির্যাতনের' প্রতিশোধ নিতে চায়।

নির্যাতিতদের অধিকার আছে নির্যাতক শ্রেণিকে ঘৃণা করার—এ কথাটি নৈতিকভাবেই ভুল। এখানে ব্যক্তিকে ঘৃণা করা যায়, পুরো শ্রেণিকে না। কেননা ব্যক্তির কাজের জন্য শ্রেণি দায়ী না। এভাবে পৃথিবীর যে কারও সব প্রকার ঘৃণা বৈধ হয়ে যায়। কোনো মুসলিমের যেকোনো কাজের কারণে ইসলামোফোবিয়া বৈধ হয়ে যায় কিংবা কোনো ইহুদির কোনো কাজের জন্য এন্টিসেমেটিজম।

বিপরীত সেক্সিজম শব্দটি নারীবাদের সেক্সিজমের সমালোচনার জন্য ব্যবহার করা হলেও টার্মটি সমস্যাযুক্তই। এ টার্মের মানে হলো নারীবাদীরা আসলে তাদের ওপর হওয়া সেক্সিজমের জবাব, প্রতিক্রিয়া হিসেবে এ সেক্সিজম দেখায়। নির্যাতনের বিরুদ্ধে একটি রাজনৈতিক হাতিয়ার বয়ে দাঁড়ায় এ টার্ম। সেক্সিজমের বদলে বিপরীত সেক্সিজম শব্দটি ব্যবহার করাই নারীবাদীদের দাবিকে একটি যৌক্তিকতা দিয়ে দেয়। অথচ সেক্সিজম শব্দটির এমন কোনো ইতিহাস নেই। কোনো পুরুষ কোনো নারীবাদী কর্তৃক নির্যাতিত হওয়ার প্রতিক্রিয়া হিসেবে নারীবিদ্বেষী হয়ে ওঠেনি। যদি এমনটা হয়, তাহলে তাকে আমরা কী বলব? তাকেও কি বিপরীত সেক্সিজম বলা হবে?

'...কারণ নারীরা পুরুষের মতো দমনপীড়ন চালাতে সক্ষম না।'

গিয়ারহার্টের পুরুষ কমিয়ে ফেলার বক্তব্যটি নিঃসন্দেহে ভয়ংকর। কিন্তু তিনি ৯০% পুরুষকে হত্যা করে ফেলার জন্য আন্দোলনের ডাক দেননি। তাঁর আরেক আর্টিকেলে তিনি লিখেছেন, তিনি চান ক্রমান্বয়ে পুরুষ জাতির ৯০% কে শেষ করে দিতে। এটা নাকি পুরুষদের সম্মতিক্রমেই হবে এবং মায়ের পেটে থাকা অবস্থাতেই। গিয়ারহার্ট যে মানসিকতা নিয়ে এ দাবিটি করেছেন তা তিনি স্বীকারই করতে চান না। তাঁর মতে, নারীরা পুরুষের ওপর নির্যাতন করতেই পারে না। নারীদের

মানসিকতাই নাকি এমন। এ যুক্তির ওপর ভিত্তি করেই তিনি বলেন যে নারী পুরুষকে দমন করতে পারে না। সেক্সিস্ট হওয়া তো দূরের কথা।

'নারীদের প্রাধান্য দিতেই হবে, এটিই সত্য, বাস্তব [...] আমার মনে হয়, নারীরা জাতিগতভাবেই নিজেদের ক্ষমতা প্রদর্শন করবে না। সাদারা অন্য সব রঙের মানুষদের ওপর, পুরুষরা নারীদের ওপর প্রভাব বজায় রাখতে যেভাবে জীববিজ্ঞানকে সামাজিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে তাও নারীরা করবে না। [...] নারীদেরকে যদি সুযোগ দেওয়া হয় পুরুষতন্ত্রের নির্যাতন পুরুষদেরকেই ফিরিয়ে দিতে তারা কি পারবে তা করতে? আমার মনে হয় না। [...] যদি আমরা আসলেই দেখতে চাই নারীরা কীভাবে ক্ষমতা ও সরকারকে কাজে লাগায়, তাহলে আমাদের উচিত তাদেরকে একটি সিস্টেমে সুযোগ দেওয়া যেখানে তারা নিজেদের মূল্যবোধ অনুসারে কাজ করতে পারবে।'[৩১]

নারী নেতৃত্বের এ ধারণা শুনতে ভালো লাগলেও শুভঙ্করের ফাঁকি থেকে যায়। প্রমাণের চেষ্টা করা হলো ভালো-খারাপ বৈশিষ্ট্য কোনো না কোনোভাবে লিঙ্গের সাথে সংযুক্ত। মানে পুরুষ-মাত্রই এমন হবে, নারী-মাত্রই অমন হবে। তিনি এখানে বর্ণবাদের কথাও টেনে এনেছেন। তার মানে কি তিনি মনে করেন সাদা মানুষ মানেই এমন হয়?

উদাহরণস্বরূপ, গিয়ারহার্ট পুরুষের বন্ধনের ভয়াবহতা সম্পর্কেও সচেতন করেছেন : 'আলাদা কোনো পুরুষ এখানে সমস্যা না। [...] মূল সমস্যা হলো পুরুষদের পারস্পরিক বন্ধন। তাদের পারস্পরিক বন্ধন ও প্রতিশ্রুতি একটি আর্মি, গ্যাং, সার্ভিস ক্লাব, কর্পোরেশন, সংগঠন কিংবা কোনো ক্রীড়াদলের খেলোয়াড়দের মতো। [...] পুরুষদের পারস্পরিক বন্ধনের শক্তি ও স্পিরিট যেন নির্ভর করে নারীদেরকে অবমাননা এবং নারীদের মূল্যবোধ, যোগ্যতাকে ধ্বংস করার ওপর। তারা সবসময় নারীদেরকে নিয়ে ঠাট্টা মশকারি করে। তাদের অভিজ্ঞতা এবং আবেগকে যেন ধ্বংস করা দরকার। আর পুরুষদের এ বন্ধন যেন নারীদেরকে ধ্বংস করেই সফলতার মুখ দেখবে।'[৩২]

---

[৩১] Sally Miller Gearhart, author and former professor of women's studies at San Francisco State University; The Future – If There Is One – Is Female (1981) p.281

[৩২] The Rise of the Ironic Man-Hater, Amanda Hess, http://www.slate.com/blogs/xx_factor/2014/08/08/ironic_misandry_why_feminists_joke_about_drinking_male_tears_and_banning.html. See also, Do Young Feminists Really Want To Bathe In Male Tears? Katherine Speller, http://www.mtv.com/news/2110217/misandry-is-a-joke/. See also regarding Bahar Mustafa:http://www.dailymail.co.uk/news/article-3054067/Pictured-Diversity-officer-banned-whites-anti-racism-event-British-university-wiping-away-fake-tear-no-white-

দুর্ভাগ্যবশত, গিয়ারহার্ট যে আচরণগুলোর কথা বললেন সেগুলো আমরা বেশি দেখি নারীবাদীদের মধ্যে। নারীবাদীরা একটি নারী-বন্ধন তৈরি করেছে। তারাই একটি শ্রেণি, পুরুষজাতির বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়াচ্ছে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক পর্যায়ে। তারা বিভিন্ন স্লোগান ব্যবহার করছে তাদের টি-শার্ট, মাগ ইত্যাদিতে, 'আমি পুরুষের অশ্রুতে স্নান করি'। তারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে #KillAllMen ধরনের হ্যাশট্যাগও ব্যবহার করে। এসব নারীবাদীরা বলে এসব পরস্পরবিরোধী কথাবার্তা নাকি কেবল ঠাট্টা-মশকারি, তারা আসলে নারীদেরকে এক করার জন্য, একটি জাতীয় মূল্যবোধ তৈরির জন্য এসব স্লোগান ব্যবহার করে। একজন নারীবাদী তো বলেই ফেলেছে, 'অনেক পুরুষ এসব স্লোগান না বুঝেই প্রতিক্রিয়া দেখায়। আমার অনেক মজা লাগে তাদের কাজ দেখতে।'[৩৩] বর্তমানের পুরুষতান্ত্রিক (তাদের দাবি অনুসারেই) সমাজেই তারা এভাবে পুরুষদেরকে হেয় করছে, তাদের ধ্বংস কামনা করছে, সেখানে তারা যদি 'তাদের সিস্টেম' ফিরে পায়, সেখানে যে কী করবে তা বলাই বাহুল্য।

পুরুষরা পুরো নারীজাতির প্রতি ঘৃণা দেখালে তাকে বলা হয় Misogyny. কিন্তু নারীবাদীদের দাবি তারা পুরুষ জাতিকে পুরুষের মতো করে ঘৃণা করতে পারে না। এটা নারীত্বের সাথেই যায় না। কিন্তু দেখা যাচ্ছে এ দাবি সত্য না। নারী-পুরুষ উভয়েই মানুষ এবং মানুষমাত্রই ভালো-খারাপ দুটো করারই ক্ষমতা রাখে। এমনকি তারা নিজেদের ভুলগুলো বৈধ করার চেষ্টাও করে।

পুরুষদের প্রতি জাতিগত ঘৃণা কি অবিচারের সমাধান?

নারীবাদীরা ধরে নিয়েছে পুরুষরাই কেবল 'নিপীড়ক', নারীরাই কেবল 'নিপীড়িত' এবং নিপীড়ক শ্রেণির অনুকরণ করাই হলো সমাধান। কাল্পনিক বা বাস্তব জাতিগত ঘৃণা পৃথিবীর ইতিহাসে নতুন নয়। নির্যাতিতরাই যে একসময় তাদের সাথে হওয়া একই নির্যাতন করে, ক্ষেত্রবিশেষে আরও বেশি করে নিপীড়ক শ্রেণি হয়ে যায় তাঁর উদাহরণ পৃথিবীতে অনেক।

ব্রাজিলিয়ান দার্শনিক এবং শিক্ষাবিদ পাওলো ফ্রিয়ারের মতে,

> 'নির্যাতিতরা নির্যাতন থেকে বাঁচার চেষ্টা না করে নিজেরাই নির্যাতনকারী হয়ে উঠতে চায়। [...] তারা পুরুষদের সবকিছুকেই সফলতা বলে মনে

---

men-sign.html and http://www.theguardian.com/uk-news/2015/oct/06/london-woman-charged-over-alleged-killallwhitemen-tweet

[৩৩] Paulo Friere, PEDAGOGY OF THE OPPRESSED, New York: Continuum Books, 1993.

করে, আবার তাদের দৃষ্টিতে পুরুষরাই নিপীড়ক। এর মানে কী?'[৩৪]

১৪শ শতকের মুসলিম দার্শনিক ইবনে খালদুনও এ বিষয়টি লক্ষ করেছেন। তাঁর মতে, এ ধরনের অনুকরণ আসলে নির্যাতনকারীর শ্রেষ্ঠত্বকেই আরও বেশি করে তুলে ধরে। যে নির্যাতন করবে সেই শ্রেষ্ঠ—এমন একটি ধারণা শক্তিশালী হয়।

> 'পরাজিতরা সবসময় তাদের বিজয়ীদের পোশাক, আচরণ, বিশ্বাস, সংস্কৃতি এবং আচারের অনুসরণ করতে চায়। মানুষ যাদের দাস হয়ে থাকে, যাদের কাছে পরাজিত হয় তাদেরকেই সফল এবং শ্রেষ্ঠ মনে করে। [...] হয়তো বিজয়ীর প্রতি তাদের গভীর শ্রদ্ধার কারণে তারা বিজয়ীকে শ্রেষ্ঠ মনে করে। অথবা পরাজয়ের কারণ হিসেবে তারা নিজেদের দোষ দেখে না, মনে করে বিজয়ী শ্রেষ্ঠ বলেই তারা পরাজিত হয়েছে। তারা মনে করে না কোনো সাধারণ শক্তির কাছে তাদের পরাজয় হতে পারে। এ বিশ্বাস অন্তরে দৃঢ়ভাবে চেপে বসতে পারলেই হলো, এটা সকল দায়মুক্তির টনিক হয়ে যায়। এভাবে বিজয়ীর সাথে মিশে যাওয়ার প্রবণতা, তাদের সবকিছু অনুসরণ করার প্রবণতা ও তাদের একজন হয়ে ওঠার প্রবণতা বাড়তে থাকে। এমন মানসিক দাসত্ব অজ্ঞাতেই মানুষের মনে চলে আসে। আবার এমন ভ্রান্ত বিশ্বাসও মাথায় চেপে বসতে পারে যে, বিজয়ীর বিজয়ের কারণ তার শক্তি, সক্ষমতা নয়; বরং তার বিশ্বাস, আদর্শ এবং দৃষ্টিভঙ্গি। নিজেদের 'নিম্ন' সংস্কৃতি থেকে বের না হলে বিজয় অর্জন সম্ভব না। মানুষ মনে করতে থাকে, বিজয়ীর অনুসরণ করেই তারা একদিন বিজয়ী হয়ে উঠবে।'[৩৫]

নির্যাতিতরা দায়বদ্ধতা থেকে মুক্ত নয়

অনেকের মনে হতে পারে, 'আরে! এ যুক্তি দিয়ে নারী মুক্তির সকল রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। নারীরা কি নিজেদের মুক্তির জন্য কোনো ব্যবস্থা নেবে না?' অবশ্যই নেবে। কোরআন-হাদিস ও হাজার বছর আগের আলেমরা এগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। ভেঙে ভেঙে ব্যাখ্যা করা হয়েছে কোন জুলুম থেকে কীভাবে মুক্তি মিলবে। ইসলাম ভুলকে ভুল হিসেবে দেখে, জুলুমকে জুলুম হিসেবে দেখে; কে করল তা কোনো বিষয় না, কার সাথে হয়েছে তাও না। কোনো

---

[৩৪] Chapter Two, Geography, An Arab Philosophy of History, Selections from the Prologomena of Ibn Khaldun of Tunis (1332-1406), Translated by Charles Issawi

[৩৫] *"[A]n Arab has no superiority over a non-Arab nor a non-Arab has any superiority over an Arab; also a white has no superiority over a black nor a black has any superiority over white except by piety and good action."* The Last Sermon of the Prophet Muhammad (s)

রাগ বা অসন্তুষ্টি ছাড়াই দমন হয় সব প্রকার অনাচার।

> 'হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর জন্য ন্যায়ের সাথে সাক্ষ্যদানকারী হিসেবে সদা দণ্ডায়মান হও। কোনো কওমের প্রতি শত্রুতা যেন তোমাদেরকে কোনোভাবে প্ররোচিত না করে যে, তোমরা ইনসাফ করবে না। তোমরা ইনসাফ করো, তা তাকওয়ার নিকটতর এবং আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয় তোমরা যা করো, আল্লাহ সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।' [আল কোরআন, ৫:৮]

> 'হে মুমিনগণ, তোমরা ন্যায়ের ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকবে আল্লাহর জন্য সাক্ষীরূপে। যদিও তা তোমাদের নিজেদের কিংবা পিতা-মাতার অথবা নিকটাত্মীয়দের বিরুদ্ধে হয়। যদি সে বিত্তশালী হয় কিংবা দরিদ্র, তবে আল্লাহ উভয়ের ঘনিষ্ঠতর। সুতরাং ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে তোমরা প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। আর যদি তোমরা ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে কথা বলো কিংবা এড়িয়ে যাও; তবে আল্লাহ তোমরা যা করো সে বিষয়ে সম্যক অবগত।' [আল কোরআন, ৪:১৩৫]

নিপীড়ক গোষ্ঠীর একজন হওয়া নির্বিচারে যা ইচ্ছা তাই করার লাইসেন্স না, কোনো শ্রেষ্ঠত্বের চাবিকাঠিও না।

বিদায় হজের ভাষণে রাসুল ﷺ বলেন—

> 'কোনো অনারবের ওপর কোনো আরবের শ্রেষ্ঠত্ব নেই। [...] কোনো কালোর ওপর কোনো সাদার শ্রেষ্ঠত্ব নেই।'

একই বাক্যেই রাসুল ﷺ বিপরীতটাও বলেছেন—

> 'কোনো অনারবের কোনো আরবের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব নেই। [...] কোনো কালোর শ্রেষ্ঠত্ব নেই কোনো সাদার ওপরে।' তিনি ঠিক করে দিয়েছেন শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ড, 'তাকওয়া ও সৎ কাজ।'

'নির্যাতিত' জাতির অংশ হওয়ার কারণে কেউ দায়মুক্ত হয়ে যায় না। অন্যায়, অবিচারের বিরুদ্ধে তাঁর দায়িত্ব থেকেই যায়। পরিবার, সমাজ ও সুবিচারের জন্য তাঁর অনেক কিছু করার আছে। আল্লাহ তাঁর কিতাবে হাশরের মাঠে হিদায়াহ থেকে বঞ্চিত দুর্বল এবং উদ্ধত—দুই দল লোকের মধ্যকার আলোচনা উল্লেখ করেছেন :

> '[...] আর তুমি যদি দেখতে জালিমদেরকে, যখন তাদের রবের কাছে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হবে তখন তারা পরস্পর বাদানুবাদ করতে থাকবে। যাদেরকে দুর্বল করে রাখা হয়েছিল তারা অহংকারীদেরকে বলবে, 'তোমরা না থাকলে অবশ্যই আমরা মুমিন হতাম'। যারা অহংকারী ছিল তারা, তাদেরকে বলবে, যাদেরকে দুর্বল করে রাখা হয়েছিল, 'তোমাদের

> কাছে হিদায়াত আসার পর আমরা কি তোমাদেরকে তা থেকে বাধা দিয়েছিলাম? বরং তোমরাই ছিলে অপরাধী'।' (আল কোরআন, ৩৪:৩১-৩২)

এ দুই দল আল্লাহর সামনেই তর্ক করতে থাকবে। নিপীড়িতরা তাদের হিদায়াহ থেকে বঞ্চিত হওয়ার জন্য নিপীড়কদেরকে অভিযুক্ত করবে। কিন্তু নিপীড়করা তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেবে, নিপীড়িত হওয়া সত্ত্বেও তারা নিজেদের জীবনে আল্লাহর আইন গ্রহণ করে নিতে পারত। কোনো অজুহাতই গ্রহণযোগ্য না। মজার বিষয় হলো, আল্লাহ এ দুই দলের জন্যই একই উপাধি উচ্চারণ করেছেন, 'জালিমুন'। অর্থাৎ জালিম বা নিপীড়ক।

কেবল ব্যাপক উৎসাহ নিয়ে চললেই সুবিচার নিশ্চিত হয় না, নিপীড়কের ভুল কাজ অনুসরণ করাও সুবিচার না। সুবিচারের জন্য দরকার সঠিক নির্দেশনা, অপরিবর্তিত মানদণ্ড ও সত্য এবং সঠিক কর্মপন্থা। সত্যিকার একটি নৈতিক মানদণ্ড ছাড়া নারীবাদীদের আসলেই সফলতার কোনো সম্ভাবনা নেই। তারা কেবল অযৌক্তিক অবস্থানকেই নৈতিক ভিত্তি বানিয়ে নিয়েছে, 'সমতা'। এর বাইরে তাদের কোনো নৈতিক অবস্থান নেই যার ভিত্তিতে আমরা অন্যায়, সুবিচার ইত্যাদির সংজ্ঞা ঠিক করব। যখন সমতাকেই আপনি নিজের একমাত্র দাবি বানিয়ে নেন, তখন কোন ক্ষেত্রে সমতা চান, কেন চান তাও পরিষ্কার হওয়া দরকার। কেবল পুরুষের মতো হতে পারাই যদি সফলতা হয়, তাহলে আর কোনো সুবিচার অবশিষ্ট থাকে না। কেবল জুলুমের একটি চক্রই চলতে থাকবে, কখনো নারী ও কখনো পুরুষ হবে নিয়ন্ত্রক।

আগুনের সাথে আগুন দিয়ে লড়াই করলে, সব ধ্বংস হবে।[৩৬]

---

[৩৬] আন্তর্জাতিক বক্তা ও লেখিকা জারা ফারিসের নিজস্ব ওয়েবসাইটে প্রকাশিত *'Is Feminism Sexist?'* অনুবাদ।

পারিবারিক সহিংসতা সম্পর্কে তিনটি মিথ

একটি ক্লিপে দেখানো হয়,[৩৭] একটি দম্পতি লন্ডনের একটি পার্কের মধ্যে দিয়ে হাঁটছে। হঠাৎ তাদের মধ্যে তর্ক শুরু হয়। প্রথম দৃশ্যে দেখানো হয় যে তর্কের এক পর্যায়ে স্বামী অনেক রেগে যান। ফলে তিনি তাঁর স্ত্রীর ওপর আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠেন। তৎক্ষণাৎ সেখানে উপস্থিত সব পথচারীরা সেখানে হস্তক্ষেপ করে, কঠোরভাবে লোকটিকে শাসিয়ে দেয়। তারা পুলিশকে জানানোর হুমকিও দেয়। দ্বিতীয় দৃশ্যে দেখানো হয়, আগের বারের মতোই এবারও তর্ক শুরু হলো। কিন্তু এবার রেগে যান স্ত্রী। তিনি স্বামীকে গালি দেওয়া শুরু করেন, মাথা চেপে ধরে ল্যাম্পপোস্টের সাথে ধাক্কা দেন। মজার ব্যাপার হলো, এবার কোনো পথচারীকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল না। অনেকেই হাসছিল। যদিও স্বামী-স্ত্রীর পুরো ঘটনাই অভিনয় ছিল, কিন্তু এর মাধ্যমে আমরা সাধারণ মানুষের মানসিকতা বুঝতে পারি।

ভিডিওটি পারিবারিক সহিংসতার ব্যাপারে সমাজের বিভ্রান্ত ও ভয়ংকর দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছে। সবাই স্বীকার করে নিয়েছে, নারীরা যখন সহিংসতার শিকার হয় তখন তাদেরকে আমাদের অবশ্যই সাহায্য করতে হবে। কিন্তু যখন সেই একই নির্যাতনের শিকার হবে একজন পুরুষ, তখন সবার মনে হয়, 'পুরুষ! তারা কীভাবে নির্যাতনের শিকার হতে পারে!'

নারী-পুরুষের সম্পর্কের ভিত্তি হবে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, ন্যায়বিচার। স্বামী-স্ত্রীর কখনোই একে অপরের দ্বারা অবনমিত, অপদস্ত হওয়া উচিত নয়। এখানে লিঙ্গ জরুরি বিষয় না। বলার অপেক্ষা রাখে না, পারিবারিক সহিংসতার শিকার হওয়া যে কারও জন্যই কষ্টের, হতাশার। এমনকি পুরুষের ক্ষেত্রেও। পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধে যারাই কাজ করছেন, এ সামাজিক অসুস্থতা প্রতিরোধের চেষ্টা করছেন সবাইকে বুঝতে হবে, এটি কোনো লিঙ্গভিত্তিক সমস্যা নয়। কাজেই এ সমস্যা সমাধানের জন্যও নারীবাদের মতো কোনো লিঙ্গভিত্তিক সমাধানের প্রয়োজন নেই। এখানে বেশ জনপ্রিয় কয়েকটি মিথের উল্লেখ করা হলো।

---

[৩৭] #ViolenceIsViolence: Domestic abuse advert Mankind
https://youtu.be/u3PgH86OyEM

মিথ ১: কেবল নারীরাই পুরুষ কর্তৃক পারিবারিক সহিংসতার শিকার হয়

নারীবাদী এবং নারীর অধিকার রক্ষায় কাজ করা প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্রমাগত প্রোপাগান্ডা, একপেশে প্রচারণার কারণে আমাদের মধ্যে বদ্ধমূল ধারণা জন্ম দিয়েছে যে, পারিবারিক সহিংসতার শিকার হয় কেবলমাত্র নারীরা। আর কেউ হবে না, হওয়া সম্ভব না।

বাস্তবতা : ২০১২ সালে বিবাহিত নারীর তুলনায় বিবাহিত পুরুষেরা দাম্পত্য জীবনে বেশি নির্যাতনের শিকার হয়েছে। (Source: British Crime Survey)[৩৮]

পারিবারিক সহিংসতার শিকার মানুষদের মধ্যে ৪০%ই পুরুষ। (Source: Office for National Statistics)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটি গবেষণায় দেখা গেছে, একপেশে সহিংস সম্পর্কগুলোর ক্ষেত্রে ৭০% এরও বেশি ক্ষেত্রে নারীরাই দায়ী। (Source: American Journal of Public Health)[৩৯]

নারীরা প্রায় পুরুষের সমান জুলুমই করছে, কখনো কখনো বেশিও করছে। কিন্তু এ সত্যটি যদি আপনি সামনে নিয়ে আসেন, তাহলে বিস্ফোরণ হবে। সমাজের একটি বিরাট অংশ বিষয়টি মেনে নিতে পারবেন না। নারীবাদীদের অনেকেও বিষয়টি কোনোভাবেই মানতে পারে না। অথচ কেউ বলছে না যে পুরুষের ওপর নির্যাতনের কারণে নারীর ওপর নির্যাতন বৈধ হয়ে যায়। দুটোই সমান বর্জনীয়।

সাধারণ দম্পতিদের কথা বাদই দিই। আমরা যদি শুধু সমকামী দম্পতিদের দিকে তাকাই তাহলেও এক অদ্ভুত বাস্তবতার সম্মুখীন হব। পুরুষ সমকামীদের তুলনায় নারী সমকামীরা বেশি পারিবারিক সহিংসতার শিকার হয়!

রোগ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের (সিডিসি)[৪০] অনুসন্ধান অনুসারে, ৪৪% নারী সমকামীরা তাদের জীবনসঙ্গী কর্তৃক শারীরিকভাবে নির্যাতনের শিকার হয়ে থাকে। তাদের

---

[৩৮] Domestic violence: 'As a man, it's very difficult to say I've been beaten up, *The Independent*, Archived from the original on 13 April 2013. Retrieved 13 April 2013. https://tinyurl.com/3v74vfhz

[৩৯] Differences in Frequency of Violence and Reported Injury Between Relationships With Reciprocal and Nonreciprocal Intimate Partner Violence, *American Journal of Public Health (ajph)*. Accepted: May 25, 2006. Published Online: October 10, 2011. https://tinyurl.com/29jwzc

[৪০] দেখুন :
http://www.cdc.gov/violenceprevention/pdf/cdc_nisvs_ipv_report_2013_v17_single_a.pdf table 3.4 and 3.5, and
http://www.cdc.gov/ViolencePrevention/pdf/NISVS_SOfindings.pdf at p.27

মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশের বেশি অর্থাৎ ২৯%ই নারী সহযোগী দ্বারা হয়ে থাকে। যেখানে ৩৫% সাধারণ নারী (Straight, সমকামী নন এমন), ২৯% পুরুষ নির্যাতনের শিকার হয়ে থাকে। পুরুষ সমকামীদের মধ্যে এ হার হলো ২৬%।

নারীবাদী এবং এ মিথের সমর্থকরা সবসময়ই তাদের কথা, প্রোপাগান্ডায় বোঝানোর চেষ্টা করে, পুরুষরা মজ্জাগতভাবেই আগ্রাসী এবং নারীরা অসহায়, পুরুষরা সবসময়ই আক্রমণাত্মক এবং নারীরা সবসময়ই নির্যাতিত। এ পক্ষপাতদুষ্ট প্রোপাগান্ডার কারণে নারীর পক্ষে যেকোনো সহানুভূতি, লাইসেন্স ও প্রতিরক্ষা বৈধ হয়ে যায় এবং পুরুষের ক্ষেত্রে থাকে জিরো টলারেন্স।

মিথ ২: নারীরা পুরুষদের ক্ষতি করতে পারে না

ভিডিওটির পুরুষটিকে এমন পরিস্থিতিতে দেখেও পথচারীরা কেন হাসছিল? কেউ কেউ দাবি করছেন যে পুরুষরা যেহেতু নারীদের চেয়ে শারীরিকভাবে বেশি শক্তিশালী, তাই একজন নারী চাইলেই একজন পুরুষকে আঘাত করতে পারে না। আর যদি কেউ করেও সে ক্ষেত্রে একজন পুরুষ ভালোভাবেই তা ফিরিয়ে দিতে সক্ষম।

বাস্তবতা : নারীরা চাইলে পুরুষদের মতোই ক্ষতি করতে পারে। নারীর তুলনায় পুরুষের বেশি শারীরিক শক্তি থাকলেও নারী আততায়ীরা পুরুষদের শারীরিক ক্ষতি করতে (বিশেষ করে কোনো বস্তু ব্যবহার করে) পুরোপুরি সক্ষম। এ ছাড়াও ক্ষতিসাধনের পর তাদের মুখ বন্ধ করার জন্য অনেক বেশি মনস্তাত্ত্বিক এবং আইনি শক্তি নারীদের রয়েছে।

The ManKind Initiative-এর প্রকাশিত রিপোর্টে পারিবারিক সহিংসতা সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'পুরুষদের লোহার বার বিছিয়ে শোয়ানো হয়, তাদের খাবারে কাচ রেখে দেওয়া হয় এবং তাদেরকে ছুরিকাঘাত করা হয়। অনেকের মুখে ঘুষি মেরে জখম করা হয় এবং কুড়াল দিয়ে হুমকি দেওয়া হয়।' Parity[৪১] নামক আরেকটি সংস্থা পুরুষ ভুক্তভোগীদের একটি নমুনা প্রকাশ করেছে। তাদের অনুসন্ধান অনুসারে, প্রায় অর্ধেক ভুক্তভোগীকে অস্ত্র দিয়ে হুমকি দেওয়া হয়েছে এবং উল্লেখযোগ্যসংখ্যক পুরুষ গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। এক-তৃতীয়াংশকে যৌনাঙ্গে লাথি মেরে আহত করা হয়েছে। বাকিদেরকে ছুরিকাঘাতে, পুড়িয়ে, ভারী বস্তু দিয়ে আঘাতের মাধ্যমে গুরুতর জখম করা হয়েছে। কাজেই এটা সুস্পষ্ট যে নারীরা পুরুষদের নির্যাতন করতে পারে।

---

[৪১] Partner Abuse in England and Wales 1995 - 2007, *PARITY*. September 2008. http://www.parity-uk.org/partner_abuse3.php

শুধু তাই নয়, পুরুষরা তাদের নির্যাতিত হওয়ার বিষয়টি রিপোর্ট করে না বললেই চলে। যারা করে, তাদের সবাইকে বৈষম্য এবং পক্ষপাতিত্বের স্বীকার হতে হয়। প্রশাসন তাদেরকে পাত্তা দেয় না, আদালত একচেটিয়া রায় দেয়। পুরুষ গুরুতরভাবে জখম হওয়ার আগ পর্যন্ত পুলিশ নারী হামলাকারীর বিরুদ্ধে তেমন কোনো ব্যবস্থাই গ্রহণ করে না।

Parity[৪২] আরও বলেছে, 'জিরো টলারেন্স নীতি এবং গ্রেফতারের নীতিগুলো শুধু পুরুষের ক্ষেত্রেই। পুরুষ ভিক্টিম এবং তাদের সন্তানদের সুরক্ষার দায়িত্ব নিতে তেমন কেউই এগিয়ে আসে না... এমনকি জরুরি ভিত্তিতে একজন নারীর বিরুদ্ধে মামলা করতে একজন পুরুষকে দ্বিগুণ ঘাম ঝরাতে হয়। এ ক্ষেত্রে প্রায়ই পুলিশ তাদের ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক নীতি অবলম্বন করে এবং ব্যাপক হয়রানি করে।' শতকরা প্রায় পাঁচ ভাগ পুরুষের ক্ষেত্রে দেখা যায় পুলিশ বরং সেসব অভিযোগকারী পুরুষদের গ্রেফতার করেছে। অর্থাৎ, নারীরা যে পুরুষদের শুধু নির্যাতন করতে পারে তাই না, পুলিশের সামনে তারা সেই ভুক্তভোগী পুরুষকেই অপরাধী হিসেবে সাব্যস্ত করতে পারে। শুধু সে পুরুষ বলে!

মিথ ৩ : লিঙ্গ-সমতা নারী-পুরুষের মধ্যে সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি করবে

নারীবাদের মতো আন্দোলনগুলো যে 'লিঙ্গ-সমতা'-কে সমর্থন করে, সে সমতায় পুরুষকে মানদণ্ড হিসেবে বিবেচনা করা হয়। নারী যত বেশি পুরুষের মতো হতে পারবে ততই যেন সফল হতে পারবে। তারা নারী-পুরুষ উভয়কে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ডে নিয়ে আসতে চায়।

বাস্তবতা : নারীবাদের উত্থান এবং নারীর পুরুষের 'সমান' হয়ে ওঠার প্রবণতার কারণে দেখা যাচ্ছে নারীরা ক্রমশ হিংস্র হয়ে উঠেছে। *The Independent*[৪৩] এ প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী, নারী কর্তৃক সংঘটিত অপরাধ গত ৫ বছরের ব্যবধানে ১২% বেড়েছে। যা পুরুষের তুলনায় ৪ গুণ বেশি। ১৯৭৩ সালের পর থেকে নারী কর্তৃক সংঘটিত সহিংসতা, ডাকাতি, হত্যা ও মাদকসংক্রান্ত অপরাধ ২৫০% বৃদ্ধি পেয়েছে।[৪৪] ২০১১ সালে সরকারি পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায়, গৃহকর্মী নির্যাতনের জন্য দোষী সাব্যস্ত হওয়া নারীদের সংখ্যা ছয় বছরে বেড়েছে চার গুণ। অর্থাৎ ২০০৪-

---

[৪২] Ibid.

[৪৩] Girls get violent, *The Independent*, Archived from the original on 01 May 1996. Retrieved 01 May 1996. https://tinyurl.com/yabrah5k

[৪৪] More women convicted of battering men, as domestic violence soars in last five years, *The Daily Mail*, Archived from the original on 6 June 2011. Retrieved 6 June 2011. https://tinyurl.com/3waebtwz

২০০৫ সালে ছিল ৮০৬ জন যা ২০০৯-২০১০ বেড়ে হয় ৩৪৯৪ জন।

নারীবাদীরা যদিও পুরুষের মতো সুবিধা, অধিকার পাওয়াকে নিজেদের সফলতার মানদণ্ড হিসেবে দেখেছে, কিন্তু তারা দায়িত্বে সমান অংশীদার হতে রাজি নয়। যদি ধরেও নিই, প্রচলিত সমাজে নারীরা অপমানিত, পুরুষরা সম্মানিত, আলোকিত; তাহলে তো নারীর পুরুষের সমান সম্মান অর্জন করার জন্য পুরুষের মতোই কাজ করা উচিত। নারীরা যখন সর্বাত্মকভাবে কেবল পুরুষের সমান অধিকারই ভোগ করতে চায় এবং সকলপ্রকার দায়িত্ব এড়িয়ে যায়, দেখা যায় তারা সেই একই জুলুম পুরুষের ওপর চাপিয়ে দিচ্ছে যার জন্য তারা পুরুষকে দোষারোপ করত। বিষয়টি পুরোই নিজের স্বার্থে ক্ষমতা প্রয়োগ।

ইসলামে অবশ্যই একজন নারীর অধিকারের কথা রয়েছে। পাশাপাশি নারীকে কিছু দায়িত্ব পালনের নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। তাঁর দায়িত্ব হলো তাঁর স্বামীর হক ও সম্পদ রক্ষা করা এবং সন্তানদের সঠিকভাবে লালনপালন করা, দ্বীনের ওপর বড় করে তোলা। অন্যদিকে স্বামী হবেন পরিবারের প্রধান। তিনি তাঁর স্ত্রী এবং সন্তানদের কাজ, আচরণ ও মৌলিক চাহিদার জন্য আল্লাহর কাছে দায়বদ্ধ। কিন্তু বর্তমান মুসলিম পরিবারগুলোতে স্বামী-স্ত্রী নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন না। তারা নিজেদের অধিকারে বিন্দু পরিমাণ ছাড় দিতে রাজি না। এসব পরিবারে পারিবারিক সহিংসতার মতো ঘটনা ঘটা অস্বাভাবিক কিছু না।

পশ্চিমা-সমাজে নারী-পুরুষের কোনো সুনির্দিষ্ট আদর্শিক অবস্থান, নৈতিকতা কিংবা মূল্যবোধ নেই। তারা জানে না তারা কেন বাঁচে, কী করা উচিত। কাজেই, সেখানে নারী-পুরুষদের মধ্যে হতাশা এবং নৈরাজ্য সৃষ্টি হওয়া খুব স্বাভাবিক। নারীরা পুরুষের 'সমান' হবার চেষ্টায় কয়েক শতাব্দী ব্যয় করে ফেলেছে, অথচ তারা একবারও জিজ্ঞেস করার সময় পায়নি, যেসকল কারণে তারা পুরুষদের সেরা মনে করছে সেগুলো আসলেই সফলতা বা শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ড কিনা।

'লিঙ্গ-সমতা' কোনোভাবেই নারী-পুরুষের মধ্যকার সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি করতে পারে না। বরং নারী-পুরুষের মধ্যকার ভালোবাসা, আশা, দায়িত্ব এবং অধিকার সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা, পারস্পরিক মানসিক বোঝাপড়াই পারে সুস্থ পরিবার, সমাজ ও সভ্যতা তৈরি করতে। আমাদের আচরণের ভিত্তি হওয়া উচিত ন্যায়বিচার; নিজেদের খেয়ালখুশি নয়। শুধু ইসলামই পারে নারী-পুরুষের যোগ্যতা অনুসারে শ্রমবণ্টন করে উভয়ের অধিকার নিশ্চিত করতে।[৪৫]

---

[৪৫] আন্তর্জাতিক বক্তা ও লেখিকা জারা ফারিসের নিজস্ব ওয়েবসাইটে প্রকাশিত *'3 Myths on Domestic Abuse'* অনুবাদ।

সাহিত্য ও পপ কালচারে নারীবাদ এবং ইসলামবিদ্বেষের ভয়াল রূপ

মার্গারেট এটউডের লেখা জনপ্রিয় *The Handmaid's Tale* একটি ডিস্টোপিয়ান উপন্যাস। সেখানে তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে পুরুষরা নারীদেরকে বন্দি করে রাখে। কাল্টরা যেমন ধর্মীয় কথাবার্তা ব্যবহার করে তাদের অনুসারীদের ব্রেইনওয়াশ করে, পুরুষরা তেমনই নারীদের ব্রেইনওয়াশ করে। এভাবে তারা নারীদেরকে নিজেদের দাস বানিয়ে নেয়। হাজার বছর ধরে কীভাবে পুরুষরা নারীদেরকে নির্যাতন করে গিয়েছে তার একটি চিত্র এঁকেছেন তিনি এ বইয়ে।

অনলাইন স্ট্রিমিং সার্ভিস হুলু (Hulu) এ উপন্যাসের ভিত্তিতে সিরিজ নির্মাণ করেছে। এ সিরিজ অল্প সময়েই বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। তারা মূল উপন্যাস থেকে কেবল থিমই নিয়েছে, বাকিটা নিজেদের মতো করে করেছে। ইসলামের বিরুদ্ধে নিজেদের ইচ্ছামতো মিথ যুক্ত করেছে ও ব্যাপক ইসলামোফোবিয়ার প্রচার করেছে। মুসলিম নারীদের পোশাক নিয়ে তাদের আপত্তি বহুদিনের এবং তা নিয়েই প্রোপাগান্ডা করা হয়েছে সিরিজে। সেখানে ঘরের নারী চাকর একটি আলখেল্লা ধরনের জামা পরেন যেটাতে তার দেহের আকার বোঝা যায় না। অনেক সময় তাদের মুখও কাপড় দিয়ে ঢাকা থাকে। দেখানো হয়, এসব পোশাক আসলে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং এভাবে নারী স্বাধীনতা হরণ করা হচ্ছে।

কিন্তু এখানেই শেষ না। বোরকা নিয়ে পশ্চিমা সমাজে যেসকল সমালোচনা প্রচলিত সেগুলোতেই শেষ না তাদের প্রোপাগান্ডা। ইসলামোফোবরা নারীবিদ্বেষের যেসকল মিথ্যাচার করে সেগুলোও এখানে শক ইফেক্ট হিসেবে যুক্ত করা হয়েছে। এতসব অর্থহীন গল্প দিয়েই তারা তাদের প্লট তৈরি করেছে। এভাবে গড়ে উঠেছে এ সিরিজের একেকটি গল্প। থিম, করুণ ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক দিয়ে আরও বেশি আবেদন তৈরি করা হয়েছে। ইসলামের বিরুদ্ধে বেশ কিছু প্রোপাগান্ডার একটি হলো—Genital mutilation। দেখানো হয়েছে, সমকামিতার দায়ে অভিযুক্ত এক নারীকে এ প্রক্রিয়ায় শাস্তি দেওয়া হয়। আরেক দৃশ্যে এক মেয়ে যৌন নির্যাতনের শিকার হওয়ার অভিযোগ আনলে তাকে বলা হয়েছে, এটা নাকি তারই

দোষ। ইসলামোফোবরা মুসলিমদেরকে ভিক্টিম ব্লেমিং-এর দায়ে অভিযুক্ত করে। এর একটি দুর্বল চিত্রায়ণ হলো এ দৃশ্য। ইসলামের ইতিহাসে কখনো এমন হয়েছে বলে দেখা যায় না। নারী চাকরদের প্রশিক্ষণকেন্দ্র দ্য রেড সেন্টারে যে গ্রুমিং গ্যাং-এর অভিযোগ দেখানো হয়, তা আসলে ডানপন্থীদের আবিষ্কার।

অনেক সেক্যুলার নারীবাদীই দাবি করেছেন, এগুলো দিয়ে আসলে হুলু ইসলাম ও ইসলামি আইনকেই বুঝিয়েছে। অথচ বইয়ের মূল লেখিকা এটউড দাবি করেছেন, তিনি আসলে নারীবিদ্বেষী কাল্ট বলতে আমেরিকার ডানপন্থীদেরকে উত্থানকে বুঝিয়েছেন।[৪৬]

একটু গভীর নজর দিলেই আমরা নারীবাদ ও সেক্যুলারিজমের ভণ্ডামি বুঝতে পারব। এসব তাত্ত্বিক আদর্শ যে আসলে নারীকে কোনো মুক্তিই দিতে পারবে না, বরং নিয়ে যাবে ধ্বংসের অতলে, তাও বুঝতে পারব।

ইসলাম ও হলিউড নিয়ে সংক্ষেপে কিছু কথা

ওয়াল্ট ডিজনি কর্পোরেশনের একাংশ ও এনটারটেইনমেন্ট সার্ভিস হুলু A Handmaid's Tale কে সিরিজের জন্য নতুন করে লিখেছে। হুলুর পথচলায় একটু নজর না দিলেই নয়।

একসময় হুলুর আংশিক মালিকানা ছিল রুপার্ট মারডোক নিউজ কর্পোরেশনের। তারা হলো রিপাবলিকান, নিউকন ও ডানপন্থী মিডিয়া মেশিন। ৯/১১ এর পরে নিউইয়র্কের মুসলিমদের ওপর সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসী হামলার পরিকল্পনা করা সন্ত্রাসীরাও এই নিউজ কর্পোরেশনকে নিজেদের প্রধান উৎসাহ হিসেবে উল্লেখ করেছে।[৪৭]

সাম্প্রতিক সময়ে ডিজনি (Disney) এবং কমকাস্ট (Comcast) ঘোষণা দেয় যে,[৪৮] ডিজনি হুলুর[৪৯] সম্পূর্ণ অপারেশনাল নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করবে। তবে কমকাস্টের NBCUniversal ২০২৪ সালের শেষ পর্যন্ত হুলুর কন্টেন্টের লাইসেন্স প্রদান অব্যাহত রাখবে। কমকাস্ট মার্কিন পদপ্রার্থীদের অন্যতম প্রধান অর্থ জোগানদাতা। কমকাস্টের সিইও হলো ব্রায়ান রবার্টস,]৫০[একজন

---

[৪৬] https://www.theguardian.com/books/2017/feb/11/margaret-atwood-handmaids-tale-sales-trump

[৪৭] https://www.trtworld.com/opinion/rupert-murdoch-s-islamophobic-media-empire-25079

[৪৮] https://variety.com/2019/digital/news/disney-full-control-hulu-comcast-deal1203214338/

[৪৯] https://variety.com/2019/digital/features/streamers-content-standards-tv-1203409601/

[৫০] https://www.opensecrets.org/political-action-committees-pacs//C00248716/candidate-recipients/2018

রিপাবলিকান।[৫১] সে ইসরায়েলের প্রতি তার অনুরাগের জন্য পরিচিত।[৫২] কমকাস্ট রিপাবলিকান লবিস্ট মিচ রোজকে[৫৩] ওয়াশিংটনে তার ৫০-ব্যক্তির মাল্টিমিলিয়ন ডলারের 'লেজিসলেটিভ' (লবিং) অফিসের প্রধান হিসেবে পদোন্নতি দিয়েছেন। রোজ এখন 'Senior Vice President of Congressional and Federal Government Affairs' হিসেবে কাজ করবেন। শোবিজ জগতের কারও এ পদকে সন্দেহ করার কথা নয়। রোজকে কমকাস্টের সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট ডেভিড এল কোহেনের কাছে রিপোর্ট করতে হবে। কোহেন[৫৪] ইসরায়েলি লবির অন্যতম একজন, ফিলাডেলফিয়ার ইসরায়েলপন্থী ইহুদি ফেডারেশনের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান এবং ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর অন্যতম তহবিল সংগ্রহকারী।[৫৫] এনবিসির মালিক হিসেবে কোহেনকে তার পুরোনো বন্ধু ব্রায়ান রবার্টসের ডান হাত বলা যায়।
ভুলে গেলে চলবে না, একটি উড়ন্ত কার্পেটে একটি বানর ও একটি ছোট ছেলে, সাথে জাদুর বাতি—এ কার্টুনের মাধ্যমে ইসলামি বিশ্বে হলিউড জনপ্রিয়তার শীর্ষে উঠে গিয়েছিল। ৯০-এর দশকে নির্মিত 'আলাদিন' হলো কলোনিয়ালিস্টদের চোখে মুসলিমদের চিত্রায়ণ।[৫৬] একই পন্থায় আজও নিউকন এবং জায়োনিস্টরা কাজ করে যাচ্ছে।[৫৭]

ইসলামের মূল্যবোধকে লক্ষ্য করে এমন ঘৃণার তির কেবল ডিজনির কার্টুনই ছোড়ে না। ২০০৯ সালে ডিজনি মার্ভেলের স্বত্বাধিকার ক্রয় করে নেয়। দশ বছর পর দেখুন, বহুল প্রশংসিত ব্ল্যাক প্যানথার (Black Panther) মুভি সেই পুরোনো আফ্রিকান মুসলিম স্টেরিওটাইপগুলোকে[৫৮] আবার উগলে দিচ্ছে। সেখানে বোকো হারাম ধরনের একটি দল 'ওয়াল্লাহি, ওয়াল্লাহি' বলে নারীদেরকে জোর করে হিজাব পরিয়ে কিডন্যাপ করেছে। পরবর্তী সময়ে মুক্ত হওয়ার পরে তারা নিকাব, হিজাব খুলে ফেলে ইউরোপীয় কলোনিয়াল প্রভুদের শিখিয়ে দেওয়া স্বাধীন হয়ে যায়। আজকালকার মুভিগুলোতে হিজাব খুলে ছুড়ে ফেলা স্বাধীনতার সিম্বোলিজম।

---

[৫১] https://moneyinc.com/comcast-ceo-brian-roberts/
[৫২] https://forward.com/news/193521/brian-roberts-jewish-roots-and-outsized-ambition-d/
[৫৩] https://www.inquirer.com/philly/business/comcast/comcast-lobbyist-republican-trump-washington-office-20180321.html
[৫৪] https://mondoweiss.net/2011/11/nbc-and-the-israel-lobby/
[৫৫] https://mondoweiss.net/2018/04/israel-just-american/
[৫৬] https://www.vox.com/2019/5/24/18635896/disney-live-action-aladdin-controversy-history
[৫৭] https://qz.com/quartzy/1629534/aladdin-review-disneys-remake-is-held-back-by-old-cliches/
[৫৮] https://www.middleeasteye.net/opinion/french-vitriol-towards-muslim-women-reveals-countrys-deeper-malise

আসলে এগুলোতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। প্রায় ২৫ বছর ধরে ইসলামের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাওয়া মার্কিন সেনাবাহিনী এ ধরনের জনপ্রিয় মুভিগুলো তৈরিতে যুক্ত থাকে। বিভিন্ন দলিলে বের হয়ে এসেছে,[৫৯] হলিউডে আমেরিকার সেনাবাহিনী সরাসরি হস্তক্ষেপ করে। অনেক ক্ষেত্রেই তারা মূল গল্পের কাহিনি নিজেদের প্রোপাগান্ডা অনুসারে সাজিয়ে লেখে।

এমন প্রোপাগান্ডা মেশিনের মাঝে বসে হুলু এমন কিছু বিনোদন সামনে নিয়ে আসে যাতে তাদের স্বার্থোদ্ধারও হবে, আবার সাবস্ক্রিপশনও বাড়বে। তারা থিম, টোন ব্যবহার করে মানুষের আবেগকে নাড়া দেয়, মানুষের একদম সাধারণ ভীতিগুলোকে পুঁজি করে ভীতি ছড়ায়, তাদের ধ্যান-ধারণা প্রচার করে এবং প্রচণ্ড যৌন সহিংসতাকে সমাজের চোখে স্বাভাবিক করে দেয়। তাদের এ উদ্দেশ্যগুলো তারা 'বুদ্ধিজীবিতা', 'সামাজিক ন্যায়বিচার', 'নারীবাদ' ইত্যাদি ভারী ভারী শব্দের আড়ালে লুকিয়ে রাখে। 'পর্যালোচনা' (Critique) হলো আরেক গালভরা শব্দ, মানুষের খুবই পছন্দের।

এক আত্মসমালোচনাহীন ডিস্টোপিয়ান রূপকথা, সেক্যুলারিজমের উসকানিদাতা

The Handmaid's Tale-এর ডিস্টোপিয়ান গল্পটি বুঝতে হলে আগে আমাদেরকে এর প্রেক্ষাপট, সমন্বয় ও এন্থ্রোপলজিকেল বিষয়াবলি বুঝতে হবে। গল্পটি কখন কীভাবে আসে তাও বিশ্লেষণ করতে হবে।

কোনো বইয়ের রূপান্তরিত চলচ্চিত্র দর্শনের দর্শনক্ষেত্রে এক প্রকার তাৎক্ষণিকতার সৃষ্টি করে, সেই সাথে ঘটনার প্রেক্ষাপটের বহুমাত্রিকতার ওপর পাঠকের নির্ভরশীলতাও হ্রাস করে। একজন পাঠক ঘটনার প্রেক্ষাপট নিয়ে ভাববার যতটা সময় পান, একজন দর্শককে ততটা সময় দেওয়া হয় না। ফ্রেমের পর ফ্রেম হিংস্র গতিতে দর্শকের দৃশ্যপটে পরিবর্তন আনতে থাকে।

সিরিজে নারীদের বিরুদ্ধে যে পরিমাণ সহিংসতা দেখানো হয়েছে তা সমালোচকদেরও নাড়া নিয়েছে। এক সমালোচক লিখেছেন, 'দ্বিতীয় সিজনের সহিংসতা, অত্যাচার যেকোনো দর্শকের মনকেই বিষিয়ে দেবে'। দর্শকরা মুগ্ধতা এবং বিতৃষ্ণার এক শক্তিশালী ও নেশাকর অনুভূতির সম্মুখীন হয়। শালীন পোশাকে থাকা নারীদেরকে সিরিজে ভয়াবহ নির্যাতন করা হচ্ছিল। অনেক নারীই নিকাবের মতো মুখ ঢাকা পোশাকও পরেছিল। অথচ এমন কোনো বর্ণনাই মূল উপন্যাসে ছিল না। এ ধরনের সহিংসতা দেখিয়ে লাভ কী হচ্ছে? প্রোডিউসারদের

---

[৫৯] https://medium.com/insurge-intelligence/exclusive-documents-expose-direct-us-military-intelligence-influence-on-1-800-movies-and-tv-shows-36433107c307

মতে, এভাবে নাকি পরিবর্তন আসবে। অথচ সমালোচকরা বলছেন, এভাবে নারীর প্রতি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি আরও সহিংস হচ্ছে। পুরুষদেরকে বোঝানো হচ্ছে তারা ঐতিহাসিকভাবেই নারীদের বিরুদ্ধে সহিংস।

মূল বার্তাটি হলো, সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা এবং প্রার্থনা করা সত্ত্বেও এ নারীরা আশাহত, নিরুপায়। খোদা তাদেরকে ভুলে গিয়েছেন। অন্যদিকে তাদের 'মনিব' পুরুষরা ধর্মগ্রন্থ বানিয়ে নিজেদের অন্যায়কে বৈধ করে। বেগম রোকেয়াও 'আমাদের অবনতি'তে এমন কথাই বলেছেন, 'ধর্ম শেষে আমাদের দাসত্বের বন্ধন দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর করিয়াছে, ধর্মের দোহাই দিয়া পুরুষ এখন রমণীর উপর প্রভুত্ব করিতেছেন। তাই ধর্ম লইয়া টানাটানি করিতে বাধ্য হইলাম'।

বোঝা দরকার, কোনদিকে মোড় নিচ্ছে গল্প।

যদিও বইটি ছিল খ্রিষ্টধর্ম নিয়ে, কিন্তু সিরিজে ইসলামি পোশাক ও সংস্কৃতিকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। বলাই বাহুল্য, খ্রিষ্টান জাতীয়তাবাদের ওপর 'বুদ্ধিবৃত্তিক' আক্রমণের ছদ্মবেশে ইসলামকে অবমাননা করা হয়। এ প্রকল্পটি সামসময়িক বৈশ্বিক প্যারাডাইম দ্বারা আরও প্রকট হয়েছে। সেক্যুলার মানবতাবাদীরা ভালো এবং মন্দের চূড়ান্ত মানদণ্ড হিসেবে কেবল নিজেদের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দেয়। এটিই তাদের চিন্তার প্যারাডাইম। ইসলামের এমন প্রসার তাদের সেক্যুলারিজম প্রসারকে থমকে দিচ্ছে।

ফলে জঘন্য ইসলামবিদ্বেষী নেটওয়ার্কগুলো নাস্তিকদের সাথে মিলে ফুলেফেঁপে উঠেছে।[৬০] নিজেদের এজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্য জুডিও-খ্রিষ্টান সভ্যতাকেও তারা সমর্থন করবে। তখন তা তাদের নাস্তিকতা কিংবা সেক্যুলারিজমের সাথে সাংঘর্ষিক হয় না। এসব নাস্তিক মানবতাবাদী 'অধিকার' প্রচারকেরা নৈতিকতার থোড়াই কেয়ার করে। অধিকাংশের ইচ্ছাই নৈতিক তাদের কাছে। যদিও অধিকাংশের ইচ্ছাও তাদেরই মিডিয়াই তৈরি করে। অন্যদিকে 'বুদ্ধিবৃত্তি'র নামে তারা তৈরি করেছে ঘৃণার ইন্ডাস্ট্রি।

ঘৃণার চর্চার ভিক্টিম নারী

আজকের যুগে, সোশ্যাল মিডিয়া এবং ইন্টারনেট গোলমাল এবং বিক্ষিপ্ততা তৈরি করে যা তথ্য এবং বাস্তবতাকে সেন্সর করে। তারা বাস্তবতাকে বদলে দেয়, ঘটনা নিউজ হয়ে যায় এবং বিতর্ক-বিভক্তির জন্ম হয়। দর্শকদের আবেগ এখন অনেক

[৬০] https://www.vice.com/en/article/3k7jx8/too-many-atheists-are-veering-dangerously-toward-the-alt-right

সংবেদনশীল। তারা বাস্তবতা ও ফিল্মকে গুলিয়ে ফেলে। তাই এ সুযোগে আবেগপ্রবণ জনতার অন্তরে অনেক ধারণার বীজ রোপণ করে দেওয়া যায়। এসব ধ্বংসাত্মক বীজ বিরাজমান ভয় ও ঘৃণাকে কাছে টানে, যেমন নারীর প্রতি সহিংসতা। এ বীজে সোশ্যাল মিডিয়ার ভাষ্যকার এবং হলুদ সাংবাদিকরা পানি ঢালে। এরা হুলু সিরিজের ইসলামবিরোধী বার্তা প্রকাশ করে এবং তাদের নিজস্ব রাজনৈতিক স্বার্থে এটিকে কাজে লাগায়। এসব ভাষ্যকার নারীরা কট্টর সেক্যুলার লবির পুরুষ হ্যান্ডলারদের কথায় ওঠাবসা করে।

এদের মধ্যে রয়েছেন ইয়াসমিন মোহাম্মদ—[৬১] যিনি আমেরিকায় নিউ এথেইজমের নেতা স্যাম হ্যারিস,[৬২] তাঁর 'বন্ধু' মাজিদ নওয়াজ, আয়ান হিরসি আলি,[৬৩] শিরীন কুদোসির[৬৪] (মুসলিমবিরোধী ইসরায়েলি ক্লারিয়ন প্রজেক্টে তিনি নিজেকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেয়ে ভালো মানুষ বলে দাবি করেন)[৬৫] মতো মানুষদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল এবং তারা ইয়াসমিনকে ব্যবহার করেছিল। ২০১৮ সালের 'সেক্যুলারিস্ট অফ দ্য ইয়ার' ঘোষিত হোন আমিনা লোন।[৬৬] তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সেক্যুলার ন্যারেটিভে স্বাধীনতার অধিকারের কথা বলে মুসলিম নারীদের নগ্নবেশে[৬৭] ঘরের বাইরে নিয়ে আসা।

কিন্তু ইসলামের বিষোদগার করতে Handmaid's Tale কে ব্যবহার করে সবচেয়ে মারাত্মক উদাহরণটি দ্য স্পেকটেটরের অ্যালিসন পিয়ারসন থেকে এসেছে। পিয়ারসন[৬৮] অত্যন্ত ঘৃণার সাথে লিখেছেন—'মুসলিম নারীরা মূর্খ, যাদেরকে [...] মৌলবাদী বর্বররা প্রয়োজনে ব্যবহার করে'। তিনি আরও বলেছিলেন যে, পুরুষরা যেন তাদের দেহাবয়ব সম্পর্কে কোনো ধারণা পেতে না পারে তাই মুসলিম নারীরা মাথা থেকে পা পর্যন্ত নিজেদের আবৃত করে রাখে। অন্য কথায় মুসলিম নারীরা মুসলিম পুরুষদের দ্বারা একইভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় যেভাবে The Handmaid's Tale এ নারীদেরকে পুরুষরা নিয়ন্ত্রণ করে। এগুলো

---

[৬১] https://mobile.twitter.com/YasMohammedxx/status/905833957152907264
[৬২] https://twitter.com/SamHarrisOrg/status/1194019234818359296
[৬৩] https://www.yasminemohammed.com/
[৬৪] https://mobile.twitter.com/ShireenQudosi/status/862559308126367745
[৬৫] https://twitter.com/ShireenQudosi/status/872511403831066625
[৬৬] https://mobile.twitter.com/Amina_Lone/status/1091396525559824385
[৬৭] https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/mar/14/uk-learn-english-free-classes-government-funding
[৬৮] https://www.spectator.co.uk/article/the-appalling-vanity-of-western-feminists-who-think-margaret-atwood-writes-about-them

আসলে স্টেরিওটাইপিং এবং পর্দা নিয়ে সব অরিয়েন্টালিস্ট ব্যাখ্যা। মনে রাখবেন (ট্রিলিয়ন বার) মুসলিম নারীরা পুরুষদের আদেশে নিজেদের আবৃত করে না; বরং আল্লাহর আদেশ পালন করার জন্য নিজেকে আবৃত করে।

দুঃখজনক হলেও সত্য, পিয়ারসনের মতো সেক্যুলার মহিলাদের জন্য এমন স্টেরিওটাইপ এবং ওরিয়েন্টালিস্ট থিম এড়িয়ে যাওয়া কঠিন। তারা এতটাই বুদ্ধিবৃত্তিক এবং আধ্যাত্মিকভাবে স্তব্ধ যে তারা সকল কিছুকেই পুরুষ-মহিলা, নিপীড়ক-নিপীড়িত মূলনীতিতে ব্যাখ্যা করে। এটাই বস্তুবাদ এবং উপযোগবাদের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি, যেখানে শারীরিক তৃপ্তিই আচার-আচরণের সর্বোচ্চ মাপকাঠি।

এরা নারীর যৌন সামগ্রীকিকরণ ব্যবস্থার বাইরে এসে জীবনযাপনের কথা ভাবতে পারে না। নারীর দেহের যৌন প্রদর্শনই তাদের প্রোডাক্ট। প্রতিদিন আমরা বিজ্ঞাপন এবং গণমাধ্যমের সাহায্যে নারীর খোলামেলা ছবি দেখছি। বিজ্ঞাপন, ম্যাগাজিন, বিলবোর্ড, বাস এবং দোকানের জানালা সব জায়গায় স্বল্পবসনা নারীদের উপস্থিতি। নারীর উন্মুক্ত দেহাঙ্গ সেঁটে দেওয়া। সবখানে যৌনতা, উন্মুক্ত যৌনতা। মজার বিষয় হলো, এসবের কোনোটিতেই পুরুষের শ্বাসরুদ্ধকর নিয়ন্ত্রণ দেখেন না। তাদের কাছে কেবল মুসলিম নারীরা অসহায় অক্ষম হিসেবে বিবেচিত যারা কিনা কঠোর বর্বরতার শিকার।

এরা এতটাই প্যারানয়েড যে ভবিষ্যতে তারা দাবি করতে পারে, নিকাব পরিহিতা নারীরা টেলিভিশনে আসতে পারবে না এবং তাদের কোনোক্ষেত্রেই কোনো মতামত থাকবে না। তারা মুসলিম নারীদেরকে বাকরুদ্ধ করে দিতে চায়, কারণ একজন মুসলিম নারীর কাছে পর্দা করার অর্থ সম্মানিত হওয়া, প্রাণবন্ত হওয়া। তারা তা কখনোই বুঝতে পারে না। তারা বরং ভয় পায় এবং পর্দাকে গাল দেয়।

নারীদের সাবধান হওয়া উচিত। তারা নারীদেরকে যে জীবনের দিকে আহ্বান করে, তা কোনো মানুষের জীবন নয়। ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীর হৃদয় অন্ধকার হয়ে যায়, আল্লাহ তাদের অন্তরে মোহর মেরে দেয়। সে হৃদয়ে কখনো আলো প্রবেশ করতে পারে না এবং সে চূড়ান্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

পিয়ারসন তার প্রবন্ধে পুলিশকে (যাদের বেশিরভাগই পুরুষ) উৎসাহিত করেছেন যেসব দেশে নারীদের 'অপব্যবহার', 'যৌনাঙ্গহানি' এবং 'স্তন ইস্ত্রি করা' প্রচলিত সেসব দেশ থেকে আসা ফ্লাইট স্ক্যান করতে। অল্পবয়সী মেয়েদের গোপনাঙ্গের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে আপনি কীভাবে ফ্লাইট স্ক্যান করতে পারেন? এমন চিন্তা করাও তো অসুস্থ মস্তিষ্কের পরিচয়। এর উদ্দেশ্য মূলত পুরুষত্বকে সামরিকীকরণ করে মুসলিম ও তাদের শিশুদের ব্যক্তিগত জীবনে অনধিকারপ্রবেশ করা এবং এর

মূলে রয়েছে ইসলাম বিদ্বেষ।

মুসলিম কন্যাশিশুদের বিরুদ্ধে এ যুদ্ধ ইসলামের প্রতি তাদের গভীর ঘৃণা থেকে এবং মুসলিম শিশুদের শৈশবকে ধ্বংস করার প্রয়াস থেকে। এটি তাদের ডিহিউম্যানাইজেশন এজেন্ডা। মুসলিম শিশুদের জন্য এদের উদ্‌বেগ প্রকাশ করাটা পর্যন্ত ইউরোসেন্ট্রিক। পিয়ারসন[৬৯] মুসলিম শিশুদের সুরক্ষার জন্য সন্দেহভাজন সন্ত্রাসীদের (মুসলিমদের) ওপর ব্যাপক নজরদারির আহ্বান জানিয়েছেন। এদিকে, পিয়ারসনের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় পুলিশ মুসলিম কন্যাশিশুদের শরীর স্ক্যান করবে, কেননা তারা 'সন্দেহভাজন সন্ত্রাসী'।

নারী এবং গর্ভকে রাষ্ট্রের সাথে যুক্ত করার সেক্যুলার ফাঁস

Handmaid's Tale-এর মূল সতর্কতা হলো, নারীর গর্ভকে এমন এক সমাজ বা রাষ্ট্রের কাজে ব্যবহার করার বিষয়টি, যার মূল দর্শনে শ্বেতাঙ্গ সভ্যতাকে দেবতুল্য মনে করা হয়। অ্যাটউডের গল্পে গর্ভ ও রাষ্ট্র এবং নারী ও রাষ্ট্রের মধ্যকার এই মারাত্মক সম্পর্কের বিষয়টি ওঠে এসেছে; আজ আমাদের এই ক্ষতিগ্রস্ত মানবতাবাদী সেক্যুলার সমাজের অবস্থাও ঠিক তেমনই।

এই গল্পে নারী বন্দি। তাকে ব্রেইনওয়াশ করে যে 'ঈশ্বর'-এর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করতে বাধ্য করা হয়েছে, সে ঈশ্বর নির্দয়। এই ঈশ্বর মূলত একটি জাতি, গোত্র বা রাষ্ট্র, মূর্খতা ও লোভ দ্বারা পরিচালিত সত্তা। মূর্খতা ও লোভ মূলত সেই সমাজের বৈশিষ্ট্য যা 'সংখ্যাগরিষ্ঠের মত' মেনে চলে। 'সংখ্যাগরিষ্ঠের মত' নিজেই একটি অবাস্তব ধারণা কিন্তু ভয় এবং জনপ্রিয়তার মাধ্যমে ভোট জিতার জন্য এর উৎপত্তি।

পুরুষেরা হলো স্রষ্টার প্রহরী এবং যেসব নারীরা নারীর কল্যাণের লক্ষ্যে কাজ করে বলে দাবি করে, বাস্তবে তারা তাদের নিজস্ব শক্তি সংরক্ষণ করে এবং অন্যের ওপর তা প্রয়োগ করে। সুতরাং এ ব্যবস্থায় বেঁচে থাকার জন্য দাসীদের অবশ্যই পুরুষের আইনের পূজা করতে হয়। সত্য বলতে, এটিই হলো মানবতাবাদী সেক্যুলারিজম। ঠিক একই ধর্ম অনুসরণ করেই পথভ্রষ্ট ফিরাউনের বিরুদ্ধে মুসার অনিবার্য বিজয় রুখতে অসংখ্য নবজাতক পুত্রসন্তানকে হত্যা করা হয়েছিল। যেসব ধাত্রীরা এক পুত্রসন্তানের জন্মের খবর পৌঁছে দিয়েছিল, তাদেরকে ফেরাউনই

---

[৬৯] https://www.cambridge-news.co.uk/news/cambridge-news/manchester-attack-intern-terror-suspects-13078688

নিযুক্ত করেছিল।[৭০]

সিস্টেমের উপযোগ বনাম ইসলামে সম্মান

নারী নির্যাতনের ইতিহাস প্রমাণ করে, আল্লাহর আইন ছাড়া আর সকল আইনেই নারীরা নির্যাতিত, অপদস্থ হয়েছে। এ বাস্তবতাকে অস্বীকার করে নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য, নিজেদেরকে প্রাসঙ্গিক করে রাখার জন্য নারীদেরকে তিনটি ঐতিহাসিক অবস্থা বা 'ওয়েভ'-এর মধ্য দিয়ে যাওয়া লেগেছে। কিন্তু লাভ হয়নি। বরং আরোপ হয়েছে নতুন নতুন সমস্যা। সেক্যুলার গুরুরা এখন ভিন্ন ক্রিটিক্যাল কিংবা ডানপন্থী, এমনকি অনেক সময় ইসলামি ব্যাখ্যা দিয়ে হলেও নিজের অবস্থান ধরে রাখার চেষ্টা করে।

নারীবাদের সমস্যা আসলে অর্থনৈতিক। নারীবাদের তত্ত্ব কেবল শ্রমজীবি অধিকারকেই (আসলে ব্যাংকিং সেক্টরকে) লাভবান করেছে তা নয়; বরং এ নিহিলিস্টিক সিস্টেমে তারা নারীদের ওপর হওয়া সত্যিকার জুলুম নিয়ে কথা বলতে মোটেই আগ্রহী না। তাদের কোনো ঐশী কর্তৃপক্ষ নেই যে তাদেরকে শিখিয়ে দেবে কীসের দাম কেমন। তারা বস্তুবাদী জীবন আর অর্থনীতিকেই বানিয়ে নিয়েছে তাদের খোদা। তাই তা দিয়েই সব বিচার হয়। অর্থই সব।

আসুন, সেক্যুলার সিস্টেমে এবং ইসলামি সিস্টেমে নারীর সম্মানের তুলনা করি। ইসলামে মানবজীবন পুরোটাই حرمة শব্দের সাথে যুক্ত। বরাবর হবে না, ভাসাভাসা অনুবাদ করলে এর অর্থ পবিত্রতা। আল্লাহর কাছে মানুষের রক্ত, জীবন, সম্পদ, সম্মানের মর্যাদা পৃথিবীর যেকোনো বস্তুবাদী বিষয়ের চেয়ে বেশি। কেবল তাই না, রাসুলুল্লাহর মতে, মুসলিমের রক্তের মূল্য কাবার চেয়েও বেশি। নারীর সম্মানের মর্যাদা এখানে পরিবর্তন হবে না।[৭১] এ সম্মান অন্তর্নিহিত এবং অতিক্রান্ত, এ সম্মান আল্লাহর দেওয়া। ইসলাম বাদে আর কোনো আদর্শ এমন

---

[৭০] "মুসা আ. এমন এক বছর জন্মগ্রহণ করেন যখন সকল ছেলেশিশুকে হত্যা করা হচ্ছিল। ফিরআউনের কর্মচারীরা এ কাজ করত। সেখানে ধাত্রীরা ফিরআউন থেকে টাকা পেয়ে নজরদারি করত। কাউকে গর্ভবতী দেখলেই নাম টুকে নিত। ... যদি সে নারী কন্যাসন্তানের জন্ম দেয়, তাকে ছেড়ে দিত। কিন্তু যদি কোনো ছেলে জন্ম নিত, খুনীরা আসত তাদের ধারালো ছুরি নিয়ে এবং সেই ছোট বাচ্চাকে হত্যা করত।—ইবনে কাসির, সুরা কাসাস, আয়াত ৪।

[৭১] রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'একজন মুমিনকে অকারণে হত্যা করা আল্লাহর চোখে পুরো পৃথিবী ধ্বংসের চেয়েও মারাত্মক'। (বায়হাকি) আব্দুল্লাহ ইবনে উমর বর্ণনা করেছেন, আমি রাসুলুল্লাহকে ﷺ কাবা তাওয়াফ করতে করতে বলতে শুনেছি, 'তুমি কত পবিত্র! কত পবিত্র তোমার গন্ধ! তুমি কত মহান এবং কত মহান তোমার পবিত্রতা! সে আল্লাহর কসম যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন, আল্লাহর কাছে একজন মুমিনের পবিত্রতা তোমার চেয়ে বেশি। তাঁর সম্পদ, তাঁর জীবন, তাঁর সবকিছুই পবিত্র এবং ভালো'। (ইবনে মাজাহ)

সম্মান দেয়নি। সেক্যুলার সমাজ তো আরও না। এখানে মানুষ হলো অর্থনীতির চাকা। ইসলাম সবাইকে নারীর সম্মান বোঝার দিকে আহ্বান করে। এ সম্মান আল্লাহর কাছ থেকে আসা, কোনো মানুষের ঠিক করে দেওয়া না।

একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে নিজের প্রতিভা ও দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে মুসলিম নারীরা আত্মিক প্রশান্তি অনুভব করেন। কেননা সে তার সৃষ্টিকর্তার আনুগত্য করে। আল্লাহ যেভাবে জীবনযাপন করতে বলেছেন সেভাবেই জীবনযাপন করে। আর আল্লাহকে আনুগত্যের মাধ্যমে একজন মুসলিম নারী স্বাভাবিকভাবে মানবতারও সেবা করে।

নারীর গর্ভকে সেক্যুলারিজমে হয় হেয় করা হয় বা বস্তুগত উদ্দেশ্যে কাজে লাগানো হয়। কিন্তু ইসলামে গর্ভের অবস্থান সম্পূর্ণ ভিন্ন। গর্ভের আরবি হলো রাহিম এবং এর মূলশব্দ রা-হা-মিম আবার আল্লাহর দুটি নাম বা গুণের মূল শব্দ : আর-রাহিম এবং আর-রহমান (অতি দয়ালু এবং পরম করুণাময়)।

ইসলামে তাই একজন গর্ভবতী নারীর সাথে অত্যন্ত কোমল এবং সহানুভূতিপূর্ণ আচরণ করা হয়। কিছু আফ্রিকান মুসলিম সম্প্রদায় সন্তান জন্মদানকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে। তাদের মধ্যে মা এবং সন্তানের জন্য বিশেষ নির্জনতার ব্যবস্থা করার প্রথা চালু রয়েছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

> 'মহান আল্লাহ বলেন, আমার নাম রহমান—দয়াময়। আমি রেহেম (জরায়ু, আত্মীয় সম্পর্ক)-কে সৃষ্টি করেছি এবং আমার নাম থেকে তার নাম নির্গত করেছি। সুতরাং যে তাকে (গর্ভ ও আত্মীয়তার সম্পর্ক) বহাল রাখবে আমিও তার সাথে (রহমতের) সম্পর্ক বহাল রাখব। আর যে তা ছিন্ন করবে আমিও তাকে আমার থেকে ছিন্ন করব।'[৭২]

ইসলামে গর্ভের এমন সুউচ্চ মর্যাদার কারণে নারী-জীবন এবং পরিবারের ধারক হিসেবে মূল্যায়িত হয়। ইসলাম নারীকে বস্তুবাদ এবং এর অন্তহীন, শ্বাসরুদ্ধকর প্রত্যাশা থেকে মুক্ত করে। বরং মাতৃত্বকে ইসলামেই প্রথম প্রকৃত সম্মান দিয়েছে এবং মর্যাদার সর্বোচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত করা করেছে। ইসলামে মাতৃত্বকে করা হয়েছে আধ্যাত্মিক তাৎপর্যপূর্ণ। যখন এ গুরুত্ব এবং তাৎপর্য একজন মুসলিমা নারী অনুধাবন করতে সক্ষম হন, তখন তার পার্থিব অন্যান্য সমস্ত উদ্‌বেগ দূর হয়ে যায়। তারা তাদের দেহ-মনকে এসব প্রতিযোগিতামূলক মতাদর্শ এবং এদের মিথ্যা খোদাদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে পেরে আত্মিক প্রশান্তি অনুভব করেন। মুসলিম নারীরা অনুভব করে যে শুধু আল্লাহই তাদের সবচেয়ে ভালো জানেন এবং

[৭২] *সুনানুত তিরমিজি*, ১৯০৭

ভালোবাসেন। অন্য কারও দ্বারা তা সম্ভব নয়।

আর যখন নারীবাদের মতো সেক্যুলার ধারণা মুসলিম নারীর অবস্থানকে খর্ব করতে পারে না, তখন তার ফলাফল দাঁড়ায় প্রশান্তি এবং আত্মবিশ্বাস। তাই অধিকাংশ মুসলিম নারীই এ ধরনের আক্রমণের মুখে পড়লে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং নিজের রাস্তায় হাঁটা শুরু করে। এবং এটি নারীবাদী সেক্যুলারিস্টদের ক্রোধ আরও অনেক গুণ বাড়িয়ে দেয়।

নারীবাদীরা সেক্যুলার সিস্টেমের পণ্য

আমরা আমাদের সেক্যুলার এবং নারীবাদী বোনদের কিছু মনে করিয়ে দিতে চাই।

সেক্যুলারদের 'অধিকার-ভিত্তিক' সমাজে, নারীর দেহ, বৈশিষ্ট্য, অন্তর—সবই এই খাদক সিস্টেমের টার্গেট। পড়ালেখা কিংবা কর্মক্ষেত্রে, এমনকি সেক্যুলার পরিবারগুলোতেও নারীরা তাদের বস্তুবাদ, টাকা-পয়সা দিয়ে মূল্যায়িত হয়। বস্তুবাদী চাহিদায়, আরেক মানুষের লালসা দিয়ে নারীর মূল্য নির্ধারণ করা হয়, হোক তা কর্পোরেট কোম্পানির মালিক। যৌনবিকৃত নারীরাও অর্থ, সম্পদ ও জনপ্রিয়তার মোহে উন্মাদ হয়ে দৌড়াচ্ছে। তাদেরকে বলা হচ্ছে যে এসবের পেছনে না ছুটলে মুক্তি নেই। কিন্তু নারী কি আসলেই অন্তর থেকে শান্তিতে আছে? আসলেই কি এগুলোর নারীর প্রকৃত পরিচয়? সত্যিই তো, কীভাবে হবে?

এ প্যারাডাইমে নারী খুবই ভঙ্গুর। নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য তাকে নানান ধরনের আজব বেশ ধারণ করতে হয়। তাঁকে তৈরি করতে হয় শিখিয়ে দেওয়া 'আধুনিক', 'সফল' নারীর ব্যক্তিত্ব। বস্তুবাদ ও জাতে ওঠার আগুনে মশকির পালের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ছে নারী। শিক্ষা, গণমাধ্যম, মুভি কিংবা বুদ্ধিবৃত্তিক ডকুমেন্টারি—সবকিছুই নারীকে এমন হয়ে উঠতে উৎসাহ দিচ্ছে, চাপ দিচ্ছে। নারী পরে যাচ্ছে এক অসম লড়াইয়ের মাঝে।

এসব আধুনিক নারীরা যখন নারীবাদী কর্মী, বুদ্ধিজীবী ও প্রোপাগেটর হয়ে যায়, তা হলো সবচেয়ে বেশি দুঃখজনক। এমন সব আন্দোলন নিয়ন্ত্রণ করে ইসলামবিদ্বেষী, খোদাদ্রোহী একদল লোক, নৈতিকতার যাদের কোনো বালাই নেই। নিজেদের মতো নৈতিকতা আরোপ করে মানুষের ওপর চাপিয়ে দিয়ে একেই স্বাধীনতা বলে আখ্যা দেয় তারা। আসলে 'আধুনিক' নারীরাই জুলুমের হ্যান্ডমেইড। জুলুম চালানোর মূল অস্ত্র হলো নারীবাদ ও সেক্যুলারিস্ট হিউম্যানিজম। দুটো আদর্শ প্রথমেই আল্লাহর ইচ্ছা ও তাঁর সকল নীতিমালাকে ছুড়ে ফেলে দিয়েছে। আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করুন।

মানুষ মাত্রই কোনো অথরিটি চায়, কর্তৃপক্ষ চায়। তাই জালিমরা মানবজাতিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আরেক ধরনের পূজা নিয়ে আসে। এ অন্য খোদা হলো সেক্যুলার রাষ্ট্রের সরকার এবং এ বস্তুবাদি পুঁজিবাদী সিস্টেম। এ জুলুম থেকে বাঁচতে চেয়ে আবার এ জালিমদের তত্ত্বই কপচানো অর্থহীন। এভাবে জালিম আরও শক্তিশালী হয়। যেন সিংহ নিজের মুক্তির জন্য খাঁচার দেয়ালে বারবার আঘাত করছে। কিন্তু এভাবে খাঁচা তো ভাঙছেই না; বরং শেকলগুলো আরও শক্ত হয়ে বসে যাচ্ছে। এদিকে তাঁর সংগ্রাম, অপমানজনক সৌন্দর্য দেখে আনন্দ পায় দর্শক, খাঁচার মালিক উপার্জন করে নেয় কিছু অর্থ।

এসব সেক্যুলার নারীবাদী ধারণাগুলো বদলাবে। সময়ে সময়ে তাদের স্বাধীনতার সংজ্ঞা বদলাবে, সময়ের সাথে সাথে নিজেদেরকে প্রাসঙ্গিক করে রাখার জন্য তারা অনেক কিছুই করবে। দিনশেষে নির্ধারিত হবে না নারীর অধিকার, মুক্তির পথ। সাধারণ নারীবাদীরা আশা করে থাকে সেক্যুলারিজম সবাইকে সুযোগ দেবে এবং এর হাত ধরেই আসবে সমতা ও স্বাধীনতা। এ পন্থায় নারীর ভবিষ্যতে ধ্বংস ছাড়া আর কিছু নেই।

নারীবাদী নারীদেরকে নিজেদের সত্যিকার মূল্য বুঝতে হবে। তাদের মুক্তির প্রথম ধাপ হলো নারীবাদী আন্দোলন থেকে নিজেদেরকে বের করে নেওয়া। তাদের বোঝা উচিত, নারীবাদ যাকে মুক্তি বলে তা আসলে দাসত্ব, বন্দিত্ব। নারীবাদ যাকে বন্দিত্ব বলে দেখিয়েছে, শিখিয়েছে তাতেই আসলে মুক্তি। পপ কালচার বা প্রশাসনের শিখিয়ে দেওয়া বুলি মুক্তি না, মুক্তি আছে দাসত্বে, পরম করুণাময়ের দাসত্বে।

বিষয়টি বুঝতে হলে আধুনিক নারীদেরকে তাদের আগের সব মানসিক বেড়াজাল, জাতিগত ঘৃণা, বস্তুবাদী শিক্ষার সব ভূত থেকে বের হয়ে এসে ইসলামকে জানতে হবে। জানতে হবে জানার ও বোঝার মানসিকতা নিয়ে।

নারীরা পরম করুণাময় আল্লাহর অন্যতম সুন্দর এক সৃষ্টি। তারা কেবল আল্লাহর দাসত্ব করতে, তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করতেই জন্মেছে; পুরুষের কাছে নয়। যদি এ সহজ সত্য তারা মেনে নেয়, আল্লাহ ও দ্বীনকে ভালোভাবে জানে, তাহলে তারা বুঝবে কোথায় লুকিয়ে আছে তাদের শক্তি, পৃথিবীর উন্নয়ন আসলেই কীসে নিহিত এবং তারা কীভাবে ঘৃণার চর্চা না করে শান্তি ফিরে পাবে।[৭৩]

---

[৭৩] Muslim Skeptic এ প্রকাশিত তাহিরা আমাতুল্লাহর *Feminist Contradictions: The Anti-Islam Message Behind The Handmaid's Tale* আর্টিকেলটির অনুবাদ।

#MeToo আন্দোলন : যৌক্তিকতা ও সমাধান

গ্রাউন্ডহগ দিন

আমি #MeToo প্রচারণা সম্পর্কে লিখতে চাচ্ছিলাম না। প্রথমে মনে হয়েছিল এ আন্দোলন কিছু যৌন হয়রানির ভিক্টিমকে প্রকাশ্যে কথা বলার সুযোগ তৈরি করে দেবে। যদিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশ্যে নিজের মানসিক ট্রমা নিয়ে আলোচনা করাটা কারও কারও জন্য আরও বেশি বেদনাদায়ক। যেমনটা অনুমান করেছিলাম, এ আন্দোলনটিও দ্রুতই তাদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব, ভণ্ডামি এবং কপটতা প্রকাশ করে দেয়। সমস্যা নিয়ে অনেক আলোচনা হলেও যথোপযুক্ত সমাধান কেউই দিতে পারেনি।

অন্যান্য হ্যাশট্যাগভিত্তিক আন্দোলনগুলোর মতো #MeToo আন্দোলনও যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে পশ্চিমা-সমাজে কোনো কার্যকারী পরিবর্তন আনতে পারবে না। কেননা আন্দোলনকারীরা সমস্যার শেকড়ে যেতে নারাজ। যে সামাজিক বিষয়গুলোর কারণে এ সমস্যাগুলো হয় সেগুলো তারা স্বীকার করে নিতে প্রস্তুত না। কিছু মুসলিমও হুজুগের বশে এই প্রচারণায় অংশ নিয়েছে এবং আধুনিক হ্যাশট্যাগিং ব্যবহারের উৎসবে মেতে উঠেছে। কিন্তু এসব মুসলিমরা ইসলামে, কুরআনে এসব সমস্যার সমাধান ঘেঁটে দেখেনি। যার ফলে বর্তমান বিশ্বে যৌন হয়রানি সমস্যার বিকল্প সমাধান হিসেবে ইসলামকে তারা তুলে ধরতে পারেনি।

রাজকুমারী এবং মটরদানা

#MeToo প্রচারণার বেশ কিছু বড় এবং মৌলিক সমস্যার একটি হলো ইচ্ছাকৃত ভাবে বিভ্রান্তি তৈরি করা। অপরাধের মাত্রা বোঝা কষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এরা প্রায়ই ছোটখাটো কিছু নেতিবাচক অভিজ্ঞতার সাথে গুরুতর বিষয়কে গুলিয়ে সেটির অসাড় আস্ফালন করে। উদাহরণস্বরূপ, এক অভিনেত্রী কাজে প্রত্যাখ্যান হওয়া ইমেইল পেয়ে যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন বলে দাবি করে বসেন।[৭৪]

---

[৭৪] https://www.theguardian.com/film/2017/oct/20/tv-film-industries-toxic-starts-audition-room-harvey-weinstein?CMP=Share_iOSApp_Other

এ ধরনের সমস্যা #MeToo আন্দোলনে খুব নতুন কিছু নয়। লিঙ্গভিত্তিক সমস্যা উসকে দিয়ে নিজেদেরকে নারীদের চ্যাম্পিয়ন ভাবার প্রবণতা নারীবাদীদের প্রথম থেকেই। যেমন, #MeToo আন্দোলনে আসা অভিযোগগুলোকে নিয়ে মিডিয়া বেশ কিছু প্রতিবেদন প্রকাশ করে। যেখানে ফ্লার্টিং কিংবা কোনো লাঞ্চ ডেইটে কারও কোনো বিরক্তিকর আচরণকে ধর্ষণ, নিপীড়ন এবং শারীরিক নির্যাতনের মতো গুরুতর বিষয়ের সাথে এক পাল্লায় দেখানো হয়।[৭৫]

তুলনামূলকভাবে ছোটখাটো এই অভিযোগগুলো মূলত বাস্তব জীবনে যৌন নিপীড়নের গুরুতর অপরাধকে ম্লান করে দেয়। যারা এ ধরনের গুরুতর কোনো নিপীড়নের শিকার হয়ে থাকেন তারা মানসিকভাবে হতাশ হয়ে পড়েন। তা ছাড়াও ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য সমাধানের পথ আরও কঠিন হয়ে পড়ে। এসবের কারণে প্রায়ই আসল ভুক্তভোগীদের অনেক বেশি ভোগান্তির শিকার হতে হয়।

খেয়াল করলেই দেখতে পাবেন, ভারত বিশ্বের সর্ববৃহৎ ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কিন্তু সেখানে ক্রমাগত ধর্ষণের হার বেড়েই চলছে। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র মিশরে ধীরে ধীরে গণ ধর্ষণের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইউরোপ এবং আমেরিকায় প্রতি দুজন নারীর একজন জীবনে কোনো না কোনোভাবে যৌন হয়রানি কিংবা অযাচিত যৌন আচরণের শিকার হয়েছে।[৭৬] স্পষ্টতই বর্তমান বিশ্বে এ সমস্যা মারাত্মকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে এবং এগুলো সমাধানের জন্য এর পেছনের কারণগুলো সনাক্ত করা জরুরি।

#NotHim

অনেক নারী তাদের নির্যাতন এবং হয়রানির শিকার হওয়ার গল্প বলেছেন, অনেক পুরুষও নিজেদের নিপীড়িত হওয়ার গল্প বলেছেন। এমনকি অনেক নারী তাদের নির্যাতিত হওয়ার পেছনে নারীকেই অভিযুক্ত করেছেন। কিন্তু পুরুষদের নির্যাতিত হওয়ার বিষয়গুলো একই পরিমাণ সহানুভূতি অর্জন করতে পারেনি। এমনকি কিছু নারীবাদী[৭৭] প্রকাশ্যেই পুরুষদের নিপীড়িত হওয়ার বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করেছে। টুইটার হ্যাশট্যাগের প্রচারক অ্যালিসা মিলানো[৭৮] এই প্রত্যাখ্যানকে সমর্থন করেছেন। মনে হচ্ছিল যেন এর ফলে নারীদের হয়রানির ওপর থেকে জনগণের নজর সরে যাবে অথবা বাস্তবতার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। সবাই বুঝবে যে

[৭৫] https://www.buzzfeed.com/doree/what-to-do-with-shitty-media-men?utm_term=.xcWzx3MJp#.obaZL27Yy
[৭৬] European Commission, 1998; Pina et al., 2009; United States Merit Systems Protection Board [USMSPB], 1995
[৭৭] https://www.facebook.com/cmclymer/posts/993793284096897
[৭৮] https://twitter.com/Alyssa_Milano/status/919733667831754752

সমস্যাটা পুরুষের বা পুরুষতন্ত্রের না; বরং সমস্যাটি মানুষের। এমনকি এই আন্দোলনের "যথার্থ" প্রতিক্রিয়া হিসেবে আশা করা হয়েছিল যে পুরুষরা বলবে #IWillChange। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে প্রতিক্রিয়াস্বরূপ নারীদের কাছ থেকে কিছু আশা করা হয়নি, যদিও যৌন হয়রানি ও নিপীড়নের অপরাধে অভিযুক্ত নারী-পুরুষ উভয় লিঙ্গের অপরাধীই আছে।

ইউসুফ আ. কি #MeToo বলতে পারতেন?

মুসলিমদেরকে কুরআনের একটি ঘটনা স্মরণ করিয়ে দিই। ইউসুফ আ. এবং জুলাইখার গল্প।

ইউসুফ আ.-কে তাঁর পুরো জীবনে বেশ কিছু কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। প্রথমত, তাঁকে মিশরের এক উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা আল-আজিজের বাড়িতে দাস হিসেবে থাকতে হয়েছিল। আল-আজিজ ছিলেন জুলাইখার স্বামী। জুলাইখা তার সৌন্দর্যের জন্য বিখ্যাত ছিল। একইসাথে তার ছিল ক্ষমতা এবং সুখ্যাতি। আর ইউসুফ আ. তাঁর অনন্য অসাধারণ সৌন্দর্যের জন্য পরিচিত ছিলেন। আর এ সৌন্দর্যের কারণেই তাঁকে এক কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়।

ইউসুফ আ.-এর সৌন্দর্য জুলাইখাকে তীব্রভাবে আকৃষ্ট করে। নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে সে একদিন কৌশলে ইউসুফ আ.-কে একটি ঘরে আবদ্ধ করে মনিবের মতো বলে—'এসো! যেন ইউসুফ আ. তাঁর দাস। জুলাইখার সৌন্দর্যকে উপেক্ষা করে ইউসুফ আ. তার আবেদনকে প্রত্যাখ্যান করলেন। যেকোনো মূল্যে সেখান থেকে পালাতে চাইলেন। ইউসুফ আ. দৌড়ে দরজার কাছে গেলেন। জুলাইখা তাঁকে বাধা দিতে পেছন থেকে তাঁর জামা টেনে ধরে ছিঁড়ে ফেলে। এমতাবস্থায় দরজার কাছে তারা আজিজকে দেখতে পায়।' [কুরআন ১২ : ২৩-২৫]

তারা দুজনই নিজেকে নির্দোষ প্রমাণের চেষ্টা করছিলেন। জুলাইখা ইউসুফের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ করে। ইউসুফ আ. এ অভিযোগ অস্বীকার করেন। আজিজের কাছে তাদের মৌখিক দাবির কোনো ভিত্তি ছিল না। কাজেই দোষ প্রমাণের জন্য বস্তুগত প্রমাণের সাহায্য নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। বলা হলো যদি ইউসুফ আ. জামার সামনে থেকে ছেঁড়া থাকে তবে তিনি মিথ্যা বলছেন আর যদি জামার পেছন থেকে ছেঁড়া থাকে তবে জুলাইখা মিথ্যা বলছে। জামাটি পেছন দিক থেকে ছেঁড়া ছিল। ইউসুফ আ. নির্দোষ তা প্রমাণিত হলেন। পরবর্তী সময়ে জুলাইখাকে তার স্বামী আজিজ তিরস্কার করে এবং তাকে তার কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা করতে বলে।

কুরআনে বর্ণিত এ গল্পের প্রথম অংশটি প্রমাণ করে, সময়, স্থান এবং সংস্কৃতি

নির্বিশেষে যেকোনোভাবে যৌন নিপীড়নের ঘটনা ঘটতে পারে, এমনকি নারীরাও এমন ঘটনায় অপরাধী হতে পারে। জুলাইখা তার কৃতকর্মের পক্ষে কী যুক্তি দেখিয়েছে তা নিয়ে আলোচনার আগে দেখা যাক আধুনিক গবেষণা বিষয়টিকে কীভাবে ব্যাখ্যা করে।

কারণ বনাম ন্যায্যতা

সমস্যাকে ফলাওভাবে প্রচার না করে আন্তরিকতার সাথে সমস্যা সমাধানের উপায় খুঁজে বের করা উচিত। যেকোনো সমস্যা সমাধানের জন্য ব্যক্তিপর্যায়ে কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া দরকার সত্য। কিন্তু তার আগে সমস্যার মূল কারণ খুঁজে বের করা আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

প্রথমত, কোনো মানুষই প্রকাশ্যে কিংবা ব্যক্তিগতভাবে যৌন নিপীড়ন, হয়রানি বা নির্যাতনকে সঠিক বলে মনে করে না। কিন্তু অনেকেই এ সমস্যার সামাজিক প্রভাব এবং এর মোকাবিলায় যেসব পদক্ষেপ নেওয়া হয় সে বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করে। দারিদ্র্য এবং অপরাধে জর্জরিত একটি এলাকার মানুষ যেসব দুর্ভোগের শিকার হয় সেগুলোকে কেউই সঠিক বলে মনে করে না। অর্থাৎ পরিস্থিতির কারণে অপরাধীরা কখনো তাদের কাজের ন্যায্যতা পেয়ে যায় না। তবুও, সেসব অপরাধগুলো সংগঠিত হওয়ার পেছনের কারণ হিসেবে আমরা সে শহরের ক্ষয়িষ্ণু পরিস্থিতির দিকে ইঙ্গিত করি, অর্থাৎ দারিদ্র্যতা এবং অপরাধের কথা ওঠে আসে।

একাডেমিকরা যদি বলেন যে নিজ দেশের রাষ্ট্র পরিচালনায় অন্য দেশের হস্তক্ষেপে ক্ষুব্ধ হয়েই সন্ত্রাসীরা নৃশংসতা চালায়—তার মানে এই নয় যে তারা সেই নৃশংসতাকে সমর্থন দিচ্ছেন বা নিরীহ জনগণের দুর্দশাকে সঠিক মনে করছেন (অবশ্য একাডেমিকরা যদি মুসলিম হয় আর আপনি একজন ট্যাবলয়েড সাংবাদিক হন তবে আপনার এমন মনে হতেই পারে), বরং তারা সেই নৃশংসতার পেছনে কারণ বর্ণনা করছেন।

যদি একজন লিভার সিরোসিসের রোগীকে ডাক্তার বলেন যে মদ খাওয়ার কারণে আপনার এমনটা হয়েছে, তার মানে কিন্তু এই না যে তিনি রোগীকে বলছেন, 'আপনার ক্যানসার হওয়াই উচিত ছিল যেহেতু আপনি নিয়মিত মদ খান!' বরং ডাক্তার কেবল সমস্যার কারণটা দেখিয়ে দিচ্ছেন। তিনি কখনো রোগীর জন্য এমনটা কামনা করেন না বা রোগীর অসুস্থতা তাকে কোনো প্রকার আনন্দ দেয় না।

বহুদিন ধরে সেক্যুলার লিবারেলিজমের মাথারা যৌন হয়রানিকে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের তৈরি নিপীড়ন হিসেবে প্রমাণের জোরালো প্রচেষ্টা করে আসছে। কিন্তু

গবেষণা বলে ভিন্ন কথা। অসংখ্য গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে এটি একটি মানসিক সমস্যা।

যৌন হয়রানি সমাজের যৌনায়নের সাথে যুক্ত

গবেষণায় পরিলক্ষিত হয়েছে যে নারীর উগ্র শারীরিক উপস্থাপনা এবং ফ্যাশনের ব্যাপকতা যৌন হয়রানির সাথে সরাসরি যুক্ত।

ডা. লিন্ডা পাপাডোপলোস (Dr. Linda Papadopoulos) বলেন—'যৌনতা এবং সহিংসতার মধ্যকার সম্পর্ক নেই—এ দাবিটা বেশ হাস্যকর। এর সুস্পষ্ট প্রমাণ আছে। ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি, মিউজিক ভিডিও, মডেলিং সব জায়গাতেই নারীদের অর্ধনগ্ন কিংবা পুরো নগ্নভাবে উপস্থাপন করা হয়। প্রচণ্ড মাত্রার নগ্ন ছবির ব্যবহার, নারীদের যৌন সামগ্রী হিসেবে দেখার প্রবণতা, আক্রমণাত্মক আচরণকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ, এসব নারীর প্রতি সহিংসতা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। এমন অতি যৌনায়ন মানুষের মানবিক মূল্যবোধকে বিপন্ন করে তাকে অমানুষে পরিণত করে।'[৭৯]

রেচ্যাল ক্যালোগেরো (Rachel Calogero) বলেন, 'পশ্চিমা-সমাজে সাংস্কৃতিক চর্চার নামে নারীকে যৌন সামগ্রী হিসেবে উপস্থাপন করা আজকাল খুব সাধারণ। সেই সাথে জনসম্মুখে মিডিয়া এবং বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে নারীর অনাবৃত শরীরকে শৈল্পিক উপায়ে প্রদর্শন করা হয়। বিশালসংখ্যক গবেষণায় দেখানো হয়েছে যে দৈনন্দিন জীবনের প্রায় সব ক্ষেত্রে যৌন সামগ্রী হিসেবে পুরুষদের তুলনায় নারীদেরকে বেশি ব্যবহার করা হয়।'[৮০]

যৌন হয়রানি এবং সামাজিক যৌনায়নের মধ্যে সংযোগ স্থাপনকারী প্রক্রিয়াটা কী?

যৌনতাপূর্ণ সমাজ কীভাবে ব্যক্তির পছন্দের ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে

জনসম্মুখে খোলামেলা পোশাক পরে যৌনতা প্রকাশ করা, একে যৌনতার মিলনমেলায় পরিণত করা, সামাজিকভাবে এর বেশ কিছু প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, ২০১১ সালের এক গবেষণায় দেখা গেছে যে, নারীদের কোনো কাজ দেওয়ার আগে যদি সুদর্শন পুরুষের সংস্পর্শে আসে তখন তারা কাজে যাওয়ার সময় উত্তেজক পোশাক বেছে নেয়। এ ছাড়াও 'সেক্সি' পোশাক পছন্দ করার ক্ষেত্রে ওভ্যুলেশন (Ovulation) পিরিয়ডের প্রভাব আছে। অন্য কোনো

---

[৭৯] Sexualisation of Young People, a Review [2015]

[৮০] Calogero, Rachel M. (2012) Objectification theory, self-objectification, and body image. In: Cash, Thomas, ed. Encyclopedia of Body Image and Human Appearance

আকর্ষণীয় নারীকে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে ধরে নিলে এ প্রবণতা আরও বেড়ে যায়। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো ওভ্যুলেশন বাদে এমন প্রতিযোগী মনোভাব পরিলক্ষিত হয়নি।[৮১]

নারীদের পোশাকের ওপর যে সামাজিক চাপের একটা প্রভাব রয়েছে তা নতুন কোনো বিষয় না। ১৯৮১ সালের একটি গবেষণায় উল্লেখ করা হয়েছে,[৮২] ৮০% নারী বিশ্বাস করে যে কর্মক্ষেত্রে কিছু বা অধিকাংশ নারী 'নিজেকে আবেদনময়ী করে তোলার জন্য পোশাক পরে' এবং ৫৭% নারী বিশ্বাস করে যে কর্মক্ষেত্রে 'কিছু বা অধিকাংশ নারী নিজেদের অত্যন্ত আবেদনময়ী হিসেবে উপস্থাপন করে'।

গবেষণায় দেখা গেছে, যৌনতাপূর্ণ সমাজে ব্যাপক প্রচলিত একটি ধারণা হলো সুন্দর ক্যারিয়ার গড়তে হলে, নিজের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করতে হলে খোলামেলা পোশাক পরে নিজেকে উপস্থাপনের মাধ্যমে অন্যকে প্রভাবিত করতে হবে। ২০০৯ সালের এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, যেসব নারীরা নিজেদের বেশি আকর্ষণীয় হিসেবে উপস্থাপন করে তাদেরকে অনাকর্ষণীয় নারীদের তুলনায় বেশি পারফরমেন্স রেটিং দেওয়া হয়।[৮৩] ২০০৯[৮৪] সালে আতিথেয়তা শিল্পের একটি জার্নালে প্রকাশিত একটি গবেষণায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, সেখানকার যেসব ওয়েট্রেস মেকআপ ব্যবহার করে তাদেরকে (নারী অতিথিদের তুলনায়) পুরুষ অতিথিরা বেশি বখশিশ দেয়।

২০১০ সালে ইন্টারন্যাশনাল উইমেন্স স্টাডিজ জার্নালে প্রকাশিত এক গবেষণায় ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট ডা. অ্যাভিগেইল মুর (Dr. Avigail Moor) বলেন, 'প্রায় সব ধরনের প্রশ্নের জবাবে নারীরা দাবি করেন, এমন পোশাক পরার কারণ

---

[৮১] স্বাভাবিক ঋতুচক্রের প্রায় মাঝামাঝি সময় ডিম্বাশয় থেকে কেবলমাত্র একটি ডিম্বাণুর মুক্ত হওয়াকে ডিম্বপাত বলে। এই সময়সীমাই গর্ভধারণের একমাত্র উপযুক্ত সময়। এসময় নারীদেহে বিভিন্ন শারীরিক পরিবর্তনের পাশাপাশি উল্লেখযোগ্য মানসিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। যেমন পুরুষের সামনে নিজেকে আরও আকর্ষণীয় ভাবে তুলে ধরা, কোমল কণ্ঠে কথা বলা, আবেগী আচরণ করা ইত্যাদি।– অনুবাদক।

Ovulation, Female Competition, and Product Choice: Hormonal Influences on Consumer Behavior, Durante, Griskevicius, Hill, Perilloux, Li, 2010 [Published by the Journal of Consumer Research, Vol 37, No 6, 1st April 2011]

[৮২] Experiences of sexual harassment: Results from a representative survey, Barbara A Gutek, 1981

[৮৩] Examining the Interaction Among Likelihood to Sexually Harass, Rated Attractiveness, and Job Performance, Lee, Melbourne, Hoke and Begs, 2009 (Publishing in the Journal of Management)

[৮৪] Waitresses' facial cosmetics and tipping: A field experiment, Jacob, Gueguen, Boulbry, Ardiccioni, 2009 [Published by International Journal of Hospitality Management, 2009]

কেবল নিজেকে আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করাই না; বরং সামাজিক এবং ব্যক্তিগত আলাদা সুবিধা ভোগ করতে পারাও আছে। ...এমন পোশাকে অধিকাংশ নারীই আলাদাভাবে পুরুষের নজরে থাকে, ফলে নিজেদেরকে তাদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়। এমন সম্পর্কের ক্ষেত্রে সামাজিক প্রভাব খুব প্রকট। সমাজে প্রতিনিয়ত এই দুটি বিষয়কে একই সূত্রে গাঁথা হয়। ...নারীরা মনে করে এমন পোশাক পরার উদ্দেশ্য যৌন সম্পর্ক স্থাপন করা নয় বরং অন্যকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করা। তারা স্বীকারও করেছেন যে এ ধরনের খোলামেলা পোশাক এবং আবেদনময়ী বাচনভঙ্গিতে পুরুষেরা উত্তেজিত হতে পারে, কিন্তু তাদের মতে এটি তাদের লক্ষ্য না। এমন পোশাক এবং বাচনভঙ্গির মাধ্যমে সাধারণত তারা পুরুষদের নয় বরং নির্দিষ্ট একজন পুরুষকে আকৃষ্ট করে।'[৮৫]

আকর্ষণীয় বাচনভঙ্গি এবং যৌন আবেদনের মধ্যে পরিলক্ষিত পারস্পরিক সম্পর্ক

বিভিন্ন গবেষণায় বিপরীত লিঙ্গের সদস্যের আকর্ষণীয় পোশাক ও বাচনভঙ্গির কীভাবে যৌন আবেদন বৃদ্ধি করে তার একটি সম্পর্ক দেখানো হয়েছে।

২০০৮ সালের একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, 'একজন নারী পুরুষের সাথে প্রথম সাক্ষাতের আগে সাজসজ্জা করতে যতটা উৎসুক থাকে একজন নারীর সাথে সাক্ষাতের ক্ষেত্রে তেমনটা থাকে না। সমীক্ষায় ব্যক্তিগত বা সামাজিক সম্পর্ক বৃদ্ধিতে সাজসজ্জার ইতিবাচক প্রভাব প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু তা একইসাথে পুরুষদের নারীর প্রতি সহজাত যে প্রকট যৌন আকর্ষণ আছে সেটাও বৃদ্ধি করে।'[৮৬]

২০১২[৮৭] সালের অন্য একটি গবেষণায় উল্লেখ করা হয় যে নারীদের মধ্যে যারা লিপস্টিক ব্যবহার করে তাদেরকে পুরুষরা (যেসব নারী লিপস্টিক ব্যবহার করে না তাদের তুলনায়) আগে প্রেমের প্রস্তাব দেয়।

২০১০[৮৮] সালের একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে পুরুষেরা সাধারণত অন্য পোশাক পরিহিতা নারীদের তুলনায় লাল পোশাক পরিহিতা নারীদের পাশে বেশি

---

[৮৫] She Dresses to Attract, He Perceives Seduction: A Gender Gap in Attribution of Intent to Women's Revealing Style of Dress and its Relation to Blaming the Victims of Sexual Violence, Avigail Moor, 2010 [Published in Journal of International Women's Studies, Vol 11, No 4, May 2010]

[৮৬] The Effects of Women's Cosmetics on Men's Approach: An Evaluation in a Bar, Nicolas Gueguen, University de Bretagne-Sud (2008) [Published in the North American Journal of Psychology, 2008, Vol 10. No 1]

[৮৭] Does Red Lipstick Really Attract Men? An Evaluation in a Bar, Nicolas Guéguen (2012), International Journal of Psychological Studies, vol 2, No 2, June 2012

[৮৮] Red and romantic behavior in men viewing women, Kayser, Elliot, Feltman (2010), [Published by European Journal of Social Psychology, 2010]

বসে। গবেষণায় আরও দেখা গেছে যে, পুরুষরা সাধারণত অন্যদের তুলনায় লাল পোশাক পরিহিতা নারীদের অনেক বেশি অন্তরঙ্গ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে।

২০১৪ সালের একটি সামাজিক প্রতিবেদনে দেখা যায় একজন নারী পশ্চিমা পোশাকে নিউইয়র্কের রাস্তায় পাঁচ ঘণ্টা হাঁটেন এবং অন্যজন ইসলামিক পোশাক হিজাব এবং জিলবাবে। দুজন নারী তাদের পোশাকের ওপর নির্ভর করে ভিন্ন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছিলেন।[৮৯]

যৌনতাপূর্ণ সমাজে মানুষকে পরস্পরের উদ্দেশ্য অনুমান করতে ছেড়ে দেওয়ার সমস্যা

২০১৪ সালের আরেকটি গবেষণায় দেখা গেছে যে, বিপরীত লিঙ্গের সদস্যদের সচেতন (এবং অচেতন) যৌনাকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে নারী-পুরুষের ধারণায় প্রচুর বিভ্রান্তি রয়েছে। (বিপরীত লিঙ্গের) অপরজন কী ভাবছে সে সম্পর্কে নারী এবং পুরুষ উভয়ের ধারণা ভুলই বলা চলে। গবেষণায় বলা হয়েছে, 'পুরুষ এবং (আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো) নারীরা বিশ্বাস করেন যে, নারীরা যতটুকু যৌনাকাঙ্ক্ষা প্রদর্শন করে তাদের যৌন সম্পর্কে যাওয়ার ইচ্ছা থাকে তার চেয়েও বেশি... পুরুষেরা নারীদের যৌনাকাঙ্ক্ষাকে বেশি গুরুত্ব দেয় বলে মনে হয়, কারণ নারীরা নিজেদের যৌনাকাঙ্ক্ষাকে অবমূল্যায়ন করেন'। গবেষণাটি এই উপসংহারে এসেছে যে, মানুষকে একে অপরের যৌনাকাঙ্ক্ষা অনুমান করতে ছেড়ে দেওয়া একটি 'নিকৃষ্ট সমাধান'।[৯০]

যেহেতু যৌন হয়রানিকে 'অযাচিত যৌন প্রস্তাব' হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয় তাই বেশ কয়েকটি গবেষণায় দেখা গেছে যে, যৌন প্রস্তাব 'আকাঙ্ক্ষিত' হবে নাকি 'অযাচিত' হবে তা কীভাবে প্রস্তাব করা হচ্ছে তার ওপর না বরং যে ব্যক্তি প্রস্তাব করছে সে কতটুকু আকর্ষণীয় তার ওপর নির্ভর করে।

২০০৮ সালের একটি গবেষণায় বলা হয়, 'আকর্ষণীয় কেউ যৌন হয়রানি করলে ভিক্টিম নারী সে হয়রানি বেশি সহ্য করে, অনেক ক্ষেত্রে উপভোগ করে। কিন্তু কম আকর্ষণীয় কেউ করলে নারীরা তা সহ্য করে না। একইভাবে, উচ্চ পদমর্যাদার কারও দ্বারা যৌন হয়রানির ক্ষেত্রে ভিক্টিম যতটা সহ্য ক্ষমতা দেখায় নিম্ন পদমর্যাদার কারও দ্বারা যৌন হয়রানির ঘটনা ঘটলে তারা ঠিক ততটা সহ্য ক্ষমতা দেখায় না। তা ছাড়া পুরুষরা যে ভিক্টিম নারী তাদের সাথে ডেইটে যাবে তাকে

---

[৮৯] https://www.youtube.com/watch?v=mgw6y3cH7tA

[৯০] Do Men Overperceive Women's Sexual Interest?, Carin Perilloux and Robert Kurzban, 2014 (published in Psychological Science, 20th November 2014)

বিচার করে সে নারী ওই ব্যক্তি দ্বারা কতটা যৌন হয়রানি সহ্য করেছে তার ওপর। উচ্চ পদমর্যাদার ব্যক্তিদের যৌন হয়রানিমূলক আচরণকে যে কেবল সহ্য করা হয় তাই-ই না; বরং তাদের এমন জঘন্য আচরণকে নারীরা যথেষ্ট ইতিবাচকভাবে দেখে। অর্থাৎ এ থেকে বুঝা যে, বিষয়টি যতটা না নৈতিকতার সাথে সম্পৃক্ত তার চেয়ে বেশি প্রবৃত্তির সাথে সম্পৃক্ত।'[৯১]

২০০১ সালে আরেকটি গবেষণায় দেখা গেছে যে, 'একজন সুদর্শন আকর্ষণীয় পুরুষের আচরণকে কম হয়রানিমূলক আচরণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তেমনই কোনো আকর্ষণীয় নারীর হয়রানির শিকার হওয়ার সম্ভাবনা বেশি, বিশেষ করে যখন সম্ভাব্য উত্ত্যক্তকারী দেখতে তেমন একটা আকর্ষণীয় না।'[৯২]

২০০৯ সালের আরেকটি গবেষণার উপসংহারে বলা হয় যে, 'অন্যান্য সাধারণ পুরুষের তুলনায় শারীরিকভাবে আকর্ষণীয় পুরুষের আচরণকে তুলনামূলক কম হয়রানিমূলক হিসেবে বিবেচনা করা হয়।' গবেষণাটি এই উপসংহারে পৌঁছায় যে এমন অবস্থা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। যেহেতু কাউকে (যৌন সম্পর্কের) প্রস্তাব দেওয়ার আগে সে ব্যক্তির কাছে পরিষ্কার না যে সংশ্লিষ্ট নারী তার প্রস্তাব 'আকাঙ্ক্ষিত' হিসেবে বিবেচনা করবে নাকি 'অযাচিত' হিসেবে। যৌন হয়রানির জন্য যে বিধিনিষেধ তা কীভাবে বাস্তবায়ন করা উচিত সে বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়নি। তা ছাড়া কোনো আচরণকে আপত্তিকর হিসেবে সংজ্ঞায়িত করার ক্ষেত্রে EEOC-র নির্দেশিকা কেবল একটি ধারণার ওপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে—যৌন হয়রানিমূলক আচরণ হলো অযাচিত আচরণ। কারও 'যৌন' আচরণ হয়তো কারও কাছে সহনীয় এবং গ্রহণযোগ্য। আবার সে একই আচরণ অন্য কারও কাছ থেকে পেলে সেটা অপমানজনক মনে হতে পারে। যৌন হয়রানির বিষয়টি অত্যন্ত ব্যক্তিকেন্দ্রিক (subjective)। এমন অনেক আচরণই অনেকের কাছে আপত্তিকর লাগতে পারে যা যৌন হয়রানির বেঁধে দেওয়া সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত নয়, আবার বিপরীতটাও সত্য।[৯৩]

এসব গবেষণার ফলাফল ত্রিশ বছর পূর্বের গবেষণার ফলাফলের সাথে মিলে যায়। যেমন, ১৯৮২ সালের একটি গবেষণায় বলা হয়েছিল যে যৌন হয়রানির

---

[৯১] Tolerance of Sexual Harassment: A Laboratory Paradigm, Angelone, Mitchell, Carola (2009) [published in Archives of Sexual Behaviour 22nd November 2008]

[৯২] Sexual Harassment in the Workplace: Exploring the Effects of Attractiveness on Perception of Harassment, John H. Golden, Craig A. Johnson Rebecca A. Lopez (Published in Sex Roles: A Journal of Research, 2001)

[৯৩] Sexual Harassment Perception as Influenced by a Harasser's Physical Attractiveness and Job Level, Mark E Savery, 1997 (Published in Modern Psychological Studies, Spring 1997)

অভিযোগ করার ক্ষেত্রে অপরাধীর যোগ্যতা ও পদমর্যাদার মতো বিষগুলোর প্রভাব আছে।[১৪]

ডা. মুরের মতে, সার্বজনীনভাবে পোশাকের যৌনায়ন এবং পাবলিক স্পেসকে উন্মুক্ত প্রেমের আখড়ায় পরিণত করার কারণে, এগুলোকেই জনজীবনের অংশ বানিয়ে নেওয়ার কারণে যৌন হয়রানির সম্ভাব্য কারণ আলাদা করা যাচ্ছে না।[১৫] তার গবেষণায় তিনি উল্লেখ করেন—

'অনুমান করা হয়েছিল যে বিষয়টি নিয়ে নারী এবং পুরুষের বর্ণনায় ভিন্নতা থাকবে। যেমন, পুরুষেরা মনে করবে যে খোলামেলা ও আবেদনময়ী পোশাক পরিহিতা নারীরা আসলে তাদের যৌন আকাঙ্ক্ষা প্রকাশের জন্য এমনটা করে। আর নারীরা এমন ধারণার বিরোধিতা করবে এবং নিজেকে আকর্ষণীয় হিসেবে উপস্থাপন করার ইচ্ছাকে এমন পোশাক পরিধানের পেছনে প্রধান কারণ হিসেবে উল্লেখ করবে। গবেষণার ফলাফল অনুমানটিকে সত্য প্রমাণ করে। প্রায় সব ধরনের প্রশ্নের জবাবে এমন পোশাক পরার পেছনে নারীরা আকর্ষণীয় হয়ে ওঠার পাশাপাশি সামাজিক এবং ব্যক্তিগত সুবিধা ভোগ করতে পারার বিষয়টিকে প্রাথমিক কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।... অধিকাংশ নারীর উত্তরেই এমন আবেদনময়ী পোশাক পরার সাথে নিজেকে মূল্যবান্ অনুভব করার আকাঙ্ক্ষার মধ্যকার সম্পর্কটা স্পষ্ট। এমন সম্পর্কের ক্ষেত্রে সামাজিক প্রভাব খুব প্রকট। সমাজে প্রতিনিয়ত এই দুটি বিষয়কে একই সূত্রে গাঁথা হয়। অপরদিকে অধিকাংশ নারীর এমন আবেদনময়ী রূপ ধারণের পেছনে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্য থাকে না। অনুরূপভাবে, নারীরা খোলামেলা পোশাক পরার মাধ্যমে যৌন সহিংসতার শিকার 'হতে চাচ্ছে' এমন বদ্ধমূল অভিযোগও আর ধোপে টেকে না যেহেতু নারীরা বলছে তাদের পোশাক পরার পেছনে এমন কোনো উদ্দেশ্য নেই। এটি পূর্ববর্তী গবেষণাগুলোর সাথেও সামঞ্জস্যপূর্ণ (যেমন Johnson, Hegland, & Schofield, ১৯৯৯) যাতে ধর্ষণের ভুক্তভোগী নারীরা এমন ধারণা অস্বীকার করেছে। তারা কখনো তাদের

---

[১৪] Sexual Harassment in the Workplace as a Function of Initiator's Status: The Case of Airline Personnel, Littler-Bishop, Siedler-Feller, Opaluch, 1982 [Journal of Social Issues, Vlu 38, No 4, 1982]

[১৫] She Dresses to Attract, He Perceives Seduction: A Gender Gap in Attribution of Intent to Women's Revealing Style of Dress and its Relation to Blaming the Victims of Sexual Violence, Avigail Moor, 2010 [Published in Journal of International Women's Studies, Vol 11, No 4, May 2010]

পোশাকের মাধ্যমে যৌন সহিংসতাকে উসকানি দেওয়ার ইচ্ছা থেকে এ কাজ করে না।'

বেশ কয়েকটি গবেষণার ফলাফল থেকে তিনি এ মন্তব্য করেছেন যে, যদিও নারী পুরুষ উভয়েই এ বিষয়ে একমত যে নারীদের পোশাকগুলো তাদেরকে মারাত্মক 'যৌন আবেদনময়ী' এবং 'আকর্ষণীয়' হিসেবে উপস্থাপন করে (এবং নারীরা এও স্বীকার করেছে যে কখনো কখনো পুরুষেরা তাদের এমন পোশাকের দ্বারা উত্তেজিত হয়) কিন্তু ব্যক্তিবিশেষে এমন পোশাক পরিধানের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সম্পর্কে তারা ভিন্ন মত পোষণ করে। যৌন উত্তেজক পোশাক, যৌন উত্তেজনাকে সম্মান ও গুরুত্বের সাথে গুলিয়ে ফেলা হচ্ছে। তিনি বলেন—

> 'নারীদের খোলামেলা সংক্ষিপ্ত পোশাক পরার 'উদ্দেশ্য' উপসংহারগুলোকে সত্য প্রমাণ করে। নিজেকে আবেদনময়ী এবং আকর্ষণীয় করাকেই নারী-পুরুষ উভয়ই নারীর এমন পোশাক পরিধানের প্রধান কারণ হিসেবে দেখে। কিন্তু তা যৌন সম্পর্ক স্থাপনে নারীর আগ্রহকে প্রকাশ করে কিনা তা নিয়ে ঐকমত্য নেই। অনেক পুরুষই এ ধরনের পোশাক পরা নারীকে যৌন সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী মনে করে। কিন্তু নারীদের কাছে বিষয়টি এমন নয়। তারা মনে করে তাদের এমন পোশাক পরার পেছনে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের কোনো উদ্দেশ্য নেই। বরং তারা এমন পোশাক পরিধান করে কেবল দৃষ্টি আকর্ষণ করার আকাঙ্ক্ষা থেকে। এমনকি তারা স্বীকার করে যে পুরুষরা কখনো কখনো তাদের আবেদনময়ী বাচনভঙ্গিতে যৌনকাতর হয়ে উঠতে পারে, কিন্তু একে নারীর এমন পোশাক পরিধানের মূল লক্ষ্য হিসেবে দেখার সুযোগ নেই। বাস্তবে তাদের উদ্দেশ্য থাকে নির্দিষ্ট পুরুষদেরকে আকৃষ্ট করা, সাধারণভাবে সকল পুরুষকে নয়।'

ডা. মুর উল্লেখ করেন যে এসব গবেষণা এবং পূর্ববর্তী গবেষণার ফলাফল একটি বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করে—নারীদের খোলামেলা আঁটসাঁট পোশাক পুরুষের যৌন উত্তেজনা বৃদ্ধি করে আর এ কারণেই অনেক পুরুষ নারীদের যৌনাকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে ভুল ধারণা পোষণ করে বসে।

তিনি বলেন—

> 'নারীর অনাবৃত দেহ কিংবা তাদের বাচনভঙ্গি পুরুষদের তীব্রভাবে আকৃষ্ট করে, তাদের যৌনকাতর করে তোলে। আর এ উত্তেজনা পুরুষের মনে নারীর উদ্দেশ্য সম্পর্কে ভুল ধারণার জন্ম দেওয়ার কারণ এটাই। পুরুষরা

নিজের যৌন উত্তেজনার কারণ হিসেবে তাদের কামনার বস্তু হিসেবে বিবেচনা করতে পারে। অর্থাৎ, কোনো নারীকে দেখে একজন পুরুষ ধারণা করতে পারে যে, যেহেতু সে ওই নারীকে দেখে উত্তেজিত হয়েছে তার মানে ওই নারীর উদ্দেশ্য এমনটাই ছিল। কেননা যৌন আবেদনময়ী পোশাক পরলে যৌন উত্তেজনা জাগবেই। যেসব পুরুষ নারীর এমন খোলামেলা দেহাবয়ব দ্বারা উত্তেজিত হয় এবং যেসব পুরুষ নারীর এমন পোশাকে প্রলোভন অনুভব করে তাদের সংখ্যা প্রায় সমান (গবেষণায় অংশগ্রহণকারী পুরুষদের মধ্যে)। এ থেকে একটি বিষয় সামনে আসে যে, উত্তেজিত হওয়াই পরবর্তী সময়ে প্রলুব্ধ হওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই দাবিটি বুঝা সহজ। এর বিপরীতে কোনো প্রমাণ নেই।'

গবেষণাগুলোর উপসংহারে বলা হয়, আজকাল পাবলিক প্লেসে উভয় লিঙ্গের মানুষই তাদের পছন্দের সম্ভাব্য সঙ্গীর কাছে যৌন আবেদন করে, আগ্রহ প্রকাশ করে কিংবা আবেদন পাওয়া আকাঙ্ক্ষা করে। এমন পরিস্থিতিতে এটা স্পষ্ট যে, এসব বিষয়ে কোনো সীমায় থাকবে না, অনেকেই বিপরীত লিঙ্গের ব্যক্তিদের কাছ থেকে নানা ধরনের আপত্তিকর প্রস্তাব পাবে।

গবেষণায় দেখা গেছে যে ক্যারিয়ারের সফলতা, সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা অথবা সম্ভাব্য সঙ্গীকে আকর্ষণ করার মতো বিষয়গুলো যখন আবেদনময়ী বাচনভঙ্গি কিংবা যৌনতার সাথে যুক্ত হয় স্বাভাবিকভাবেই তখন যৌনাকাঙ্ক্ষা নিয়ে মানুষের মাঝে ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়। পাশাপাশি মূলধারার মিডিয়া এবং বিজ্ঞাপন, ইন্টারনেট কিংবা ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রিতে নারীদেরকে যেভাবে যৌন সামগ্রীরূপে উপস্থাপন করা হচ্ছে তাতে অনেক সমাজবিজ্ঞানীই মনে করছেন ভবিষ্যতে এসব আরও মারাত্মক যৌন হয়রানির দরজা উন্মোচিত করবে।

'আমাকে কেন দোষ দিচ্ছ? তাঁর দিকে একবার তাকিয়ে দেখো!'

জুলাইখার গল্পে ফিরে আসি। ইউসুফ আ.-এর সাথে করা কাজটিকে ন্যায্যতা দিতে সে ছিল অনড়। এতটা লাঞ্ছিত হওয়ার পরেও সে ইউসুফ আ.-কে জনসম্মুখে এনেছিল নিজের কাজের পক্ষে যুক্তি দেখাতে। জুলাইখা কিছু মহিলাকে নিজের বাড়িতে আমন্ত্রণ করে ইউসুফ আ.-কে তাদের সামনে আসার নির্দেশ দিলো। উপস্থিত মহিলারা ইউসুফ আ.-কে দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যায়। তারা ইউসুফ আ.-কে চোখ দিয়ে গিলে খাচ্ছিল। তারা মুগ্ধ হয়ে বলল, 'মহিমা আল্লাহর! এ তো মানুষ নয়। এ তো এক সম্মানিত ফেরেশতা!' [কুরআন ১২: ৩১]।

জুলাইখা এ ঘটনার সদ্ব্যবহার করল। সে তখন মহিলাদের বলল যে, ইউসুফ আ.

এতটাই সুদর্শন যে কোনো নারীর পক্ষেই নিজেকে সংযত করা সম্ভব হতো না। অন্য মহিলাদের সামনে জুলাইখা নিজের নিকৃষ্ট কাজের পক্ষে যুক্তি দেখাবার পর বিজয়ীর মতো বলল, 'এ-ই সে, যার ব্যাপারে তোমরা আমাকে ভর্ৎসনা করেছিলে। আমি অবশ্যই তাকে প্ররোচিত করার চেষ্টা করেছি, কিন্তু সে নিজেকে পবিত্র রেখেছে।' [কুরআন ১২:৩২] জুলাইখা সবাইকে বোঝাতে চাচ্ছিল যে, তোমরা আমাকে কেন দোষ দিচ্ছ? আগে নিজেরা তাঁর দিকে একবার তাকিয়ে দেখো!

ইউসুফ আ. কেবল জুলাইখার সৌন্দর্যকেই উপেক্ষা করেননি; বরং সেখানে উপস্থিত সকল নারীর আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করে তিনি আল্লাহর কাছে সাহায্য চেয়েছিলেন, 'হে আমার রব, এই নারীরা আমাকে যে কাজের প্রতি আহ্বান করছে তা থেকে কারাগারই আমার নিকট অধিক প্রিয়। আর যদি আপনি আমার থেকে তাদের ছলনা প্রতিহত না করেন তবে আমি তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ব এবং আমি মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত হব।' [কুরআন ১২:৩৩]

পরবর্তী সময়ে জুলাইখা নিজের দোষ স্বীকার করেছিল। সে বলেছিল, 'আমি নিজেকে নির্দোষ মনে করি না, মানুষের নফস অবশ্যই তাকে মন্দ কাজের উৎসাহ দেয়। কিন্তু তাকে নয় যার প্রতি আমার প্রতিপালক দয়া করেন। নিশ্চয় আমার প্রতিপালক অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'। এখানে সে নিজের কাজকে ন্যায্য প্রমাণ করতে চায়নি বরং সে মানুষ হিসেবে আমাদের যে সহজাত মানবীয় প্রবৃত্তি তার দিকে ইঙ্গিত করেছে। ইউসুফ আ. আল্লাহর প্রেরিত একজন নবী হয়েও যদি সেসব নারীদের আহ্বান দ্বারা প্ররোচিত হবার আশঙ্কায় আল্লাহ তাআলার কাছে এভাবে প্রার্থনা করেন, তবে আমাদের মতো সাধারণ মানুষের জন্য বিষয়টা কেমন হওয়া উচিত?

কিছু 'সাধু' আছে যারা জুলাইখার এ উগ্র ভালোবাসার প্রশংসা করে। তারা এমন ভালোবাসাকে ঐশী প্রেমের প্রতীক মনে করে।[৯৬] ধরুন আজকে একজন সাধারণ মুসলিম পুরুষ নবী ইউসুফ আ.-এর মতো চারপাশের নারীদের যৌন আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করল এবং এমন ঘটনায় চরম ক্ষোভ প্রকাশ করল। এমন ঘটনায় আজকের নারীবাদীদের কাছ থেকে কোনোপ্রকার বিবেচনা পাওয়ার আশা করা যায় কি? বরং তাদের দৃষ্টিতে যেকোনো মূল্যেই সে লোক দোষী সাব্যস্ত করবে। কেননা সে একজন পুরুষ।

ইউসুফ আ. সুদর্শন ছিলেন এবং এ সৌন্দর্যের কারণে জুলাইখা প্রবলভাবে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। পশ্চিমা লিঙ্গভিত্তিক রাজনীতি গ্রহণ করা মুসলিমরা কি

---

[৯৬] See e.g. My Soul is a Woman, by Anne Marie Schimmel

এখন এটা বলবে যে কুরআনে ভুক্তভোগী ইউসুফ আ.-কেই 'ভিক্টিম-ব্লেমিং' করা হয়েছে? আশা করি তারা এমনটা বলবে না। কারণ এটা স্পষ্ট যে কুরআন আমাদেরকে কেবল মানুষের দুর্বলতার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। এবং এ দুর্বলতা যে কেবল পুরুষের মধ্যে আছে এমন নয়, নারীর মধ্যেও সমানভাবে উপস্থিত। কীভাবে সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্টতা মানুষের সৎ এবং মানবীয় গুণাবলির পদস্খলন ঘটাতে পারে তা স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে কুরআনে।

অনেকে আবার মনে করে যে ক্ষমতার কারণে চাইলেই যৌন নির্যাতন করা যায় এটি তার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। এমনকি তারা এও স্বীকার করে নেয় যে, একজন পুরুষই যে সবসময় যৌন নিপীড়ক হবে এমনটা ভাবা ঠিক না। কিন্তু পুরো ঘটনার পর্যালোচনা এবং জুলাইখার নিজস্ব সাক্ষ্য থেকে প্রমাণিত হয় যে এখানে ক্ষমতা থাকাটা প্রধান কারণ ছিল না; বরং তা কেবল একটি সুযোগ ছিল। মূল কারণ ছিল যৌন প্রলোভনের প্রতি মানুষের সহজাত দুর্বলতা।

মানুষের মধ্যকার যে সহজাত যৌন কামনা তা সকল যুগে সবসময়ই বিদ্যমান ছিল, আছে। তবে আধুনিক যুগে সেক্যুলার লিবারেলিজম এ সত্যকে উপেক্ষা করে এবং মানুষের মানবীয় গুণাবলির পরিবর্তে তাদের দুর্বলতাগুলোকে প্রকাশ্যে নিয়ে আসে।

সেক্যুলার লিবারেলিজমের 'উন্মুক্ত প্রণয় অসংগতি' (Public Courtship Paradox)

সেক্যুলার লিবারেল সমাজে মানুষ সেল্ফ-এনলাইটমেন্ট নামের এমন এক ব্যক্তিস্বার্থ রক্ষার ধারণায় বিশ্বাস করে। এর প্রধান লক্ষ্য হলো যেকোনো মূল্যে নিজের কামনাবাসনা পূরণ করা।

এই 'অবাধ স্বাধীনতার' নামে মানুষ যা খুশি করছে, কেবল ওপরে উঠার জন্য। কর্পোরেশনগুলো নিজ স্বার্থে যৌনতাকে ব্যবহার করছে, ফ্যাশনের নামে অলিক সব ধারণা ছড়াচ্ছে এবং নারীকে যৌন সামগ্রী হিসেবে উপস্থাপন করছে কেবল জামাকাপড় এবং রূপচর্চার সামগ্রীর সেল বাড়ানোর জন্য। ফিল্ম প্রোডিউসাররা তাদের ফিল্মে যৌনতা ব্যবহার করছে যেন বক্স-অফিসে বেশি টিকেট বিক্রি হয়। পরিণতিতে একটি উগ্র যৌনতাভিত্তিক সমাজ গড়ে উঠছে। এ ধরনের যৌনায়িত সমাজ ব্যবস্থায় অবাঞ্ছিত যৌন হয়রানি ব্যাপক হয়ে ওঠাটাই স্বাভাবিক।

কারও প্রতি যৌন আকর্ষণ বোধ করলে কেন মানুষ যৌন আবেদন জানাবে না? তাকে সবক্ষেত্রে ইচ্ছামতো প্রবৃত্তিপূজা করতে শেখানো হচ্ছে। এ ক্ষেত্রেও সে তাই করছে। সবখানে নারীর এমন যৌনায়িত প্রদর্শন তাকে কি নারীর প্রতি সম্মান

শেখায়? নাকি নারী মাত্রই যৌন সামগ্রী—এমন শিক্ষা দেয়? তাহলে কেন সে নারীদেরকে এভাবে দেখবে না? সাধারণ যৌন আবেদনের ক্ষেত্রে দুটো প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হয়, অনেক সময় দুটো একসাথেই—

প্রথমত, অনেকে পছন্দের সঙ্গীকে আকর্ষণ করতে জনসম্মুখে নিজেকে সর্বোচ্চ আকর্ষণীয় হিসেবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করে। এজন্য তারা নিজের দেহ প্রদর্শন করে, নিজের বাহ্যিক রূপকে আকর্ষণীয় করে তোলে, নিজের সম্পদ প্রদর্শন করে এমনকি নিজের পদমর্যাদার বড়াইও করে।

দ্বিতীয়ত, কাউকে আকর্ষণীয় মনে হলে অনেকে আবার জনসম্মুখেই তার কাছে গিয়ে যৌন আবেদন জানায়। তাকে প্রস্তাব দেয়, ফ্লার্টিং করে, প্রলোভিত করার চেষ্টা চালায়। ব্যক্তি স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়া এ সমাজব্যবস্থায় অনেকেই মনে করে, যদি আপনি এমন পদক্ষেপ না নেন, তবে আপনি আপনার কাঙ্ক্ষিত জিনিস পাবেন না।

এ অনিয়ন্ত্রিত সমাজব্যবস্থায় সব ধরনের যৌনতা বৈধ। '৬০ এবং '৯০-এর দশকের যৌন বিপ্লব এ সভ্যতাকে করেছে প্রবল যৌনায়িত। এখানে এমন অসংখ্য মানুষ থাকাটাই স্বাভাবিক যারা কিনা প্রায়ই অবাঞ্ছিত যৌন প্রস্তাবের সম্মুখীন হয়—হয়তো তাদের কোনো সঙ্গীর প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও তাদের কাছে যৌন আবেদন করা হয়েছে অথবা আবেদনকারীকে তাদের কাছে আকর্ষণীয় মনে হয়নি। আর যখন কেউ যৌন হয়রানিকে 'অযাচিত যৌন আবেদন' হিসেবে সংজ্ঞায়িত করে তখন যৌন হয়রানির কারণগুলো খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

এ বিষয়টি 'প্রণয় অসংগতি'র সৃষ্টি করে। এখানে যতক্ষণ পর্যন্ত শারীরিক কোনো ক্ষতির সম্মুখীন না হতে হচ্ছে ততক্ষণ 'নিজেকে ব্যক্ত করার', 'যৌনতা উন্মুক্তভাবে প্রকাশ করার', 'বাকস্বাধীনতার' ইত্যাদির অনুমতি রয়েছে; এমনকি সামাজিকভাবে এসব কাজকে উৎসাহিত করা হয়। কাজেই পশ্চিমা উদারনীতিতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই জনসম্মুখে ফ্লার্টিং করা এবং কারও মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করা অবৈধ কিছু না। এখানে সবই যৌনতাকেন্দ্রিক। মানুষকে মানবিক করে তুলতে পারে এমন কোনো সামাজিক ব্যবস্থার অস্তিত্ব তাদের নেই। যা-ই হোক, যৌন হয়রানিকে 'অবাঞ্ছিত যৌন আবেদন' হিসেবে বিবেচনা করেই বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে যে, মানুষ প্রায়ই অন্যের আগ্রহ সম্পর্কে ভুল ধারণা করে বসে। মানে এখানে কাজটা সমস্যা না। নারী কী হিসেবে দেখছে তা সমস্যা। সে কেবল আবেদন করার পরেই আবিষ্কার করতে পারে তার আবেদনকে ইতিবাচক দৃষ্টিতে দেখা হবে কি-না। নারীর প্রতিক্রিয়ার আগে বোঝার সুযোগ নেই কাজটি ঠিক হলো না ভুল। আর এভাবেই আমরা একটি আদর্শিক দ্বন্দ্বে পৌঁছাই : সেক্যুলার

লিবারেলিজমের উন্মুক্ত প্রণয় অসংগতি।

২০১২ সালের একটি গবেষণায় দেখা গেছে, 'নারীরা পুরুষের তুলনায় সূক্ষ্ম যৌন হয়রানিমূলক আচরণগুলো খুব সহজে ধরতে পারে। অন্যভাবে বললে, নারী-পুরুষ উভয়েই যৌন নিপীড়ন এবং সাহায্যের বিনিময়ে যৌন সম্পর্ক দাবি করার মতো জঘন্য কাজগুলোকে যৌন হয়রানি হিসেবেই দেখে, কিন্তু নারীদের তুলনায় পুরুষেরা সূক্ষ্ম যৌন হয়রানিমূলক আচরণগুলো কম বুঝতে পারে'।[১৭]

সেক্যুলার লিবারেলিজম যৌন হয়রানির সমাধানের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক যৌন আকর্ষণকে স্বীকার করতে চায় না। অথচ ফ্লার্টিং বা হুক আপ কালচারে ঠিকই স্বীকার করা হয়। সেই সাথে এর কোনো কার্যকরী সমাধানও দিতে পারে না। মানুষের নিয়ন্ত্রণ ব্যক্তিবাদের (Individualism) ওপর ছেড়ে দেওয়ার কারণেই সমাজে এমন বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছে। মানুষের চাহিদার কোনো সীমা থাকছে না। একপর্যায়ে সে বিকৃত এবং অমানবিক উপায়ে নিজের সহজাত চাহিদা পূরণ করছে।

অবাক করা বিষয় হলো, #Metoo মূল হোতা হলিউডের নায়ক-নায়িকাদের ফিল্মগুলোই আত্মকেন্দ্রিকতা (self-gratification) এবং অশ্লীল যৌন আচরণ সমাজে স্বাভাবিক করেছে, মানুষের আচরণকে যৌনায়িত করেছে, হুক আপ কালচারকেই জীবনের লক্ষ্য বানিয়েছে। এসব ফিল্মগুলোই সমাজে অবাধ যৌনতা ছড়িয়েছে এবং গবেষণায় দেখা গেছে যে যৌন হয়রানির সাথে এগুলো সম্পর্ক রয়েছে।

সমস্যাটি নিয়ে হ্যাশ-ট্যাগিং না করে বরং একটি সমাধান খুঁজে বের করুন।

যৌনতা প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের একটি মৌলিক চাহিদা

সেক্যুলার লিবারেলিজমের উদারনীতির বিপরীতে ইসলাম এই কঠিন সমস্যার লাগাম টেনে এটিকে একটি নিয়মনীতির আওতায় নিয়ে এসেছে। মানুষের যৌন জীবনকে সামাজিক প্রক্রিয়ায় আবদ্ধ করার মধ্য দিয়ে তাদেরকে মানবিকভাবে আরও অনেক বেশি দায়িত্বশীল করেছে। ইসলাম বিয়ের মতো একটি কল্যাণকর ব্যবস্থার প্রবর্তনের মাধ্যমে জনপরিসরকে সকল প্রকার যৌনচিন্তা এবং রাজনীতি থেকে মুক্ত রেখেছে।

ইউসুফ আ.-এর ঘটনা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে পৃথিবীর পবিত্রতম চরিত্রের

[১৭] AN OVERVIEW OF THE SEXUAL HARASSMENT LITERATURE, An Overview of the Literature on Antecedents, Perceptions, and Behavioural Consequences of Sexual Harassment

ব্যক্তিরাও (আল্লাহর একজন নবী) প্ররোচিত হওয়ার ভয় করতেন। তাই জুলাইখার মতো সুখ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তিদের সেই ফাঁদে পা দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রলুব্ধ অন্তর আর দুর্বল চরিত্রের ব্যক্তিরা যখন একত্রিত হয় তখনই ব্যক্তি এবং সমাজের নৈতিক অবক্ষয় ঘটে।

ইসলামের বিধানসমূহ ব্যক্তি ধরে ধরে চারিত্রিক দুর্বলতা, বিচ্যুতি এবং প্রলোভন দূর করার আশ্বাস দেয় না। বাস্তবে তা অসম্ভব। কিন্তু ইসলাম মানুষের নৈতিক পদস্খলন থেকে রক্ষার জন্য একটি অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে দেয় যাতে এ দুর্বলতাগুলো যতটুকু সম্ভব কমিয়ে আনা যায়। ইসলাম আমাদেরকে এমন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখতে শেখায় যা আমাদেরকে প্রকৃত মানুষ করে তোলে, আমাদের সম্মান যেখানে মৌলিক বিষয়। ইসলাম আমাদেরকে একটি সুন্দর সমাজ পরিচালনার দিকনির্দেশনা প্রদান করে।

সেক্যুলার লিবারেলরা পৃথিবীর সবকিছুকে ভোগবাদী এক সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখে। তাদের আনন্দ, কষ্ট, হতাশা সবকিছুই বস্তুকেন্দ্রিক। এটি মানুষকে বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে এতটা অক্ষম করে তোলে যে সে মানুষকে পর্যন্ত ভোগের বস্তু হিসেবে বিবেচনা করে। তার কাছে একজন মানুষের মূল্য হলো তার জৈবিক চাহিদা পূরণ করতে পারার কমোডিটি।

আদি বিন হাতিম তাই রা. বর্ণিত একটি হাদিসে রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'এমন একটা সময় আসবে যখন একজন নারী ইরাক থেকে মক্কা সম্পূর্ণ একাকী ভ্রমণ করবে এবং আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করবে না।'

এ হাদিসটি কিন্তু সেই সময় হাদিস যখন রাসুল মক্কা বিজয় করে ফেলেছেন। তার মানে তখন পর্দার আয়াত নাজিল হয়ে গিয়েছিল এবং মুসলিম নারীরা, উম্মুল মুমিনিনরা এমনভাবে পর্দা করতেন যে তাদের এক চোখ ছাড়া কিছুই দেখা যেত না। তাহলে রাসুলুল্লাহ আসবে কেন বললেন? তখনো তো মুসলিম নারীরা যত বেশি পর্দা করা সম্ভব, যত বেশি নিজেকে ঢেকে রাখা সম্ভব তার সর্বোচ্চটা করতেন। তাহলে তখনও নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত হলো না কেন?

এখান থেকে আমরা একটি মজার বিষয় পাই। তা হলো কেবল পর্দা নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে না। ইতিহাস থেকে দেখি, আদি বিন হাতিম তাই নিজেই বলেন যে, এ সকল অঞ্চল মুসলিমদের হাতে আসার পর, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিকভাবে ইসলাম প্রতিষ্ঠার পরই পূর্ণাঙ্গ নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়। অর্থাৎ এমন একটি সমাজ, যেখানে বাচ্চারা দ্বীন শিখে, নারীর প্রতি সম্মান, হুদুদের শাস্তি দেখে বড় হয়। তারা নারী অবমাননায় জাহান্নামের ভয় পেতে শেখে, নারীকে

যৌনবস্তু না বরং নারী হিসেবেই সম্মান করতে শেখে, যৌনতা কেবল স্ত্রীর জন্যই বরাদ্দ রাখতে শেখে।

আমরা এমন একটা সভ্যতার তৈরি করে রেখেছি যেখানে সবকিছুতে যৌনতা। পত্রিকায় যৌনতা, গালিতে যৌনতা, মুভিতে যৌনতা, রাস্তার বিলবোর্ডে যৌনতা, এডভারটাইজে যৌনতা—মোটামুটি পারভার্ট একটা সভ্যতা। আমাদের ভাইয়েরা, আমাদের ছেলেরা ইচ্ছামতো মুভি দেখে, বিনোদন পাতা পড়ে, ঘরে ডিশ লাগিয়ে যাচ্ছেতাই স্ট্রিমিং করে। তারা পতিতা, বিজ্ঞাপনের মডেল, টমবয়—সকলের প্রতিই যৌনতা অনুভব করে। আমাদের হাতে কোনো খিলাফাহও নেই যে পর্ন বন্ধ করবে, পাথর মেরে ধর্ষকের ধর্ষণের স্বাদ জীবনের মতো ভুলিয়ে দেবে।

আর এ সবকিছু করার পর যখন আপনার ছেলে ধর্ষণ করে তখন আপনি বলেন, 'আরে! আমি তো আমার ছেলেকে এ সবকিছু শেখাইনি!' বস্তুবাদের বিপরীতে ইসলাম মানুষের পারস্পরিক সম্মান ও মর্যাদার একটি দৃঢ় ভিত গড়ে দেয়।

> 'নিশ্চয় আমি আদমসন্তানকে মর্যাদা দান করেছি... তাদেরকে সৃষ্ট বস্তুর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।' [কুরআন : ১৭:৭০]

সেক্যুলার লিবারেলিজমের 'হার্ম প্রিন্সিপাল' অনুযায়ী নারী পুরুষ একে অপরের দিকে দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে থাকা, চোখ দিয়ে গিলে খাওয়া ইত্যাদিতে কোনো বাধা নেই। কেননা এতে কারও শারীরিক কোনো ক্ষতি হচ্ছে না। কিন্তু ইসলাম মুসলিমদেরকে তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখতে এবং উত্তম চরিত্র অবলম্বন করতে কঠোরভাবে নির্দেশ দেয়।

> 'মুমিন পুরুষদেরকে বলো, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাজত করে। এটিই তাদের জন্য অধিকতর পবিত্র। তারা যা করে, নিশ্চয় আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক অবহিত। আর মুমিন নারীদেরকে বলো, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে ও তাদের লজ্জাস্থানের হিফাজত করে, যা সাধারণত প্রকাশ পায় তা ব্যতীত। তারা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন করে না বেড়ায়। তারা যেন তাদের বক্ষ মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত রাখে। তোমরা সকলে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।'
>
> [কুরআন ২৪: ৩০-৩১]

ইসলাম বিনয় এবং কোমলতাকে মুমিনের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিবেচনা করে এবং সমাজে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা ও যৌনতাকে স্পষ্টভাবে হারাম ঘোষণা করে।

হিজাবের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য আল্লাহ তাআলা কুরআনে আমাদের সামনে স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন :

> ‘হে নবী, আপনি আপনার স্ত্রীগণকে ও কন্যাগণকে এবং মুমিনদের স্ত্রীগণকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের ওপর টেনে নেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজ হবে। ফলে তাদেরকে উত্ত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু’। [কুরআন : ৩৩:৫৯]

হিজাব একটি ব্যক্তিগত ইবাদাত না বরং এর ভূমিকা সামাজিক। আর তা হলো, সমাজে নারীকে একটি যৌন সামগ্রীতে পরিণত হওয়া থেকে রক্ষা করা। এটা সত্য যে হিজাব পরার মাধ্যমেই কেউ যৌন হয়রানি থেকে নিরাপদ হয়ে যায় না। তবে গবেষণায় (জনসম্মুখে মেকআপ ও খোলামেলা পোশাক পরিধানকারী নারীদের নিয়ে করা গবেষণা এবং হিজাব-জিলবাব পরিহিতা নারীদের নিয়ে করা গবেষণায়ও) দেখা গেছে যে, হিজাব পরিহিতা নারীরা তুলনামূলক কম হয়রানির শিকার হন। যদিও পশ্চিমে হিজাব আপনাকে ইসলামবিদ্বেষী মন্তব্য থেকে নিরাপত্তা দিতে পারবে না।

ইসলামে জনপরিসরে, একান্তে অপ্রয়োজনে অপরিচিত/অবিবাহিত নারী পুরুষের কথোপকথন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। রাসুল ﷺ বলেছেন, ‘কোনো পুরুষ যেন কোনো নারীর সাথে একান্তে অবস্থান না করে। কেননা সেখানে তৃতীয় ব্যক্তি হিসেবে শাইত্বান উপস্থিত থাকে’। বেশিরভাগ যৌন হয়রানির ঘটনা যে চেনা পরিচিত ব্যক্তির দ্বারা ঘটছে তা ভেবে দেখার বিষয়।

অপরিচিত নারী-পুরুষের একে অপরের সাথে আচরণ কেমন হবে ইসলামে তার একটি স্পষ্ট নির্দেশনা আছে। নারী-পুরুষের মধ্যে কোনো প্রকার শারীরিক স্পর্শ ইসলাম অনুমোদন দেয় না, তা সে স্পর্শ যতই ‘বন্ধুত্বপূর্ণ’ হোক না কেন। তাদের মধ্যকার কথোপকথন কেবল কাজের কথায় সীমাবদ্ধ। কথা হবে কাটছাঁট এবং সংক্ষিপ্ত। কোনো অপ্রয়োজনীয় খেজুরে আলাপ জুড়ে দেওয়ার সুযোগ নেই। বিয়ের উদ্দেশ্যে পাত্র-পাত্রী সাক্ষাৎ করতে পারবে, কিন্তু তা অবশ্যই তৃতীয় একজনের উপস্থিতিতে হবে। ইসলামে বিয়ে ব্যতীত অন্য কোনো উপায়ে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের সুযোগ নেই এবং তা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

ইসলামের বিধানগুলোর মানে এই না যে সবাই এমন অপরাধগুলো করে, ইসলাম নিরপরাধকে শাস্তি দেয় না। বরং এই বিধানগুলোর উদ্দেশ্য হলো মানুষকে তাদের হাত থেকে রক্ষা করা যাদের—

> ‘অন্তরে ব্যাধি রয়েছে, যার দরুন সে প্রলুব্ধ হয়’। [কুরআন : ৩৩:৩২]

#Metoo আন্দোলনকে কাজে লাগিয়ে যৌন হয়রানির মূল কারণগুলোর তদন্তে নামা যেত। যৌন হয়রানির সমস্যা কঠোরভাবে মোকাবিলা করার জন্য যে সাহস দরকার ছিল তার জোগান দিতে এই আন্দোলনকে ব্যবহার করা যেত। তবে যৌন নিপীড়ন ও হয়রানির সমস্যাগুলোর মোকাবিলা করা আগে স্বীকার করে নিতে হবে যে এই সমস্যাগুলো লিঙ্গ নির্ভর না। বরং বিকৃত মানসিকতার সাথে পরিস্থিতি (অর্থাৎ যৌনায়িত সমাজ) একত্রিত হয়েই এসব সমস্যার সৃষ্টি। আর এই পরিস্থিতির জন্মদাতা হলো সেক্যুলার লিবারেলিজমের পবিত্রতম বিশ্বাস—ভোগবাদ এবং ব্যক্তিস্বাধীনতা। এর কারণে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি এমন হয়ে যায় যে, সে অন্যদের ও সমাজের প্রতি তার দায়িত্বের আগে নিজেকে ও তার চাহিদাকে গুরুত্ব দেয়।

মুসলিম বিশ্বে ইসলাম কায়েম না হওয়া পর্যন্ত এই সামাজিক সমস্যাগুলোর শিকার হওয়ার লক্ষণগুলো কমিয়ে আনতে আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু এতে কেবল সমস্যার প্রতিকারই হবে যদি এর পাশাপাশি আমরা সমস্যার মূল কারণগুলো খুঁজে বের না করি। আর প্রতিরোধ প্রতিকারের চেয়ে উত্তম।

কিন্তু সেক্যুলার লিবারেল গুরুরা এসব করতে রাজি না। তারা যে ব্যক্তি স্বাধীনতার কথা বলে সে একই ব্যক্তি—স্বাধীনতার নামেই অনেকে নিজের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করছে। এর ফলে এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যেখানে যৌন হয়রানির মতো সমস্যাগুলো সহজেই মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে। অন্যদিকে ইসলামে সবকিছুর উর্ধ্বে আল্লাহর বিধানকে স্থান দেওয়া হয়। ইসলাম সকল প্রকার জাহিলিয়্যাহ থেকে সমাজকে মুক্ত করতে চায় এবং জনসম্মুখে মানুষের কুপ্রবৃত্তির বহিঃপ্রকাশকে প্রবলভাবে নিরুৎসাহিত করে। ইসলাম মানুষকে বিনয়ী, মর্যাদাবান এবং দায়িত্ববান হওয়ার শিক্ষা দেয়।

> ‘আল্লাহ তোমাদের বিধান (সহজ) করতে চান। আর মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে।’ [কুরআন ৪:২৮][৯৮]

---

[৯৮] আন্তর্জাতিক বক্তা ও লেখিকা জারা ফারিসের নিজস্ব ওয়েবসাইটে প্রকাশিত ‘Would Prophet Yusuf (a.s.) get to say #metoo? ' অনুবাদ।

দৃষ্টি।

প্রতিবছর পুরুষরা নারীদেরকে ছোট পোশাকে দেখার জন্য বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার খরচ করে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় নারীদের সুইমস্যুট পরা বিজ্ঞাপন। শুধু কম পোশাকেই না, নগ্ন দেখার জন্যও খরচ করা হয়। বিভিন্ন ইন্টারনেট সাইট ও অনলাইন ম্যাগাজিনে এ বাস্তবতা পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়। কিন্তু নারীরা পুরুষদেরকে নগ্ন দেখার জন্য তেমন কোনো খরচই করে না। কিন্তু কেন?

অনেকের মতে, সামাজিকভাবেই পুরুষরা নারীদেরকে সেক্স অবজেক্ট হিসেবে দেখে, কিন্তু নারীরা পুরুষদেরকে সেভাবে দেখতে অভ্যস্ত না। কিন্তু এরাই সমকামীদেরকে ব্যাখ্যা করতে পারে না। বোঝাই যাচ্ছে, সামাজিকভাবে কী শেখানো হলো তা আসলে এখানে ব্যাপার না। পুরুষরা মজ্জাগতভাবেই এমন (By nature)। পুরুষরা তাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের কারণেই দৃষ্টির মাধ্যমে যৌনায়িত হয়। শুধু দেখার মাধ্যমেই তারা উত্তেজিত হয়ে যায়। বিষয়টি নারীদের থেকে পুরোপুরি আলাদা। নারীদের পক্ষে অসম্ভব পুরুষদের এ মানসিকতা বোঝা।

নারীরা কিছু পুরুষকে আকর্ষণীয় ভাবে—সত্য। হতেই পারে, আবেদনময় কোনো পুরুষের প্রতি নারীরা অনেক আগ্রহ দেখাবে। কিন্তু এ বিষয়ের সাথে পুরুষের সে বৈশিষ্ট্যের কোনো তুলনাই চলে না। কেবল দৃষ্টিই পুরুষদেরকে উত্তেজিত করে দিতে পারে। কিন্তু নারীরা নগ্ন পুরুষ দেখলেই উত্তেজিত হয়ে যায় না, তাদের উত্তেজিত হতে আরও বেশি কিছু প্রয়োজন। কেবল এতটুকুই দরকার হলে যৌন সঙ্গমের আগে স্বামীর কেবল স্ত্রীর সামনে নগ্ন হয়ে ঘুরে বেড়ানোই যথেষ্ট হতো। কিন্তু আমরা জানি, তা সত্য না। একজন স্বাভাবিক পুরুষ দিনে অনেকবার নারীদেরকে দেখে উত্তেজনা অনুভব করে—সামনাসামনি, বিলবোর্ড, ম্যাগাজিন, টেলিভিশনে, এমনকি নিজের কল্পনায়ও।

নারীদের ক্ষেত্রে বিষয়টি এমন না। হ্যাঁ, নারীদের জন্য পুরুষ স্ট্রিপ শো আছে। কিন্তু খুব কম নারীই তা দেখতে যায়। যারা যায়, তারা গ্রুপ করে 'Girl's night out' করতে যায়। কিন্তু এমন প্রতিটি প্রোগ্রামের বিপরীতে ছেলেদের জন্য ১০ হাজারের বেশি নারী স্ট্রিপ শো আছে। সেগুলোতে ছেলেরা অনেক বেশি যায়, একা একাই

যায়। নিজের সাথে সৎ থেকে কথা বলি। কোনো ম্যাগাজিনেই পুরুষদের পা দেখিয়ে নারীদেরকে আকৃষ্ট করার জন্য বিজ্ঞাপন করা হয় না। কিন্তু অনেক জায়গায়, ওয়েবসাইট, পণ্য, ম্যাগাজিনে নারীর পা থেকে শুরু করে শরীরের বিভিন্ন অংশ ফিচার করা হয়। এভাবে পুরুষদেরকে আকৃষ্ট করা হয়।

টপলেস ছেলে দেখার জন্য কি কোনো মেয়ে টাকা খরচ করে? কিন্তু পুরুষ করে, অনেক বেশি করে। কিছু নারী কি দেখেই উত্তেজিত হয় না? হয়। কিন্তু সেটা 'কিছু' নারী, 'কিছু' ক্ষেত্রে, সেলিব্রেটি বা অপরিচিত 'কিছু' মানুষের ক্ষেত্রে। সাধারণভাবে নারীরা এমন নয়, তাদের মানসিকতাও নয়। পুরুষরা যেকোনো নারীর দেহ থেকেই উত্তেজিত হয়। পুরুষদের দৃষ্টির ক্ষমতা এত শক্তিশালী যে পুরুষই অনেক সময় এতে অবাক হয়। পুরুষের সেক্সুয়ালিটি নিয়ে আমার লেকচার শোনার পর এক লোক এসে আমাকে বলল—

> 'আপনাকে আমার কিছু বলার আছে। আমি একটি ডিপার্টমেন্ট স্টোরের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলাম। সেখানের জানালায় আমি দেখলাম একটি বসা নারী অবয়বের মেনিকুইন। আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না যে আমি সেটার স্কার্টের দিকে তাকিয়ে ছিলাম!'

সে লোকটি একজন স্বাভাবিক, দায়িত্বশীল লোক। তিনি নারীও না, নারী অবয়বের একটি মূর্তির দিকে, সেটার স্কার্টের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। নারী দেহের দিকে দৃষ্টি পুরুষদের জন্য এতটাই আবেদন তৈরি করে। নারীরা কেন বুঝতে পারে না, বোঝাই যাচ্ছে। কিন্তু কোনো নারী যদি পুরুষের যৌনতা বুঝতে চায়, তাহলে আগে তাকে বুঝতে হবে পুরুষের দৃষ্টির ক্ষমতা। এজন্যই বিলবোর্ডের বিজ্ঞাপন, টিভি, ম্যাগাজিনে যেকোনো পণ্যের প্রচারে পুরুষদের আকৃষ্ট করার জন্য ছোট ছোট পোশাকের মেয়েদের ব্যবহার দেখতে পাবেন, অনেক সময় নারী দেহের কোনো একটি অংশ।

আমার মনে পড়ে আমি একটি লিকারের বিজ্ঞাপন দেখেছিলাম। সেই বিজ্ঞাপনে ছিল এক বোতল লিকার ও পাশে একটি মেয়ের দুটি নগ্ন পা। দেহও না, চেহারাও না, কেবল সুন্দর পা জোড়া। পুরুষের পা দেখানো কোনো বিজ্ঞাপন আছে? প্রশ্নটা শুনেই মানুষ হাসবে, সবাই জানে বিষয়টি অর্থহীন। কিন্তু নারীর পা দিয়ে করা বিজ্ঞাপন অর্থহীন না, বরং আকর্ষণীয়। এগুলো কোনোটিই পুরুষের ভুল যৌন আচরণের পক্ষে যুক্তি না। পুরুষকে অবশ্যই নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। কিন্তু পুরুষের দৃষ্টির এ ক্ষমতাকে অস্বীকার করা পৃথিবী যে গোল তা অস্বীকার করার মতোই।

ঠিক এ কারণেই আল্লাহ পুরুষের দৃষ্টির ব্যাপারে কঠোর সতর্কতা দিয়েছেন। বিভিন্ন স্থানে রাসুলুল্লাহ ﷺ বর্ণনা করেছেন,

> ‘এক নজরের পর দ্বিতীয় নজর দেওয়া নিষিদ্ধ। প্রথম নজর তো ক্ষমাপ্রাপ্ত কিন্তু দ্বিতীয় নজরের ক্ষমা নেই। হঠাৎ চোখ পড়ে গেলে চোখ ফিরিয়ে নাও অথবা নামিয়ে নাও।’ এবং ‘দৃষ্টি হচ্ছে শয়তানের বিষাক্ত তিরগুলোর মধ্য থেকে একটি তির, যে ব্যক্তি আমাকে ভয় করে তা ত্যাগ করবে আমি তার বদলে তাকে এমন ঈমান দান করব যার মিষ্টি সে নিজের হৃদয়ে অনুভব করবে।’

বর্তমান সভ্যতার পুরোধা ব্যক্তিরা এমন একটি সভ্যতা তৈরি করে রেখেছে যেখানে পুরুষদের কাছে নারীদেহ অনেক বেশি সহজলভ্য, তাদের দৃষ্টির সুখও অনেক বেশি স্বাভাবিক। এমনকি পর্ন বাণিজ্য, যৌন বিপ্লব, নারীদেহের বাণিজ্যিকরণের মাধ্যমে তারা অনেক বেশি যৌনতা-নির্ভর একটি বিশ্ব তৈরি করে রেখেছে; যেখানে নারীই সবচেয়ে প্রচলিত পণ্য। নারীদেহ ছাড়া কোনো পণ্যের কোনো বিজ্ঞাপনের কাটতি নেই, সুন্দরী প্রতিযোগিতা, র‍্যাম্প থেকে শুরু করে সবখানে নিলাম হচ্ছে নারীর দেহ। একে দেওয়া হচ্ছে সম্মানের রূপ। নেটফ্লিক্সের এক ডকুমেন্টারিতে দেখানো হয়, পর্নে কাজ করা নারীরা নিজেদেরকে ‘পর্নস্টার’ উপাধি দিতে পছন্দ করলেও ‘পতিতা’ উপাধি গ্রহণ করতে রাজি নয়।

ইসলামের প্রতিটি বিধানই মানুষের জন্য, মানুষের স্রষ্টা থেকেই। তিনিই জানেন তিনি নারী এবং পুরুষের অন্তরকে কীভাবে তৈরি করেছেন। তাই আমরা সামি’না ওয়াত্ব’নায় বিশ্বাস করি। হিকমাহ খুঁজতে গেলে কূল খুঁজে পাই না। নিঃসন্দেহে আল্লাহর আইনেই আছে সমাধান, বাকি সবকিছু নারী-পুরুষের কেবল ক্ষতিই ডেকে আনবে।[১১]

---

[১১] আমেরিকার কনসারভেটিভ লেখক ড্যানিশ প্রেগারের শর্ট লেকচার *Men and the Power of the Visual* অনুসারে।

পশ্চিমের পুতুল মালালার বিষাক্ত নারীবাদ

মালালা ইউসুফজাই যে পশ্চিমাদের হাতের পুতুল এটি নিয়ে আর কোনো মুসলিমের সন্দেহ নেই। তাকে ব্যবহার করে আফগানিস্তানে মার্কিন আগ্রাসন, গণহত্যাকে বৈধ করার চেষ্টা করা হয়েছে। মালালাকে পূর্ব ও পশ্চিমের সেতু হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে, যেন পূর্বের মানুষ দিয়েই পূর্বে পশ্চিমের সংস্কৃতি রপ্তানি করা যায়। কিন্তু তিনি ইসলাম ও মুসলমানদের সাথে সবচেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন নারীবাদের মাধ্যমে।

নারীবাদীরা দাবি করে, সব পুরুষই সাধারণভাবে আক্রমণাত্মক এবং নারীদের প্রতি সহিংস। এটি সুস্পষ্ট মিথ্যা। এসব নারীবাদীরা সবসময় নারী নির্যাতনের কিছু বিচ্ছিন্ন উদাহরণ টেনে এনে সমস্ত পুরুষকে এক পাল্লায় নিয়ে আসে। মজার ব্যাপার হলো, যখন কেউ সামগ্রিকভাবে কোনো গোষ্ঠীকে অহেতুক তকমা দিয়ে দেয় তখন নারীবাদীরাই তাদেরকে 'বর্ণবাদী' বলে আখ্যা দেয়। তাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়, লংমার্চ করে।

পুরুষরা সহজাতভাবেই নারীদের প্রতি বিনয়ী হয়। পুরুষের মধ্যে আল্লাহ গাইরাত ও দায়িত্ববোধ দিয়ে দিয়েছেন। যার কারণে নিজের বা আশেপাশের যেকোনো পরিবারের বিপদে তাঁকে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখা যায়। এমনকি তা নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে হলেও। অন্যদিকে নারীদের মধ্যে এ প্রবৃত্তিটি নেই। নারীদের সহজাত বৈশিষ্ট্য হলো বাচ্চাদের সুরক্ষা নিয়ে চিন্তিত থাকা। পরিবারের সুরক্ষা ও নিরাপত্তার জন্য যেকোনো কঠিন পদক্ষেপ নেওয়ার মতো পুরুষালি বলিষ্ঠতা তাদেরকে দেওয়া হয়নি।

বোঝাই যাচ্ছে, কেন আল্লাহ পুরুষকে নেতৃত্বের ভূমিকায় দিয়েছেন, নারীর ওপর পুরুষের কর্তৃত্ব আরোপ করা হয়েছে। কেননা আল্লাহ তাদেরকে এ কাজের উপযুক্ত করেই সৃষ্টি করেছেন।

তবে পুরুষের এ প্রবৃত্তির সুযোগ নেয় নারীরা। কয়েক ফোঁটা মেকি অশ্রু ফেলে এবং নিদারুণ কষ্টের কিছু মিথ্যা গল্প শুনিয়ে সুনিপুণভাবে পুরুষদের বশীভূত করে তারা। পুরুষ শিকার হয় প্রবঞ্চনার। তাদের এসব ছলনা পুরুষদের গাইরাতকে তীব্রভাবে নাড়া দেয়। তারা তখন সেই দুর্দশাগ্রস্ত মেয়েটিকে উদ্ধার করতে প্রাণপণ

চেষ্টা করে। অথচ বাস্তবে হয়তো তাকে তেমন কোনো সমস্যারই সম্মুখীন হতে হয়নি।

নারীবাদীরা এভাবেই প্রোপাগান্ডা করে। তারা আজীবন দুষ্ট, নিকৃষ্ট, বিকৃত পুরুষদের নির্যাতনের শিকার হওয়ার দাবি করে মায়াকান্না করে। কয়েকটি নির্যাতনের ঘটনাকে চেরিপিক করে তারা সাধারণ হিসেবে চালিয়ে দেয়। পুরো সমাজ যেন উন্মাদ হয়ে আছে নারীকে ধ্বংসের জন্য। তারা কিছু দাবি করে সবার হাসির পাত্র হয়, 'কাউকে Policeman বলবেন না। এখানে উইম্যান কোথায়?' আশ্চর্যের বিষয় হলো, তাদের এসব উদ্ভট প্রচারণায় কিছু পুরুষকেও শামিল হতে দেখা যায়। এ সকল হোয়াইট নাইটরা ছুতো পেলেই পুরুষতন্ত্রের সমালোচনা করে। তাদের কঠোর সমালোচনা করা উচিত। তাদের কারণেই নারীবাদীদের কাজ সামাজিক বৈধতা পায়।

বোঝার চেষ্টা করুন, ভাই! মালালায় ফিরে আসি।

সমস্ত মুসলিম পুরুষের ওপর এ ধরনের নারী আগ্রাসনের মূর্তপ্রতীক হলো মালালা। তিনি এটা বেশ উপভোগ করেন বলা যায়। তিনি মনে করেন (পশ্চিমা কুফফারদের সাথে বসে) জীবনের প্রতিটা মুহূর্ত উপভোগ করা উচিত, লিবারেলদের মতো সর্বোচ্চ আনন্দের পেছনে ছোটা উচিত, যেখানে বিশ্বজুড়ে তাঁর মুসলিম ভাই-বোনরা প্রতিনিয়ত নিপীড়ন এবং ড্রোন হামলার শিকার হচ্ছে।

২০১০ সালে উইকিলিকস একটি প্রতিবেদনে দাবি করে সিআইএ আমেরিকার আগ্রাসনকে বৈধ করতে নারীবাদকে কাজে লাগাচ্ছে। প্রতিবেদনটি অনুযায়ী, নেদারল্যান্ডস আফগানিস্তান থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করলে, অন্যান্য দেশগুলো খুব সম্ভবত তা-ই করবে। সিআইএ চেষ্টা করছে নারীবাদের মাধ্যমে দশ বছর ধরে ন্যাটোর চালানো আফগানিস্তানের আগ্রাসনকে ইউরোপীয়দের নিকট বৈধ করে তুলতে।[১০০]

প্রতিবেদন থেকে উদাহরণ হিসেবে বলা যায় :

> 'যদি দাবি করা হয়, তালিবানের উত্থান ওই এলাকায় অনেক কষ্টে অর্জিত নারী শিক্ষার উন্নতিকে উলটো দিকে ঠেলে দিতে পারে, তাহলে ফ্রান্সের সেক্যুলার নাগরিকরা গৎবাঁধা এই আগ্রাসনকে সমর্থন দেওয়া শুরু করবে। অর্থাৎ এই ধরনের কারণসমূহ রক্তাক্ত ইনভেসন এর সমর্থন জোগাড় করে দেয়, কারণ তারা এই ইনভেশনকে দেখে 'কল্যাণময় সাধনা' হিসেবে।'

---

[১০০]https://wikileaks.org/wiki/CIA_report_into_shoring_up_Afghan_war_support_in_Western_Europe,_11_Mar_2010

কিছুদিন আগে এক বক্তব্য দিয়ে তিনি আবার আলোচনা-সমালোচনার জন্ম দেন। সেখানে তিনি জোরালোভাবে বলেন—

> 'আমি জানি না মানুষ আসলে কেন বিয়ে করে। আপনি যদি নিজের জীবনে কোনো সঙ্গীর প্রয়োজন অনুভব করেন, তবে কেন একটি কাগজে আপনাকে স্বাক্ষর করতেই হবে? এটি কেন শুধু একটি পার্টনারশিপ হতে পারে না?'

কী নির্বোধ মন্তব্য! তিনিই-না গত বছর অক্সফোর্ড থেকে স্নাতক হয়েছেন? অবশ্য এতেই অনেককিছু বোঝা যায়। পশ্চিমা বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আজকাল প্রকাশ্যে উগ্র নারীবাদীদেরকে উৎসাহিত করছে। এ নারীবাদীরা উন্মুক্ত যৌনতার প্রচার করে এবং LGBT আন্দোলনে মার্চ করে।

মালালা সকল কন্যাসন্তানের বাবাদের (এবং ভবিষ্যতে যারা কন্যাসন্তানের বাবা হবেন তাদের) জন্য একটি চরম সতর্কতা। আপনি কি চাইবেন যে আপনার মেয়ে বড় হয়ে ব্যভিচারের সমর্থক হোক? আপনি কি চাইবেন যে আপনার মেয়ে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীদের পুতুল হয়ে ইসলাম ও মুসলমানদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করুক? যদি তা না চান, তবে তাকে নারীবাদের আগ্রাসন থেকে রক্ষা করুন। তার মাথা থেকে নারীবাদী চেতনা যেমন 'দৃঢ়', 'স্বাধীনচেতা', 'স্বাবলম্বী' নারীকর্মী হওয়ার চিন্তা দূর করুন। আর কত নির্বোধ থাকবেন? সচেতন হোন এবং তাকে একজন বাধ্য স্ত্রী, একজন স্নেহময়ী মা হবার শিক্ষা দিন। যেন পরিবারের সেবা, সন্তানের লালনপালন করার মধ্য দিয়ে সে আল্লাহর দাসত্ব করতে পারে।

উম্মাহর অবস্থার পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজন এমন আদর্শ নারীর। মালালার মতো নারীবাদীরা উম্মাহকে কেবল পিছিয়েই দেবে।[১০১]

---

[১০১] দাঈ, লেখক এবং আলাসনা ইন্সটিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা ড্যানিয়েল হাক্কিকাতজুর নিজস্ব ওয়েবসাইটে প্রকাশিত *Malala's Toxic Feminism: The Western Puppet Promotes Zina!* অবলম্বনে।

আফগান নারীর জন্য শ্বেতাঙ্গদের কান্না

আফগানিস্তানে War on Terror ঠিক সেভাবেই শেষ হলো, যেভাবে তা শুরু হয়েছিল—আফগান নারীদেরকে নিয়ে শেয়ালের কান্না দিয়ে। অবশ্য আমেরিকার মানসিকতা বোঝা যাচ্ছে। মিসাইল ছোড়ার আগে কিংবা মুসলিমবিশ্বে বোম ফেলার আগে তাদের সাধারণ মানুষের সামনে কিছু একটা তুলে ধরা দরকার ছিল। জনগণ যেন যুদ্ধের বিরোধিতা না করে, যুদ্ধকে সমর্থন দেয়—সেজন্য তাদের কাছে কিছু প্রোপাগান্ডা ছড়ানো দরকার হয়। এভাবে জনগণ পক্ষে থাকবে, প্রতিরোধ আসবে না এবং যুদ্ধবিরোধী যেকোনো তর্ককে দমন করা যাবে।

আফগানিস্তানে হস্তক্ষেপ এবং পরবর্তী সময়ে সেখানে সামরিক অভিযান চালানোর পেছনে সবচেয়ে বড় অজুহাতটি ছিল আফগান নারীদের বন্দিদশা। তারা বলে, তারা নাকি আফগান নারীদের অবস্থান উন্নয়ন ঘটাতেই এমন হামলা করছে। পশ্চিমের সাধারণ মানুষের 'সাদা আধিপত্যবাদী' আবেগকে আর কী দিয়ে উসকে দেওয়া যাবে? যুদ্ধ বৈধ করার জন্য এর চেয়ে সেরা অজুহাত আর কী হতে পারে? আফগান নারীদেরকে 'মুক্ত' করার জন্য একাট্টা হয়ে যায় নাইটস টেম্পলারদের উত্তরসূরিরা। সামরিক ইন্ডাস্ট্রিগুলো স্লোগান দেয়, 'নারীদেরকে রক্ষা করুন!' এর সাথে মিলিয়ে স্লোগান দেয়, 'আমাদের সৈন্যদের সমর্থন করুন!' (ব্রিটিশরা বলবে, 'আমাদের ছেলেদেরকে সমর্থন করুন!') কিন্তু এর পেছনের বার্তা সবাই জানে, কিন্তু কেউ স্বীকার করে না, 'আমাদের (সাম্রাজ্যবাদী) যুদ্ধকে সমর্থন করুন!'

মালালার আলোচনায় আগের অধ্যায়ে সিআইএর প্রোপাগান্ডা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বুশ প্রশাসন একে কেবল সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধই না; বরং নারীর সম্মান ও অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার যুদ্ধ বানিয়ে নিয়েছে। তৎকালীন সময়ের ফার্স্ট লেডি লরা বুশ তাৎক্ষণিক এবং সরাসরি আফগান নারীদের অবস্থা নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। তাঁর ভাষায়, এটি 'চরম জুলুম'। ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রী চেরি ব্লেয়ার আফগান নারীদের পক্ষে আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন, ক্যাম্পেইন করেছিলেন।

যখন সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়, তখন পশ্চিমের সাধারণ মানুষের মাথায় ইতিমধ্যেই তালিবানের অধীনে থাকা নারীদের দুর্দশা একেবারে সেঁটে ছিল।

পশ্চিমা মিডিয়া নিজেদের মতো করে তালিবানকে চিত্রায়িত করে। বিরাট বিরাট দাড়িওয়ালা বাদামি রঙা সব লোক, মাথায় বিশাল পাগড়ি আর গায়ে বিরাট কাবুলি পরা। তাদের মানসিকতা অনেক উগ্র। বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী দেশ মুখোমুখি হতে যাচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে অসভ্য, গরিব জনগোষ্ঠীর সাথে যারা '৮০র দশকের অস্ত্র চালায়, ইংরেজি বলতে জানে না এবং পশ্চিমের 'স্বাধীনতা'কে ঘৃণা করে।

২০১০ সালে আমেরিকার সেক্রেটারি অব স্টেইট হিলারি ক্লিনটন আফগান নারীদের অধিকার রক্ষার শপথ নেন। আফগান নারীদের ওপর বোমা মেরে মেরে তাদেরকে রক্ষার ইতিহাস লিবারেল নারীবাদীদের আছে। নারীবাদী স্কলার গয়োত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক সুন্দরই বলেছেন, 'আফগানিস্তানে সাদা পুরুষরা বাদামি পুরুষ থেকে বাদামি নারীদেরকে রক্ষার অভিযান শুরু করল'।[১০২] মজার বিষয় হলো, আফগানি নারী ও বালিকাদেরকে রক্ষা করতে গিয়ে অগণিত আফগান নারীকে দুনিয়ার বুক থেকে বিদায় করে দিয়েছে আমেরিকা। আমেরিকার দীর্ঘতম এ যুদ্ধে ৭০,০০০-এর বেশি সাধারণ মানুষ নিহত হয়েছে, পঙ্গু হয়েছে আরও অগণিত। যার বেশিরভাগই নারী ও শিশু।[১০৩]

আজ ২০২১-এ এসেও আমরা খুব ভিন্ন কিছু শুনছি না। আজকে এত ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ, মানুষের ওপর গণহত্যা এগুলো সবকিছুই আমরা দেখেছি মানবতাবাদ এবং নারী অধিকারের মুখোশে। যুদ্ধ শুরুও হয়েছিল ক্লিনটনের এমন ঘোষণাতেই। অ্যান্টি এফজিএম ক্যাম্পেইনার নিমকো আলি সাম্প্রতিক সময়ে টুইট করেন, 'মিলিয়ন মানুষ এখন পশ্চিমা হস্তক্ষেপ খুব করে চাইছে'।[১০৪] আফগানিস্তানে সৈন্য রেখে দেওয়ার একটি নারীবাদী যুক্তি দাঁড় করানো হয়েছে। কিন্তু কেন? যারা তালিবানের 'কল্পিত' ভবিষ্যৎ গণহত্যা নিয়ে এত চিন্তিত, তারা কেন আমেরিকার ২০ বছর ধরে করে যাওয়া হত্যাযজ্ঞের কোনো প্রতিবাদ করছে না?[১০৫]

আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপের এ দুই যুগে, ন্যাটোভুক্ত দেশগুলো তাদের জিহ্বা দিয়ে নারী অধিকারের বুলি আওড়ে গিয়েছে। কিন্তু তাদেরকে তেমন কোনো রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক পদক্ষেপ নিতে দেখা যায়নি। কিন্তু বক্তব্য চলছিল। ২০১১ সালে, ওয়াশিংটন পোস্ট আমেরিকার নারী অধিকারের মুখোশ নিয়ে আলোচনা করেছে। তারা ভেঙে ভেঙে দেখিয়েছে, আমেরিকার নারী অধিকার কেবল মুখোশ ছিল, বাস্তবে তাদের এজেন্ডা থেকেই বিষয়টি বাদ দেওয়া হয়েছে। আর্টিকেলে একজন

---

[১০২] https://www.opendemocracy.net/en/dont-use-girls-as-justification-for-bombing-afghanistan-again/
[১০৩] https://watson.brown.edu/costsofwar/costs/human/civilians/afghan
[১০৪] https://twitter.com/NimkoAli?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
[১০৫] https://theintercept.com/2021/08/19/afghanistan-taliban-defense-industry-media/

সরকারি কর্মকর্তার উক্তিও উল্লেখ করা হয়েছে, 'এসব ফালতু বিষয় আমাদের আসল কাজকে পিছিয়ে দিচ্ছে' (All those pet rocks in our rucksack were taking us down)। আফগানিস্তানে ২০১০ অর্থবছরে আমেরিকার ফান্ডিং ছিল ১৬,৭৪৮ মিলিয়ন ডলার। কিন্তু ২০২১ অর্থবছরে তা নেমে এসেছে ৩,১২০ মিলিয়ন ডলারে।[১০৬]

পশ্চিমের হস্তক্ষেপকে দেখানো হয় একটি উদারতা হিসেবে। তাদের স্লোগান, প্রোপাগান্ডা কিংবা মুভিতে তাদেরকে দেখানো হয় মানুষকে মুক্ত করার শক্তি হিসেবে। এ প্রচণ্ড জটিল জিওপলিটিক্যাল আলোচনায় নারীকে কেবল নিজেদের স্বার্থেই ব্যবহার করা হয়েছে। আমেরিকার এই সভ্যকরণ মিশনের অর্থ হলো আফগান মহিলাদের বিভিন্ন চাহিদা এবং অধিকারগুলোকে অস্পষ্ট এবং ঘোলাটে করে দেওয়া এবং স্থানীয় মহিলারা যেন তাদের নিজ আকাঙ্ক্ষাকে প্রকাশ করতে এবং নিয়ন্ত্রণ করতে অক্ষম হয়ে পড়ে তা নিশ্চিত করা।

কাবুলই সমগ্র দেশ না

জনপ্রিয় ভিত্তিহীন বর্ণনাগুলো আমাদের গুরুত্বপূর্ণ এবং সূক্ষ্ম বাস্তবতাগুলো নিয়ে ভাববার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। প্রথমত, এটা মনে রাখা জরুরি যে কাবুল সমগ্র আফগানিস্তানের প্রতিনিধিত্ব করে না। দেশের অধিকাংশ গ্রামীণ এলাকার ওপর কাবুলের কেন্দ্রীয় সরকারের কখনোই কর্তৃত্ব ছিল না। তা ছাড়াও বহুল প্রশংসিত মার্কিন-সমর্থিত আফগানিস্তানের নারী ক্ষমতায়ন মূলত রাজধানীতে পেশাদার পরিবারের শিক্ষিত শহুরে অভিজাতদের একটি মুষ্টিমেয় অংশ নিয়ে গঠিত। আফগানিস্তানের গ্রামীণ অঞ্চলে প্রায় ৭৬% নারী বসবাস করেন। তারা তথাকথিত অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন পায়নি। গত ২০ বছর ধরে তারা আঞ্চলিক মিলিশিয়া এবং সরকারের যুদ্ধের বলি হয়েছেন। এ বিরাটসংখ্যক নারীর জন্য আমেরিকার কোনো ক্ষমতায়ন ছিল না, ছিল ড্রোন।

সত্য বলতে, সব অঞ্চলের সব নারীদের উন্নয়ন সমানভাবে হয়নি। শহুরে নারীদেরকেই কেবল ফিচার করা হয়েছে, তাদের পেছনেই অর্থ ব্যয় করা হয়েছে। পশতুন-সহ বিভিন্ন অঞ্চলে, গ্রামীণ এলাকার নারীদের জীবনযাত্রা ১৯৯৬ সালে যেমন ছিল আজও ঠিক তেমনই আছে। তাদের আদর্শ, সংস্কৃতি কিছুই বদলায়নি। বর্তমান ক্ষমতায়নের কিছুই এখানে দেখবেন না। ৯/১১ এর অনেক আগ থেকেই, তালিবানের কোনো প্রভাব ছাড়াই আফগানিস্তানের অসংখ্য নারী নিজেকে পুরোপুরি বোরকাবৃত করে রাখে।

[১০৬] https://www.hrw.org/news/2021/08/17/fragility-womens-rights-afghanistan

তাদের জীবনের মূল চিন্তা পশ্চিমা নেশার মতো না। পশ্চিমাদের মতো শরীরের কতটুকু অংশ নারীরা খোলা রাখল তা নিয়ে চিন্তায় মরে যায় না তারা। তাদের জীবনের বাস্তবতা অনেক বেশি কঠোর। তাদের স্বামী, ছেলে এবং বাবাদের মৃত্যু তাদেরকে কেবল জটিল মানসিক ট্রমায় ফেলে তা-ই না; বরং তাদেরকে অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু করে দেয়, সুস্থ জীবনযাপনের সুযোগ নষ্ট করে দেয়। পরিবারের পুরুষ সদস্যদের হারিয়ে বিধবা এবং তাদের সন্তানরা সবসময় নিরাপত্তা ঝুঁকিতে থাকে, মানসিক এবং শারিরীকভাবে ভঙ্গুর থাকে। ২০১৯ সালের শেষের দিকে এবং ২০২০ সালের প্রথমদিকে কিছু আফগান নারীর সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছিল। সেসব আফগান গ্রামীণ নারীদের অনেকের কাছেই শান্তি এবং স্থিতিশীলতাই মূল কথা। তালিবান ও আমেরিকার শান্তিচুক্তিতে তাদের অনেকেই আশা দেখছেন। সাম্প্রতিক সময়ের International Crisis Group এর একটি রিপোর্টে মূল সমস্যা ওঠে এসেছে। কেউ কেউ ১৯৯০ সালের দিকে তালিবানের কাজকে 'অনুচিত' বলে মন্তব্য করা সত্ত্বেও প্রায় সবাই স্বীকার করেছে যে তালিবানদের আমলে সকল যৌননির্যাতন অনেক কমে এসেছিল, মানুষের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা ছিল।[১০৭]

আমেরিকা এবং তাদের মিত্রশক্তি আফগান আর্মির জন্য আরেকটি হতাশার জায়গা হলো, গ্রামীণ অঞ্চলে দ্রুত এবং সঠিক বিচার করার জন্য তালিবান বিখ্যাত ছিল। তাদের সূক্ষ্ম, নিরপেক্ষ ও আপসহীন বিচারব্যবস্থা ছিল সরকারের চেয়ে ভালো। মানুষ তাই তাদের দিকেই ঝুঁকত। তালিবান কাউকে বিশুদ্ধ পানি, ইলেক্ট্রিসিটি কিংবা কোনো নাগরিক সুবিধা দিতে পারেনি, কিন্তু তালিবান তাদেরকে শারিআহ দিয়েছে, আল্লাহর আইন অনুসারে নিরপেক্ষ বিচার দিয়েছে। সাধারণ মানুষের সঠিক স্বার্থে তাই তালিবানের বিচারকের বিকল্প ছিল না।

'আফগান নারীরা নিজেদের খেয়াল রাখতে জানে না'

পশ্চিমের পোস্ট কলোনিয়াল অহংকার সময়ে সময়ে বের হয়ে আসে। এসব মানুষরা মনে করে নারীবাদীদের বলে দেওয়া অধিকারই সত্যিকার নারী অধিকার। নারী-মাত্রই এগুলো সাদরে গ্রহণ করবে। তারা ভাবতেও পারে না যে আফগান নারীরা স্বেচ্ছায় লিবারেল নারীবাদকে বর্জন করবে এবং সবার ওপরে নিজের আদর্শ ও সংস্কৃতিকে প্রাধান্য দিয়ে নিজেদের সমাজকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করবে। এ সহজ সত্য স্বীকার করতে না পেরে তারা আফগান নারীদেরকে ডিহিউম্যানাইজ করে, প্রোপাগান্ডা করে যে আফগান নারীদেরকে নাকি পশ্চিমের

[১০৭] https://www.crisisgroup.org/asia/south-asia/afghanistan/what-will-peace-talks-bode-afghan-women

রক্ষা করতে হবে। সত্য বলতে আফগান নারীরা নির্জীব কোনো জনগোষ্ঠী না। তালিবান এবং আমেরিকার অধীনে অনেক নারী অনেকদিন থেকেই আন্দোলন করছেন। তারা নিজেদের আদর্শ ও সংস্কৃতি রক্ষায় উদ্‌গ্রীব, অন্যদিকে সব সংস্কৃতি ধ্বংস করে দিতে চাওয়া লিবারেলদের কাছে এটিই বন্দিত্ব।

গত কয়েক বছর তারা হাতে গোনা অল্পকিছু এলিট নারীদেরকে প্রমোট করে নারীদের ক্ষমতায়নের বুলি আওড়েছে। কিন্তু তারা খুবই অল্পকিছু মানুষ। তারা সাধারণ মানুষের আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হয়নি। আফগান সমাজের নেতা হলো পুরুষরা। তারা পুরুষদেরকে নারী অধিকার সম্পর্কে সচেতন করার কোনো ব্যবস্থাই গ্রহণ করেনি। বরং তারা প্রকাশ্যেই আফগানিস্তানের ধর্ম ও ঐতিহ্যকে চ্যালেঞ্জ করে বসেছে। যেন এসকল ধর্ম ও সংস্কৃতি খারাপ এবং কেবল তাদের আদর্শই ভালো। তারা আফগানিস্তানের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য সম্পর্কেও কোনো ধারণা রাখে না।

জুলাইয়ে ব্রাসেলসে আয়োজিত একটি ন্যাটো সামিটে আফগানিস্তানের তৎকালীন একজন নারী ডিপ্লোম্যাট নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেছেন, 'ঘানি সরকার (তৎকালীন আফগানিস্তানের ক্ষমতায় থাকা আমেরিকার পাপেট সরকার) দাবি করে যে তারা নারীদেরকে প্রাধান্য দেয়। কিন্তু সত্য বলতে, তারা তা দেয় না। আফগানিস্তানের নারীদেরকে সাহায্য করা নিয়ে পৃথিবীর সবাই কথা বলে, লিপ সার্ভিস দেয়। কিন্তু অর্থ, সাহায্য কখনোই তাদের পর্যন্ত পৌঁছে না। যুদ্ধ এবং দুর্নীতি সব শেষ করে দিচ্ছে'।[১০৮] Transparency International দুর্নীতিগ্রস্ত দেশের লিস্টে ৪ নম্বরে রেখেছে আফগানিস্তানকে। এর অন্যতম কারণ ছিল দুর্নীতির কারণে আন্তর্জাতিক সাহায্য ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং খুব কমই সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছাচ্ছে।

Against White Feminism বইয়ের লেখক রাফিয়া জাকারিয়া বলেছেন, আমেরিকার শ্বেতাঙ্গ ফেমিনিস্টরা মনে করেছিল, আফগান নারীরা যাই ভাবুক না কেন 'যুদ্ধ এবং উপনিবেশ তাদেরকে রক্ষার জন্য আবশ্যক'[১০৯] আফগান নারীদেরকে বোমা মেরে, দেশ দখল করে তারা চায় না এমন 'স্বাধীনতা' জোর করে চাপিয়ে দিতে হবে, অবশ্যই খুব জঘন্য মাত্রার সাম্রাজ্যবাদী মানসিক ভ্রান্তি না থাকলে এমনটা ভাবা সম্ভব না। নির্বাচনী আইন, নারী নির্যাতন নির্মূল আইন-সহ বর্তমান আইনগুলোর ক্ষেত্রে আমি পশ্চিমা শব্দের ব্যবহারের সাথে একমত নই। এই আইনগুলোর বাস্তবায়ন সম্ভব হয়েছে কেবল সুশীল সমাজের আফগানদের

---

[১০৮] https://time.com/5472411/afghanistan-women-justice-war/
[১০৯] https://www.aljazeera.com/opinions/2021/8/21/white-women-washing-the-uss-civilising-mission-in-afghanistan

প্রচেষ্টার কারণে। তারা প্রচুর সমর্থন এবং লবিং-এর মাধ্যমে এসব সম্ভব করেছে।

'আফগানিস্তানের অধিকাংশ মানুষই নারীশিক্ষাকে পশ্চিমা মূল্যবোধ হিসেবে দেখে না, বরং গত ১০ বছরের সবচেয়ে বড় অর্জন হিসেবে দেখে নারীশিক্ষাকে। সামাজিক জীবনে নারীদের অংশগ্রহণ আফগানদের কাছে মোটেই নতুন না। সরকারের দুর্নীতির বিরুদ্ধে অবস্থান এবং শিক্ষার জন্য লড়াই আফগানিস্তানে নতুন না; বরং আফগানরা তা নিয়ে পশ্চিমের টাকা পাওয়ার অনেক আগ থেকেই লড়াই করছে। এমনকি এর পেছনে আমেরিকার অবদান আছে দাবি করাও আফগানদের প্রতি অপমান। বিংশ শতকের শুরু থেকেই শারিআহ অনুসারে এসবের জন্য আফগানরা দাবি জানিয়ে আসছে সোভিয়েত-পরবর্তী দুর্নীতিবাজ সরকারগুলোর কাছে'।[১১০]

এটি একধরনের সাম্রাজ্যবাদী আভিজাত্য এবং পিতৃতান্ত্রিক ও যৌনতাবাদী সংবেদনের একটি ব্র্যান্ডের মূর্তপ্রতীক। আরব এবং মুসলিম বিশ্বকে নারী অধিকার এবং লিঙ্গসমতা নিয়ে লেকচার দেওয়ার সময় আমেরিকা একে খুব ভালোভাবেই ব্যবহার করে। তাদের ঔদ্ধত্যের মাথা মাটিতে লুটিয়ে যায় যখন এমন হেডলাইন আসে, 'পশ্চিম যতই চেষ্টা করুক, আফগান যুবকরা নিজেদের ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতিতেই ফিরে যেতে চায়'।[১১১] দুর্ভাগ্যবশত, তাদের অহংকার, নিজেকে সবসময় ঠিক মনে করার কারণে তারা তাদের আফগানিস্তানকে সভ্য করে তোলার এ ওরিয়েন্টালিস্ট মিশনের বিরুদ্ধে সাধারণ জনতার প্রতিরোধ স্বীকারই করতে চায় না।

নারী ক্ষমতায়নের বাস্তবতা

কোনো এক অদ্ভুত কারণে আফগানিস্তানের নারী ক্ষমতায়ন তাদের পোশাক দিয়ে বিবেচনা করা হয়। যে নারী শরীরকে যত উন্মুক্ত রাখেন তিনি তত স্বাধীন। পশ্চিমাদের চোখে এটিই নারী ক্ষমতায়ন। ১৯৭০ সালের দিকে আফগানিস্তানের রাস্তায় আফগান নারীদের মিনিস্কার্ট পরা ছবিগুলোকে বেশি করে প্রচার করা হচ্ছে, বলা হচ্ছে মানুষ আগের সেই 'সোনালি যুগ' এর ব্যাপারে স্মৃতিকাতর। পশ্চিমারা আফগান নারীদের জন্য আসলে কী করতে চায় তা পরিষ্কার হওয়া দরকার। অথচ যুদ্ধবিধ্বস্ত এ দেশে শরীর উন্মুক্ত রাখার অধিকার আফগান নারীদের মূল চাহিদা নয়।

---

[১১০] https://www.nytimes.com/2013/08/23/world/asia/afghans-share-their-views-on-the-wests-influence.html

[১১১] https://www.nytimes.com/2013/08/01/world/asia/despite-wests-efforts-afghan-youths-cling-to-traditional ways.html?action=click&module=RelatedCoverage&pgtype=Article®ion=Footer

দেশকে ধ্বংস করে দেওয়া, দেশের জনসাধারণকে ধ্বংস করে দেওয়া পশ্চিমারা বোধহয় বুঝতে পারছে না যে আঞ্চলিক 'নারীবিদ্বেষ' না; বরং আফগান নারীদের মূল সমস্যা এখন অর্থনৈতিকভাবে ঘুরে দাঁড়ানো, মাথার নিচে একটি ছাদ, খেয়ে পরে বাঁচার অধিকার। একই সমস্যা দেশের প্রতিটি সাধারণ জনগণের। ন্যাটো সামিটে যখন প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, কেন আফগানিস্তানের দুই-তৃতীয়াংশ মেয়ে এখনো স্কুলে যায় না, তখন প্রেসিডেন্ট আশরাফ ঘানি পশ্চিমা শক্তিকেই দোষারোপ করেন। তারা আফগানিস্তানের সাধারণ মানুষদের পালস বুঝতে পারেনি, তাদের প্রোপাগান্ডা সাধারণ মানুষের ওপর কোনো প্রভাবই ফেলেনি। তিনি বলেন, 'নিটি গ্রিটির প্রশ্ন তুললে, বয়ঃসন্ধিকালে উপনীত মেয়েদের স্কুলগুলোর কতগুলোতে মেয়েদের টয়লেট আছে? এটি মৌলিক প্রশ্ন। তিন কিলোমিটার দূরে দূরে কয়টি মেয়েদের স্কুল আছে? মেয়েরা কোথায় যাবে? আন্তর্জাতিক এক্সপার্টরা ছিলেন সব পুরুষকেন্দ্রিক। তারা লিঙ্গ নিয়ে কথা বলেন, তাদের প্যাম্পলেটগুলো অনেক চকচকেও, কিন্তু তারা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছতে পারেন না।'[১১২]

সরকারি পরিসংখ্যান মতে, ২০১৪ সালে আফগানিস্তানের সকল আত্মহত্যার ৮০ শতাংশই নারী। পৃথিবীর খুব কম দেশেই নারীদের আত্মহত্যার হার এত বেশি। সাইকোলজিস্টরা এর কারণ হিসেবে বলছে, ক্রমাগত চলতে থাকা পারিবারিক সহিংসতা এবং দারিদ্র্যই এর মূল কারণ। ২০০৮ সালের Global Rights এর সমীক্ষায় বলা হয়, ৯০ শতাংশ আফগান নারীই পারিবারিক সহিংসতার স্বীকার। দীর্ঘদিনের সেক্যুলার শিক্ষাব্যবস্থা নারীকে নিরাপত্তা দিতে পারল না। নাসেরির ভাষায়, '২০০১ থেকে চলা এ হত্যাযজ্ঞের কারণে নারীর কোনো অধিকার অর্জন হয়নি। এ যুদ্ধ কেবল আমাদের নারীদেরকে হত্যাই করেছে, আর কিছু না'।[১১৩]

নারীবাদ হলো লিবারেল গণতন্ত্রেরই একটি অংশ। এ দুটো রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিকে আলাদা করার সুযোগ নেই। লিবারেল গণতন্ত্রীরাই বোমা মেরে মুসলিম বিশ্বে নারীবাদ এনেছে। নারীদের যতই অগ্রগতি হয়েছে সবগুলোর কারণ হিসেবেই বলা হচ্ছে পশ্চিমের এ ঘৃণ্য হত্যাযজ্ঞ, দখলদারত্ব। যেসকল নারীরা নিজেদের সংস্কৃতি ও ধর্মের মধ্য থেকে নিজেদের অবস্থা পরিবর্তনের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন, সফলও হচ্ছেন, কেউ তাদের নাম জানছে না। কেননা তারা পশ্চিমা হস্তক্ষেপের বিরোধী। অনেক নারী পশ্চিমা হস্তক্ষেপ রুখে দিতে অস্ত্রও ধরেছেন।

---

[১১২] https://www.iwmf.org/reporting/were-all-handcuffed-in-this-country-why-afghanistan-is-still-the-worst-place-in-the-world-to-be-a-woman/

[১১৩] https://time.com/5472411/afghanistan-women-justice-war/

বিশ বিশটি বছর এবং ৩ ট্রিলিয়ন ডলার খরচের পরেও দেশটি একটি ধ্বংসস্তূপ। অক্টোবরে জাতিসংঘ ঘোষণা করেছে ২০১৪ সালে আফগানিস্তানে সাধারণ মানুষের মৃত্যু সবচেয়ে বেশি ছিল আফগানিস্তানে। ২০১৮ সালের জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে অন্তত ২৭৯৮ জন সাধারণ জনগণ নিহত হয়েছে এবং আহত হয়েছে ৫০০০ এর বেশি মানুষ। Gallup এর জুলাইয়ে সংঘটিত সমীক্ষায় বলা হয়েছে, আফগানিস্তানে মানুষের জীবনের মূল্য কম। অন্য যেকোনো দেশের চেয়ে, অন্য যেকোনো বছরের চেয়ে সহজে, দ্রুত নিহত হচ্ছে আফগানরা।[১১৪]

যখন সিলেক্টিভ মানবতা উপচে পড়ে

যেসকল মানুষরা আফগানিস্তানের নারীদের তথাকথিত দুর্দশা দেখে অনেক হায় হুতাশ করছিল, আশা করি তারা সেখানকার জীবনমরণ সমস্যা নিয়েও একইভাবে চিন্তিত হবে। পশ্চিমের হস্তক্ষেপের কারণে যে অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে আফগান জনগণের তাঁর প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করবে। আফগানিস্তানের এ যুদ্ধে সবচেয়ে বেশি লাভবান হয়েছে বিভিন্ন সামরিক ইন্ডাস্ট্রি। যুদ্ধ যত চলবে ততই তাদের লাভ, যুদ্ধ বন্ধ হলে ব্যবসা শেষ। তাদের লাভ হয়েছে ট্রিলিয়ন। এ যুদ্ধের আসল সফলতা মোটেই নারীর নয়; বরং সামরিক কন্ট্রাক্টর, অস্ত্র ব্যবসায়ী, মিডিয়া এবং যেসব রাজনীতিবিদ অবসরে গিয়ে বিভিন্ন প্রতিরক্ষা ইন্ডাস্ট্রিতে যান তাদের।

আফগানিস্তানের প্রশ্ন আসলে জিজ্ঞেস না করে পারা যায় না, আফগান নারীদের জন্য এত যে অশ্রু, তারাই কেন পশ্চিমাদের সব যুদ্ধাপরাধ ধামাচাপা দিলো? ব্রিটিশ যোদ্ধাদের শিশুহত্যা, জেলে নির্যাতন করে হত্যা, নির্যাতন, যৌন নির্যাতন-সহ আরও অনেক শিউরে ওঠা তথ্য মিডিয়ায় খুব বেশি দেখাই যায় না, সেগুলোর জন্য সহানুভূতি তো পরের কথা।[১১৫] অথবা ভেবে দেখুন যখন অস্ট্রেলীয় এলিট সেনারা ৪০০ জন প্রত্যক্ষদর্শীর সামনে অসংখ্য কয়েদি, কৃষক এবং বেসামরিক লোকদের হত্যা করেছিল। সেই সাথে তারা আরও গুরুতর অপরাধের সাথে জড়িত ছিল, যেমন—

—জুনিয়র সৈন্যদেরকে তাদের প্রথম খুন শুরু করতে বলা হয়েছে কারাগারের বন্দিদের দিয়ে। এ কাজের নাম, 'Blooding'.

—সাধারণ আফগান নাগরিকদের মৃতদেহের পাশে বিভিন্ন অস্ত্র ও পোশাক দিয়ে দেওয়া যেন তাদেরকে জঙ্গি মনে হয় এবং নিজেদের অপরাধ লুকানো যায়।

---

[১১৪] https://time.com/5472411/afghanistan-women-justice-war/

[১১৫] https://www.aljazeera.com/news/2019/11/17/uk-government-and-military-covered-up-war-crimes-report

–বিভিন্ন ঘটনা যেগুলো যুদ্ধাপরাধের সংজ্ঞায় পড়ে যায়। বিভিন্ন সময় 'বর্বর জিজ্ঞাসাবাদ'-এর নামে হওয়া সব যুদ্ধাপরাধ।[১১৬] সাধারণ জনগণের বিরুদ্ধে মার্কিন সেনাবাহিনীর যুদ্ধাপরাধের ব্যাপারে যখন International Criminal Court একটি তদন্ত শুরু করে, তখন আমেরিকা তাকে যেভাবে 'শাস্তি' দিয়েছিল তার কী হবে?[১১৭]

অপরাধী যেই হোক না কেন, যখন সাধারণ আফগান নাগরিকদের প্রতি হওয়া সকল অন্যায়ের প্রতি ক্রোধ এবং উদ্‌বেগ একই রকম দৃঢ় হবে, কেবল তখনই আফগানিস্তানের জনগণের জন্য লিবারেলদের এই মায়াকান্নার মূল্য থাকবে।[১১৮]

---

[১১৬] https://www.bbc.co.uk/news/world-australia-54996581

[১১৭] https://theconversation.com/us-punishes-international-criminal-court-for-investigating-potential-war-crimes-in-afghanistan-143886

[১১৮] Islam21 এ প্রকাশিত জিমারিনা সারওয়ারের লেখা *The White Tears for Afghanistan's Women* আর্টিকেল অবলম্বনে।

মুসলিম নারীবাদ : উপনিবেশবাদের পদচিহ্ন

সাধারণ মুসলিমরা নারীবাদ বলতে পশ্চিমা নারীবাদকেই বোঝে। কিন্তু মুসলিম নারীবাদীদের দাবি হলো, তাদের নারীবাদ ও পশ্চিমা নারীবাদ একই নয়।[১১৯] তাদের মতে, পশ্চিমা নারীবাদ তারা কখনোই গ্রহণ করবে না। তারা পশ্চিম থেকে শুধু 'নারীবাদ' শব্দটাই ধার করেছে। নিজেদের নতুন আন্দোলনের সংজ্ঞায়ন করতে গিয়ে এ মতাদর্শের নাম দিয়েছে 'মুসলিম নারীবাদ'। তারা অত্যন্ত জোরালো স্বরে বলে, শুধু 'নারীবাদ' শব্দটি গ্রহণ করার অর্থ এই নয় যে তারা পশ্চিমা নারীবাদের সকল মূল্যবোধকে গ্রহণ করে নিয়েছে। তারা মনে করে, নারীবাদের সমালোচকদের কোনোভাবেই সব নারীবাদকে এক পাল্লায় মাপা উচিত নয়। (#NotAllFeminists ...)

মুসলিম নারীবাদীদের দাবি, যদিও-বা নারীবাদের উৎপত্তি হয়েছে পশ্চিমে, কিন্তু এর মূল মূল্যবোধ পৃথিবীজুড়ে সব মূলধারার জনগোষ্ঠীর কাছে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। তারা মোটেই Femen[১২০] আন্দোলনের মতো নন। অনেক প্রগতিশীল গবেষক এবং কর্মীরা নিয়মিত এর পক্ষে কাজ করে যাচ্ছেন, বই-লিফলেটের মাধ্যমে আদর্শ প্রচার করছেন। মুসলিম নারীবাদীরা বিশ্বাস করে, ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক নয় এমন মূল্যবোধগুলোই শুধু তারা গ্রহণ করেছে। কাজেই মুসলিমদের তাদের কাজের বিরোধীতা করার কোনো কারণ নেই।

বিষয়টি আসলেই অবাক করা। মুসলিমদের মধ্য থেকেই একটি জনগোষ্ঠী পশ্চিমের

---

[১১৯] প্রখ্যাত মুসলিম নারীবাদী ড. জিবা মির-হোসেইনির মুখে ইসলামি নারীবাদ : Dr Ziba Mir-Hosseini: What is Islamic Feminism -https://youtu.be/Fzf2D43wcTc

[১২০] Femen হলো আন্তর্জাতিক নারীবাদী সংস্থা। ইউক্রেনে জন্ম নেওয়া এ সংগঠন প্রায়ই সেক্স ট্যুরিজম, ধর্মীয় সংস্থা, লিঙ্গ বৈষম্য, হোমোফোবিয়া-সহ বেশ কিছু বিষয়ে 'টপলেস' আন্দোলন করে আলোচনায় উঠে আসে। 'টপলেস' আন্দোলন হলো তাদের নির্দিষ্ট আন্দোলন। উগ্র আন্দোলনের কারণে তাদেরকে প্রায়ই বিভিন্ন দেশের পুলিশ আটক করে। তাদের হেড অফিস ফ্রান্সে। তাদের আদর্শ হলো, সেক্সট্রিমিজম (Sextremism), নাস্তিকতা এবং নারীবাদ। সংগঠনটির মোটো হলো, 'যৌন শোষণ, একনায়কতন্ত্র এবং ধর্মের বিরুদ্ধে লড়াই করার মাধ্যমে পুরুষতন্ত্রের উচ্ছেদ।' তাদের স্লোগান হলো, 'আমার দেহই আমার অস্ত্র'। তাদের কৌশল হলো নারী যৌনতাকে সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে আন্দোলন করা। 'টপলেস' আন্দোলনের ধারণা আসে এ প্যারাডাইম থেকে। এ ধরনের আন্দোলন অহিংস, তবে তীব্র। বিস্তারিত : https://femen.org/about-us/ - অনুবাদক।

আদর্শ দিব্যি গ্রহণ ও প্রচার করে যাচ্ছে। মুসলিমরা বুঝতে পারে না, ঠিক কী কারণে তারা পশ্চিমা টার্ম, তাদের ওয়ার্ল্ডভিউ, বুদ্ধিবৃত্তি, আইকন, সেক্যুলার চিন্তা গ্রহণ করছে এবং পরবর্তী সময়ে তাঁকে ইসলামের ওপর আরোপ করছে। ইসলামের নিজেদের মতো ব্যাখ্যা করছে। ইসলাম কি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান নয়? তাহলে আমাদেরকে ঠিক কোন কারণে পশ্চিমা নারীবাদীদের টার্ম এবং মূল্যবোধকে গ্রহণ করতে হবে? ইসলামে কি এসবের সমাধান নেই?

মজার বিষয় হলো, যখনই মুসলিমরা এসব বিষয়ে মুসলিম নারীবাদীদেরকে প্রশ্ন করে, তারা তখন প্রচণ্ড রেগে যায়। এসবের জবাব দিতে গিয়ে তারা সবসময় ভিক্টিম কার্ড খেলে। নিজেদেরকে ভিক্টিম দেখিয়ে তারা বলেন, 'আপনি কেন মুসলিম নারীদের অধিকারের বিরুদ্ধে কথা বলছেন? নিজেদের অধিকার হওয়া সচেতন হওয়া কি অন্যায়?' এগুলো হাস্যকর, অর্থহীন জবাব। এটি প্রশ্ন ও সমালোচনাকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য একটি আবেগপ্রবণ আবেদন তৈরি করা ছাড়া আর কিছুই না। তাদের যুক্তি অনুসারে, আপনি কম্যিউনিজমের বিরুদ্ধে কথা বলতে পারবেন না। কম্যিউনিজমের বিরুদ্ধে কথা বলার মানে হলো দরিদ্র শ্রমিক জনসাধারণের বিরুদ্ধে কথা বলা!

নারীর অধিকারে বিশ্বাস করা আর নারীবাদী হওয়া সম্পূর্ণ আলাদা দুটি বিষয়। আমি যিশুকে খ্রিষ্ট, নবী হিসাবে বিশ্বাস করি (গ্রীক ভাষায় মিসায়াহ)। আমি কি খ্রিষ্টান হয়ে গেলাম? আমি মনে করি যে দারিদ্র্য মানুষের জন্য অভিশাপ, দেশকে দ্রুত দারিদ্র্য থেকে মুক্ত করা জরুরি। এর মানে কি আমি একজন কম্যিউনিস্ট? আমি চাই জায়নবাদ ধ্বংস হোক। তাঁর মানে কি আমি অ্যান্টি-সেমিটিক? আসুন একটু ভিন্নভাবে চিন্তা করি। নারীবাদীরা কি বিশ্বাস করে যে পুরুষদেরও সমান অধিকার থাকা উচিত? জবাব যদি 'হ্যাঁ' হয় তবে কি তাদেরকে 'পুরুষবাদী' বলা যাবে? এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর হলো 'না'।

যে কেউ কোনো লেভেল ছাড়াই দরিদ্র, অসহায়, ফিলিস্তিনি কিংবা অসহায় নারীর ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করতে পারে, তাদের পক্ষে জনমত তৈরি করতে ভূমিকা রাখতে পারে। কিন্তু এ কাজ করার জন্য তাকে নির্দিষ্ট কোনো মতাদর্শের অনুসারী হতে হয় না। প্রতিটি মূল্যবোধ আসে কোনো না কোনো আদর্শিক ভিত্তি থেকে। যদি আমি দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে কথা বলি এবং এর প্রতিষেধক হিসেবে বলি যে সবার সমান পরিমাণ সম্পদ থাকা উচিত, ব্যক্তিগত মালিকানা ভুল, তাহলে আমি একজন কম্যিউনিস্ট। তেমনইভাবে যদি আমি ইহুদিদেরকে ঘৃণা করার কারণে, ইহুদি-মাত্রই হত্যাযোগ্য মনে করার কারণে জায়নিজমকে উচ্ছেদ করতে চাই, তাহলে আমি একজন অ্যান্টি-সেমেটিক।

একইভাবে, কেউ যদি এ বিশ্বাস করে যে নারী-পুরুষের মধ্যকার সকল পার্থক্য নিছকই সামাজিক বৈষম্য, এভাবে একজন নারী কেবল নির্যাতিতই হচ্ছেন, নারী-পুরুষের সমান অধিকার এবং কর্তব্য থাকা উচিত, তখনই তাকে আমরা নারীবাদী বলি। যদিও নারীবাদের সংজ্ঞা, অবস্থান ও কর্মপন্থা নিয়ে নারীবাদীদের মধ্যেই অনেক মতবিরোধ আছে, কিন্তু তাদের অধিকাংশই একটি বিষয়ে একমত। তা হলো—একজন নারী যেকোনো সুযোগ-সুবিধা ভোগ করার অধিকার রাখে কোনো প্রকার বাধা ছাড়া। এতে পুরুষের কোনো অধিকার লঙ্ঘিত হলেও কিছু করার নেই। [নারীবাদের (Feminism) শেষে 'বাদ' বা 'ism' শব্দটিই প্রমাণ করে নারীবাদ একটি মতাদর্শ, কোনো কর্মপন্থা নয়]

নারী-পুরুষের সমান অধিকার, সবকিছুকে সামাজিক বলে উড়িয়ে দেওয়া, জনসমক্ষে নগ্নতার প্রচারের মতো অনাচারকে আমি সর্বাংশে ঘৃণা করি, বর্জন করি। কিন্তু আমি দৃঢ়ভাবে নারীর ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় বিশ্বাসী। অনৈসলামিক পরিবেশ ও রাষ্ট্রে একজন নারী যেসমস্ত বৈষম্য এবং সহিংসতার শিকার হয়, সেসব অত্যাচার থেকে তাদেরকে মুক্তি দেওয়ার জন্য আমি কাজ করে যাব। তাই বলে কি আমি নারীবাদী?

বর্তমানে মুসলিম বিশ্বের অবস্থা শোচনীয়। তাদের রাষ্ট্রনীতিতে শরিয়াহর কোনো স্থান নেই। এমনকি অনেক আলেম পর্যন্ত শরিয়াহকে অবজ্ঞা করেন! মুসলিম নারীরা এ নাজুক পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার জন্য সংগ্রাম করছেন। আমি এজন্য তাদের দোষারোপ করছি না। যা-ই হোক, যে নারীরা তাদের অধিকার অর্জনের জন্য নারীবাদের দারস্থ হন তাদের উদ্দেশ্যে 'The Dark Knight' চলচ্চিত্রের 'আলফ্রেড' চরিত্রটির একটি উক্তি বলতে চাই, 'তাদের হতাশার সুযোগ নিয়ে তাদেরকে প্রবলভাবে একটি ধারণা গেলানো হয়েছে। তারা এমন একটি আদর্শকে গ্রহণ করে নিলো যা তারা পুরোপুরি বুঝতেও পারেনি।'

সত্য বলতে, এমন চর্চা ভালো নয়। এগুলো মুসলিমদেরকে ধীরে ধীরে কুফরের দিকে নিয়ে যায়। দিনশেষে এসব মুসলিমরা নিজেদের 'নারীবাদী' বলেই দাবি করে এবং পশ্চিমা মূলধারার স্রোতে প্রবেশ করে, তাদেরই যুক্তি ব্যবহার করে, তাদের বই থেকেই কোট করে এবং তাদের আইকনদেরকেই নিজেদের আইকন বলে দাবি করে। কাফির লেখা হোক বা মুসলিমের, ইসলামবিদ্বেষী হোক বা না হোক, নারীবাদী যেকোনো প্রকাশনাকে তারা সমর্থন করা শুরু করে একপর্যায়ে। তারা কি তাহলে মনে করে যে ইসলাম ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় সক্ষম নয়? আর তাই সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় নারীবাদ প্রয়োজন? নাকি মনে করে নারীবাদই ন্যায়বিচারের মানদণ্ড? তারা কীভাবে নিশ্চয়তা দেবেন যে নারীবাদ সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে

পারবেই?

মুসলিম নারীবাদীরা যাদেরকে ‘পশ্চিমা নারীবাদী’ বলে আখ্যায়িত করে, তারা নিজেদেরকে কেবল ‘নারীবাদী’ই বলে। তাদের মতে, নারীবাদ নারীবাদই। কেন বলবে না? তারাই তো নারীবাদের জন্ম দিয়েছে। তারাই নারীবাদকে সংজ্ঞায়িত করেছে। নারীবাদীরা সমানাধিকারে বিশ্বাসী এমন সব আদর্শকে সমর্থন করে, হোক তা সেকুলারিজম, লিবারেলিজম, কমিউনিজম কিংবা প্যাগান। তারা নারী পুরুষের লিঙ্গের ভিন্নতাকে অস্বীকার করে। তবে এ ক্ষেত্রে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কিছুটা ভিন্ন। আমরা বিশ্বাস করি যে আল্লাহর কাছে নারী ও পুরুষ উভয়ের আত্মার গ্রহণযোগ্যতা সমান। কিন্তু পার্থিব জীবনে তারা অবশ্যই ভিন্ন লিঙ্গের এবং এ কারণে তাদের ভূমিকাও ভিন্ন।

মুসলিম নারীবাদীরা বিভিন্ন সময় ‘ইসলামই যে সত্যিকার অর্থে নারীবাদী’ তা প্রমাণ করতে ওঠে পড়ে লাগে। কিন্তু পশ্চিমা নারীবাদীরা একে চ্যালেঞ্জ করে। তারা বারবার প্রমাণ করেছে যে ইসলাম এবং নারীবাদ কখনোই এক নয়। তাদের ওয়ার্ল্ডভিউ, মূল্যবোধ ভিন্ন। নারীবাদীদের তোলা আপত্তির মধ্যে আছে পরিবারের নেতৃত্ব, মিরাস (উত্তরাধিকার), ভিন্ন অধিকার, পরিবার, সমাজ, যুদ্ধ ও রাজনীতিতে নারী-পুরুষের ভিন্ন দায়িত্ব ইত্যাদি। এবং প্রতিটি পয়েন্ট সত্য। এভাবে নারীবাদীরাই মুসলিম নারীবাদকে অর্থহীন প্রমাণ করে। তখন মুসলিম নারীবাদীরা নিয়ে আসে ব্যাখ্যার অস্ত্র। তারা নিজেদের মতো করে ইসলামকে ব্যাখ্যা করতে থাকে। তাদের মতে, ইসলামের হাজার বছরের আলিমদের সিলসিলার প্রায় সবাই ভুলভাবে নারীদের অধিকার, দায়িত্বের বিষয়গুলো ভুলভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

দামিনী মামলার[১২১] ক্রেডিট অনেকেই এককভাবে সেদেশের নারীবাদীদের দেয়। ভারতের সেসকল কর্মীদের কথা তারা কীভাবে ভুলে গেলেন যারা নারীর প্রতি

---

[১২১] দামিনি কেইস: একটি ধর্ষণ ও হামলার মামলা। ১৬ ডিসেম্বর, ২০১২ তে দক্ষিণ দিল্লির মুনিরকাতে ২৩ বছর বয়সী ফিজিওথেরাপি ইন্টার্ন জয়তি সিং নামের একজন নারীকে নির্যাতন এবং গণধর্ষণ করা হয়। তিনি তাঁর ছেলে বন্ধুকে নিয়ে একটি প্রাইভেট বাসে করে যাচ্ছিলেন। গাড়ির চালক-সহ ৬ জন যাত্রী তাঁকে নির্যাতন ও গণধর্ষণ করে। তাঁর বন্ধুকেও ব্যাপক মারধোর করা হয়। ঘটনার ১১ দিন পরে তাঁকে জরুরি চিকিৎসার জন্য সিঙ্গাপুরের একটি হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। তিনি সেখানে দুদিন পর মারা যান। এ ঘটনা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলোতে গুরুত্বের সাথে উঠে আসে। ভারতে আইনত ধর্ষিতার নাম প্রকাশ করা যায় না। সে ক্ষেত্রে তাঁকে সবাই ‘নির্ভয়া’ নামে চিহ্নিত করে। তাঁর কষ্ট এবং মৃত্যু বিশ্বজুড়ে সমগ্র পৃথিবীতে ধর্ষণের বিরুদ্ধে একটি প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়। Delhi gangrape: Chronology of events". *The Hindu*. New Delhi. 31 August 2013. Archived from the original on 2 September 2013. Retrieved 2 September 2013. https://www.thehindu.com/news/national/delhi-gang-rape-chronology-of-events/article11862316.ece —অনুবাদক।

অন্যায়, ধর্ষণের বিরুদ্ধে বরাবরই সোচ্চার? এটি কি কেবল তারা নারীবাদী নয় বলে? পশ্চিমাদের স্বাধীনতার মতাদর্শই কি নারীবাদের জন্ম দেয়নি? এ উন্মাদ স্বাধীনতাই সৃষ্টি করেছে পর্ন ইন্ডাস্ট্রি, বলিউড, গণমাধ্যম। এদের কাজের ফলে মানুষ নারীকে কেবলই একটি যৌন সামগ্রী হিসেবে বিবেচনা করে। নারী মানেই যেন যৌনতা এবং আদিম আনন্দ। মানুষ এখন চরম আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থপর। নারীবাদীরা দাবি করত নারীর স্বাধীনতা নগ্নতায়। যৌন হয়রানি বন্ধে নারীর নগ্নতা কী কাজে এসেছে? বাবা-মা সব ধ্বংস করে রেখেছে আর তারা এখন তাদের সন্তানকে পাঠাচ্ছেন তা ঠিক করার জন্য। আমি একটি প্রশ্ন করি। কোনো দেশ যদি অত্যাচারী কমিউনিস্ট শাসনের অধীনে থাকে তাহলে তারা কী করবেন? আপনি কি কম্যিউনিজম থেকে মুক্তির জন্য আরও কোনো উদার কমিউনিস্ট পার্টির অধীনে কাজ করবেন? নাকি মানুষকে ইসলামের দাওয়াহ দেবেন যেন তারা সত্যিকার মুক্তি অর্জন করতে পারে?

পশ্চিমা মূলধারার মূল্যবোধ থেকে নিজেদের কিছুটা পৃথক করতে কিছু 'মুসলিম নারীবাদী' একটু ঘুরিয়ে বলেন, সাদা চামড়ার মানুষেরা এবং ঔপনিবেশবাদীরা পশ্চিমা নারীবাদের সংজ্ঞা তাদের 'নারীবাদের' ওপর চাপিয়ে দিয়েছে। কিন্তু বস্তুত এটা সত্য নয়।

দুঃখজনক কিন্তু সত্য, 'মুসলিম নারীবাদীরা' ইতিমধ্যেই তাদের চিন্তাচেতনায় উপনিবেশবাদী চিন্তা গভীরভাবে লালন করে। তারা মনে করে পশ্চিমা আদর্শের রঙে রঙিন হলেই কেবল তারা জাতে উঠতে পারবে। ক্যারিয়ার বা অর্থ উপার্জনের জন্য তারা সানন্দে নারীবাদ গ্রহণ করে নিয়েছে। পশ্চিমা অগ্রগতি দেখে তাদের চোখ ধাঁধিয়ে গেছে।

এসকল মুসলিমরা যেকোনো মূল্যে 'নারীবাদ' টার্মটি ব্যবহার করতে চায়। কেননা শব্দটি পশ্চিমা। এভাবে পশ্চিমা প্রভুদের দয়া পাওয়া যায়, তাদের টেবিলে সীট পাওয়া যায়, অনেক ক্ষেত্রে অর্থও উপার্জন করা যায়। এসকল টার্ম কি কোনো কুফর বহন করছে কিনা, কিংবা কোনো নির্দিষ্ট ওয়ার্ল্ডভিউ মুসলিম ভূমিতে প্রচার করতে চাচ্ছে কিনা তাতে কী আসে যায়! আপনি যে দেশের টাকা ব্যবহার করছেন তার মূল্য নির্ধারণ করবে সে দেশের কর্তৃপক্ষ। আমরা সবাই এটা জানি, মেনেও নিয়েছি। কিন্তু শেষমেশ আপনাকেই দিতে হয় অর্থ।

নিউ টেস্টামেন্টে যিশুর একটা বিখ্যাত বর্ণনা এসেছে। যখন যিশু হলি টেম্পলে বসে আছে, তাঁর বিরোধীরা তাঁকে জিজ্ঞেস করল, রোমের প্যাগান রাজা ইহুদিদের ভূমি দখল করে রেখেছে। ধার্মিক ইহুদিদের কি এমন একজন রাজাকে কর দেওয়া উচিত?

'আমাদের কি এসব পৌত্তলিকদের কর দেওয়া উচিত হবে?'

যিশু ভালোভাবেই তাঁর গোত্রের মানুষদের ভণ্ডামি সম্পর্কে জানতেন। তিনি তাদের বললেন, 'কেন তোমরা আমাকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করছ?' এরপর যিশু তাদের একটা ডেনারিয়াস আনতে বললেন। তারা এনে দেওয়ার পরে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'এখানে কার ছবি খোদাই করা দেখতে পাচ্ছ তোমরা? কার শিলালিপি?' জবাবে তারা বলল 'সিজারের'। তখন যিশু বললেন, 'তাহলে সিজারের জিনিস সিজারকেই ফিরিয়ে দাও আর আল্লাহকে দাও যেটা তাঁর প্রাপ্য'। (*Give back to Caesar what is Caesar's and to God what is God's.*) তারা যিশুর উত্তরে বেশ অবাক হয়েছিল।[১২২]

যিশুর উত্তরটা তাদের জন্য যথার্থই ছিল। কারণ তারা সানন্দে রোমানদের মুদ্রা গ্রহণ করত, আনন্দ করত, সবখানে ব্যবহার করত, এমনকি তাদের পবিত্র মন্দিরেও। কিন্তু কর দেওয়া থেকে বাঁচার জন্য তারা যিশুর সামনে এসে নিজেদের সাধু প্রমাণ করতে চায়। সব মিথ্যাচার মানুষেরই সৃষ্টি। যার থেকে যা নেওয়া হয়েছে তা ফিরিয়ে দিতেই হবে। কিন্তু আসমান এবং পৃথিবীর সবকিছুর কর্তৃত্ব শুধু আল্লাহর। মানুষের জীবনযাপন, আইন, অধিকার, দায়িত্ব—কিছুই তাঁর ক্ষমতার বাইরে নয়।

চলুন, যিশুর মতো করেই আমরা নারীবাদীদেরকে জিজ্ঞেস করি, 'নিজেদের সম্মান, অর্থ উপার্জন ও জাতে উঠার জন্য যে নারীবাদ তা কারা আবিষ্কার করেছে? এর নীতিগুলো কে ঠিক করে দিয়েছে? কে নিজের ছবি সেখানে খোদাই করেছে?' তারা স্বীকার করতে বাধ্য যে, এর স্রষ্টা 'পশ্চিমাবিশ্ব'।

যিশুর মতো করেই জবাব দিন, 'পশ্চিমা মূল্যবোধ পশ্চিমাদেরই ফিরিয়ে দাও এবং আল্লাহর ইবাদাত করো এমনভাবে যেমনটা তাঁর প্রাপ্য।'

'তাহলে কি এরা আবার সেই জাহেলিয়াতের ফায়সালা চায়? অথচ যারা আল্লাহর প্রতি দৃঢ় প্রত্যয়ের অধিকারী তাদের দৃষ্টিতে আল্লাহর চাইতে ভালো ফয়সালাকারী আর কেউ নেই।'[১২৩] [১২৪]

---

[১২২] Mark 12:15-17.

[১২৩] সুরা মায়েদা : ৫০।

[১২৪] আবদুল্লাহ আল-আন্দালুসির নিজস্ব ওয়েবসাইটে প্রকাশিত *"Muslim Feminism" – A legacy of colonial currency"* এবং *"Can the word Feminism merely mean an activist for Women's rights"* অবলম্বনে।

মুসলিম নারীবাদ : একটি পর্যালোচনা

নারী অধিকারের ওপর নারীবাদীদের একচেটিয়া অধিকার নেই। তাই নারীবাদ এবং এর দর্শনের স্বরূপ উন্মোচন করার অর্থ এই নয় যে আমরা নারী অধিকার অস্বীকার করছি কিংবা যারা নারী অধিকারের কথা বলে সবাইকেই প্রত্যাখ্যান করছি। এখানে নারীদের একটি নির্দিষ্ট অংশকে আসলেই 'মুক্ত করা' প্রয়োজন কিনা তা নিয়ে আলোচনা করা হবে না। উপনিবেশ পরবর্তী সময়ে মুসলিম বিশ্বে নারী-পুরুষ উভয়ই ব্যাপক সামাজিক অবিচারের মুখোমুখি হচ্ছে। সেইসাথে নারী, পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধের ওপর শাসক শ্রেণির নিপীড়নের ডমিনো-প্রভাব যে ইসলামি শাসন বাস্তবায়নের কারণে নয়; বরং ইসলামি শারিআহর অনুপস্থিতির কারণে পরিলক্ষিত হচ্ছে তাও আজ সুস্পষ্ট। কুরআনের ঐশ্বরিক প্রজ্ঞা এবং এর প্রায়োগিক দিক অনুধাবনে ব্যর্থতার কারণেই মুসলিম বিশ্ব আজ এতটা নিপীড়িত। পশ্চিমাদের বর্বর নীতিহীন আদর্শের ক্রমাগত হস্তক্ষেপে মুসলিমদের এ দুর্দশা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। ইসলামকে পুরোপুরি ধ্বংস করাই এসব আদর্শের মূল উদ্দেশ্য। কিছু মানুষ আছে যারা ইসলামি রেনেসাঁর পক্ষে, যারা ইসলামকে সকল সমস্যার সমাধান হিসেবে বিবেচনা করে। পাশাপাশি এমন মানুষও আছে যারা ইসলামকে কোনো সমস্যা সমাধানে যথেষ্ট মনে করে না বরং তারা ইসলামেরই সংস্কার চায়। এরা ইসলামকে সমস্যা মনে করে এবং পশ্চিম থেকে আমদানি করা আদর্শকে সেই সমস্যার সমাধান হিসেবে বিবেচনা করে।

যদিও বর্তমান মুসলিম বিশ্বের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে পর্যালোচনা এ আলোচনার আওতার বাইরে, কিন্তু এটা সহজেই বুঝা যায় যে উপনিবেশ পরবর্তী সময়ে শিক্ষাব্যবস্থা থেকে ইসলামকে বাদ দেওয়ার ট্রমা মুসলিম বিশ্ব আজও ভোগ করে যাচ্ছে। যার কারণে জনসাধারণের মধ্যে ইসলামের গভীর বুঝের অভাব দেখা যাচ্ছে। আমাদের সালাফগণ ইসলামকে যেভাবে বুঝতেন সেই বুঝ থেকে আজ মুসলিমরা দূরে সরে যাচ্ছে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই নারী-পুরুষ উভয়ের প্রতি বৈষম্য এবং অবিচার বেড়েই চলছে। ইসলামের এমন অগভীর জ্ঞান থাকার কারণে অনেকেই তাদের আগের নিপীড়ক উপনিবেশবাদীদের আদর্শ এবং জীবনব্যবস্থাকেই সেরা মনে করে অনুকরণ করতে শুরু করেছে; বিশেষ করে

সেক্যুলার লিবারেলিজম এবং এর লিঙ্গভিত্তিক শাখা নারীবাদ। নারীবাদ ও আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপের এ যুগে এসে অনেক মুসলিম নারীবাদ গ্রহণ করে নেওয়ার কথা বলে। ইসলাম ও নারীবাদের এক জগাখিচুড়ি মিশেল ঘটাতে চায়। আমাদের আলোচনা তা নিয়েই।

কিছু প্রতিকারের প্রয়োজনীয়তা খুবই স্পষ্ট। কিন্তু এ আলোচনায় উপস্থাপিত বিশ্লেষণের মাধ্যমে এটা আরও বেশি সুস্পষ্ট হবে যে, 'নারীবাদী ধর্মতত্ত্ব' বা 'মুসলিম ফেমিনিজম' খুবই দুর্বল একটি প্রতিকার। এই আলোচনায় 'নারীবাদী ধর্মতত্ত্ব' প্রকল্পের সকল অন্তর্নিহিত স্ববিরোধ, অসংগতি এবং বিপর্যয়মূলক পরিণতির ওপর আলোকপাত করা হবে। আমরা আরও দেখব, ধর্মতত্ত্বের উদ্দেশ্য যেখানে স্রষ্টাকেন্দ্রিক সেখানে নারীবাদ হলো সম্পূর্ণ লিঙ্গকেন্দ্রিক, তাই 'নারীবাদী ধর্মতত্ত্ব' একটি অবান্তর এবং স্ববিরোধী ধারণা।

এই আলোচনার বিভিন্ন বিষয়ের রেফারেন্সের ক্ষেত্রে ইসলামের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কুরআন, রাসুলের ﷺ সিরাত, নববি মানহাজ, হাদিস এবং শারিআহর আশ্রয় নেওয়া হবে।

নারী-পুরুষের ইচ্ছা নয়; বরং স্রষ্টার ইচ্ছা নিয়ে অধ্যয়নই ধর্মতত্ত্ব

মুসলিম নারীবাদের কার্যকারিতা মূল্যায়নের জন্য এর কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান রাখা প্রয়োজন। এ আলোচনাজুড়ে অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে যে ধর্মতত্ত্বের উদ্দেশ্য হলো কেবল স্রষ্টা এবং তাঁর ইচ্ছা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা। এই জ্ঞান শুধু সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছা অনুধাবনের প্রচেষ্টার সাথে জড়িত, সৃষ্টির ইচ্ছা নয়। অর্থাৎ, 'নারীবাদী ধর্মতত্ত্বের' মূল দর্শন যদি স্রষ্টার ইচ্ছা অধ্যয়নের সাথে সম্পর্কিত না হয়, তবে এটি 'ধর্মতত্ত্বের' উদ্দেশ্য পূরণেই ব্যর্থ হবে।

ধর্মতত্ত্ব সৃষ্টিকর্তা এবং তাঁর ঐশ্বরিক ইচ্ছার সাথে সম্পর্কিত আর নারীবাদ হলো নারীবাদীদের মানবিক ইচ্ছার সাথে সম্পর্কিত। ধর্মতত্ত্বে স্রষ্টা এবং তাঁর সৃষ্ট মানুষের মধ্যে যে সম্পর্ক বর্ণনা করা হয় তা 'নারীবাদী ধর্মতত্ত্ব' বা 'মুসলিম নারীবাদ' একেবারেই নাকচ করে দেয়। 'নারীবাদী ধর্মতত্ত্বে' স্রষ্টার ইচ্ছার আগে মানুষের ইচ্ছাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। বর্তমানে আমরা যে অত্যাচার-নিপীড়ন দেখতে পাচ্ছি তার প্রধান কারণ হিসেবে বলা যায়, স্রষ্টার ইচ্ছার ওপর মানুষের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দেওয়া। ধর্মতত্ত্বে এই অগ্রাধিকারের নড়চড় করার দুটি প্রতিক্রিয়া রয়েছে। প্রথমত, নারীবাদীরা ইসলামের কর্মপদ্ধতিকে কুসংস্কার বলে বা হেয় করে। দ্বিতীয়ত, নারীবাদীরা ধর্মতত্ত্বে নিজেদের পছন্দের জিনিস খোঁজে। অর্থাৎ আগে থেকেই তারা কোনটি ঠিক তা ধরে নেয়। এ বিষয়ে নিচে আলোচনা করা হবে।

নারীবাদীরা ইসলামের কর্মপদ্ধতিকে কুসংস্কার বলে উড়িয়ে দেয়

জোরালো কণ্ঠ

যেসব নারীবাদী ইসলামের ব্যাখ্যা বা ইসলামি বিভিন্ন গ্রন্থ অধ্যয়নে নিয়োজিত তাদের অন্যতম প্রাথমিক দাবি হলো—পুরুষতন্ত্র ইসলামকে নিজের মতো করে নিয়েছে। এসব নারীবাদীদের মতে, সালাফদের যুগ থেকে আলিমদের সিলসিলা একটি পুরুষ অধ্যুষিত এবং পিতৃতান্ত্রিক পদ্ধতি। তাদের ব্যাখ্যা ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে নারীদেরকে তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে, পুরুষতন্ত্রকে শক্তিশালী করেছে। সামসময়িক অ্যাকাডেমিক ড. শুরুক নাগিব (Dr. Shuruq Naguib) বলেন, 'মুসলিম নারীরা যখন ঐশ্বরিক বাণী শোনার জন্য কুরআনমুখী হয় তখন তারা পুরুষ ব্যাখ্যাকারীদের কণ্ঠ শুনতে পায়। পুরুষদের মধ্যস্থতা ছাড়াই কুরআন শোনা এবং অধ্যয়নের ইচ্ছা থেকেই কিছু মুসলিম নারীবাদী পুরুষের কণ্ঠকে দমন করার পথ বেছে নেয়। একে তারা প্রকৃতপক্ষে সাম্য ও সমতাবাদী আল্লাহর বাণীকে পুনরুদ্ধার করার মিশন বলে মনে করে।'[১২৫]

প্রথমত, কীভাবে পুরুষের কণ্ঠকে দমন করা হবে এবং এর ফলাফল কী দাঁড়াবে তা অস্পষ্ট। কুরআন পড়া না হলে তা নিজে নিজে কথা বলে না। যদি আলিমদের কণ্ঠকে পক্ষপাতদুষ্ট ধরেও নেওয়া হয়, তাহলে কোন যুক্তিতে ধরে নেওয়া হয় যে কেবল নারী কণ্ঠই নিশ্চিতভাবে আল্লাহর আইনের সঠিক ব্যাখ্যা করবে? তার মানে কি সেসকল নারীবাদীরা মনে করেন যে নারীদের কণ্ঠ এবং ব্যাখ্যা পুরুষের তুলনায় শ্রেষ্ঠ? যদি যুক্তি দেওয়া হয় যে নারীদের অধ্যয়নের অনুপস্থিতিতে পুরুষের অধ্যয়ন অসম্পূর্ণ থেকে যায়, তাহলে কী নারীদের অধ্যয়নও একইভাবে অসম্পূর্ণ থেকে যায় না পুরুষের অধ্যয়ন ছাড়া? লিঙ্গ বুদ্ধিবৃত্তিক অঙ্গনে বিকৃতির সৃষ্টি করে—এমন দাবিও সেক্সিস্ট দাবি। ধর্মগ্রন্থ বোঝার জন্য বিশেষ কোনো লিঙ্গ বা ক্রোমোজোমের প্রয়োজন হয় না; বরং এর জন্য প্রয়োজন হয় বুদ্ধি ও জ্ঞানের। এ নারীবাদীরা কীভাবে ইসলামের বুদ্ধিবৃত্তিক ঐতিহ্য থেকে পুরুষের অবদানকে নির্বিচারে বাদ দিতে চায়!

ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত যে ইসলাম জ্ঞানচর্চায় কখনোই ব্যাখ্যাকারীর লিঙ্গকে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করেনি। বরং কেবল ব্যাখ্যার গুণমান এবং যথার্থতার প্রতি সচেতন থেকেছে। উদাহরণস্বরূপ ইসলামের বিস্তৃত ইতিহাস পর্যালোচনায় আমরা অনেক প্রতিভাবান খ্যাতিমান আলিমের পরিচয় পাই যারা ছিলেন নারী।

---

[১২৫] Naguib, Shuruq. *Horizons and Limitations of Muslim Feminist Hermeneutics: Reflections on the Menstruation Verse*, in *New Topics in Feminist Philosophy of Religion*, Pamela Sue Anderson, ed., Springer Netherlands (2010), p. 33.

আর এটা আমাদের জন্য অত্যন্ত গর্বের বিষয়। সামসময়িক আলিম শাইখ আকরাম নদবি কেবল হাদিসশাস্ত্রেই কমপক্ষে আট হাজার মুসলিম নারী আলিমের ঐতিহাসিক ভূমিকা নথিভুক্ত করেছেন।[১২৬] যেহেতু ইসলাম জ্ঞানচর্চায় পুরুষ ও নারীর মধ্যে লিঙ্গভিত্তিক পার্থক্য করে না, তাই নারী-পুরুষ উভয়ই জ্ঞান অর্জনের প্রচেষ্টায় নিয়োজিত ছিল। এমনকি কখনো কখনো একজন নারী আলিমের কাছ থেকে শিক্ষাগ্রহণ করার জন্য অনেক ছাত্র তার বাড়ির বাইরে ভিড় করত। উল্লেখযোগ্য অনেক বিখ্যাত আলিম নারী আলিমের কাছ থেকে শিক্ষাগ্রহণ করেছেন, যেমন ইবনে তাইমিয়্যাহ,[১২৭] আয-যাহাবি,[১২৮] ইমাম শাফিয়ি,[১২৯] ইমাম মালিক,[১৩০] ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল,[১৩১] ইমাম আবু হানিফা,[১৩২] এমনকি খলিফা আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান।[১৩৩] ঐতিহাসিক সূত্রে জানা গেছে যে মধ্য এশিয়ার শহরগুলোতে (তখন 'ট্রান্স অক্সিয়ানা' নামে পরিচিত ছিল), কোনো বাড়ি থেকে কোনো আইনি মতামত বা ফতোয়া তখনই গ্রহণ করা হতো; যদি তাতে গৃহকর্তা এবং তার কন্যা, তার স্ত্রী বা তার বোনের স্বাক্ষর থাকত।[১৩৪]

ইসলাম পুরুষতান্ত্রিক। তাই স্বাভাবিকভাবেই অধিকাংশ উলামায়ে কিরাম ছিলেন পুরুষ। তবে এমন কিছু নারী আলিমাও ছিলেন যারা তাদের আলিম পিতা-স্বামীর থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে আলিমা হয়ে উঠেছিলেন। আবার অনেকে ছিলেন প্রচুর মেধাবী। আল্লাহপ্রদত্ত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেও তারা ইলম অর্জনে সময় দিয়েছিলেন। কিন্তু উম্মাহর অধিকাংশ নারীরা পরিবারেই সময় দিয়েছেন। উম্মুল মুমিনিনরা এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কিন্তু তা সত্ত্বেও উম্মাহর নারীরা বর্তমানের অধিকাংশ পুরুষের চেয়ে অধিক ইলম রাখতেন। আন্দালুস শহরের একটি গল্প বলি।

---

[১২৬] See Nadwi, Sh. Akram. *Al-Muhaddithat: The Women Scholars in Islam*, Interface Publications (2013).

[১২৭] Ibid., p. 99.

[১২৮] Ibid.

[১২৯] Ibn Khallikan. *Wafayat al-A'yan*, Beirut, Dar al-Thaqafa (1968), 5:432-24.

[১৩০] Nadwi, Sh. Akram. *Al-Muhaddithat: The Women Scholars in Islam*, Interface Publications (2013), p. 283.

[১৩১] See Sonbol, Amira El Azhary. *Women of the Jordan: Islam, Labor, and the Law*, Syracuse University Press (2003), p. 65.

[১৩২] Nadwi, Sh. Akram. *Al-Muhaddithat: The Women Scholars in Islam*, Interface Publications (2013), p. 142-43

[১৩৩] Ibid., p. 179

[১৩৪] al-Qurashi, Abd al-Qadir b. Abi al-Wafa. *Al-Jawahir al-Mudiyyah fi Tabaqat al-Hanafiyyah*, Cairo: Hajr li-l-Tiba'ah wa-l-Nashr (1993), Vol. iv, Kitab un-Nisa, pp. 120. Also see Nadwi, Sh. Akram. *Notes for a talk on the women scholars of hadith*, www.interfacepublications.com. Web. 25 Aug. 2014, p. 13.

সেখানের খলিফা তাঁর ছেলের জন্য ইলমদার, ঈমানদার মেয়ে খুঁজতে চেয়েছিলেন। তিনি প্রথমে হাফিজা খুঁজেছিলেন। কিন্তু দেখলেন প্রায় ঘরে ঘরে ছিল হাফিজা। তারপর খুঁজলেন কার মালেকি ফিকহের একটি কিতাব মুখস্থ আছে। আগের মতো না হলেও এবারও পাওয়া গেল অসংখ্য যুবতী।

উপসংহারে তিনি বলেন, 'আমার ভয় হয় যদি আমাদের গোটা উম্মাহকে আজ এমন নারী খুঁজে বের করতে বলা হয় যে কুরআন এবং 'মালিকি ফিকহ'-এর বই মুখস্থ করেছে। জানালার পাশে হয়তো একটি প্রদীপও আমরা জ্বলতে দেখব না। এটা আমাদের উম্মাহর বর্তমান অবস্থা বলে দেয়। এটি একটি সংকেত যে, যখন আমাদের নারীরা শিক্ষিত হয় তখনই উম্মাহ শক্তিশালী হয়। আর পুরুষদের বেলায়, তারা তো বেশিরভাগ সময় শিক্ষিত হয়, কেননা তাদের হতে হয়। যেমন আমাদের সবসময় একজন ইমাম লাগবে। কিন্তু উম্মাহর সত্যিকারের পরীক্ষা হলো মেয়েদের শিক্ষিত করা। [...] না, আমি বলছি না তাকে বিশ্ববিদ্যালয় যেতে হবে এবং আর্টস পড়তে হবে, অ্যাকাউন্টিং পড়তে হবে। আমি ইসলাম সম্পর্কে বলছি, আমি বলছি তাকে ইসলামি হালাকায় যেতে এবং গোটা দ্বীনকে জানতে বলছি। একজন বাবা সবসময় বাসায় থাকেন না, সন্তানের লালনপালনের জন্য মা থাকেন। তিনি যদি দ্বীন সম্পর্কে নাই জানেন, তাহলে তার সন্তানদের কি জানাবেন?'

ইসলামি আইন বা শারিআহর উন্নয়নে নারী আলিমরা সক্রিয় এবং নিঃসন্দেহে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। সেই সাথে ইসলামি আদালত নারীদের ন্যায়বিচার এবং অধিকার নিশ্চিত করার জন্য এতটাই বিখ্যাত ছিল যে বিভিন্ন খিলাফাহর সময় অন্যান্য ধর্মের নারীরাও তাদের মামলাসমূহ ইসলামি আদালতে পেশ করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন।[১৩৫]

ইসলামি বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ এবং প্রসারে লিঙ্গ এতটাই অপ্রাসঙ্গিক ছিল যে এমন দৃষ্টান্তও রয়েছে যেখানে নারী আলিমরা এমন মতামত দিয়েছেন যা নারীদের প্রতিকূলে ছিল। যদিও নারী আলিমদের মতামত বৈধ ছিল, তারপরও পুরুষ আলিমরা বিবেচনা করে গ্রহণযোগ্য বিকল্প এমন মতামত গ্রহণ করতেন যেগুলো নারীদের অধিক অনুকূলে ছিল। উদাহরণস্বরূপ, ফাতিমা বিনতে কায়েস রা. একটি হাদিস বর্ণনা করেন যেখানে রাসুলুল্লাহ মুহাম্মাদ ﷺ তাকে বলেছেন, বিবাহ বিচ্ছেদের পর তার (ফাতিমা) খরচ বহন করার কোনো বাধ্যবাধকতা তার প্রাক্তন

---

[১৩৫] Jenie R. Ebeling, Lynda Garland, Guity Nashat, Eric R. Dursteler. Smith, Bonnie G, ed. "*West Asia*", *The Oxford Encyclopedia of Women in World History*, Oxford University Press (2008).

স্বামীর নেই।[১৩৬] এ ব্যাপারে অনেক আলিম মনে করেন যে, ফাতিমার বিশেষ পরিস্থিতিতে হজরত মুহাম্মদ ﷺ তাকে এই কথা বলেছিলেন। যদিও ফাতিমার বর্ণনার নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে কোনো প্রশ্ন নেই, কিন্তু কৌতূহলোদ্দীপক বিষয় হলো খলিফা উমর ইবনুল খাত্তাব, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, যায়েদ ইবনে সাবিত-সহ আরও অসংখ্য সাহাবি রা., পরবর্তী আলিম এবং ফকিহগণ মনে করতেন যে, তালাকপ্রাপ্তা নারী তার প্রাক্তন স্বামীর কাছ থেকে নিজের রক্ষণাবেক্ষণের খরচ পাওয়ার অধিকার রাখে। তারা এ ব্যাপারে অন্যান্য প্রমাণের ওপর ভিত্তি করে এমন মত দিয়েছেন। নবীপত্নী এবং অসংখ্য হাদিসের বর্ণনাকারী আয়িশা রা. ব্যাখ্যা করেছেন কেন ফাতিমা বিনতে কায়েসকে সেই পরিস্থিতিতে রাসুল ﷺ এমনটা বলেছিলেন। ফাতেমা বিনতে কায়েস জানতেন যে এই হাদিসটি বর্ণনা করলে তিনি অসুবিধার সম্মুখীন হতে পারেন কিন্তু তবুও তিনি আন্তরিকভাবে তা বর্ণনা করেছেন। পুরুষ ফকিহগণ ফাতিমা বিনতে কায়েসের বর্ণনাকে পুরুষদের সুবিধায় কাজে লাগানোর সুযোগ পেয়েছিলেন। যদি তাঁরা আসলেই পুরুষ পক্ষপাতদুষ্ট হতেন তবে সহজেই সকল নারীর ক্ষেত্রে উক্ত মতের প্রয়োগ করতে পারতেন। কিন্তু পুরুষ ফকিহগণ এমন সব মত গ্রহণ করলেন যেগুলো ছিল নারীদের অনুকূলে। নারীবাদীরা কি মনে করে 'নারীবাদী ধর্মতত্ত্বের' মাধ্যমে এমন পুরুষ কণ্ঠগুলোকেও দমন করা দরকার?

মজার বিষয় হলো, এসব মুসলিম নারীবাদীরা কিছু পুরুষকে নিজেদের কাজে লাগায় যাদের কথায় নারীবাদী সুর থাকে; যেমন, কাসিম আমিনের বহুল উদ্ধৃত রচনাসমূহ।[১৩৭] পুরুষ সংস্কারবাদী তাহির আল-হাদ্দাদ, ফজলুর রহমান এবং নাসর আবু জায়েদকে যিবা মির-হোসেইনি বর্ণনা করেছেন ইসলামে নারীবাদী বুদ্ধিবৃত্তির মেরুদণ্ড হিসেবে, যারা সংস্কারবাদী চিন্তাকে এক নতুন পটভূমিতে নিয়ে গিয়েছে।[১৩৮] নারীবাদীরা দাবি করে যে, তারা ইসলামের আলিম পরম্পরা থেকে পুরুষ পক্ষপাতিত্ব দূর করার চেষ্টা করছে। কিন্তু ফলস্বরূপ তারা ইসলামের ইতিহাস থেকে অসংখ্য নারীর ভূমিকাও স্বেচ্ছায় নাকচ করছে যা তা তাদের স্বার্থের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তারা আসলে নারীবাদকে শক্তিশালী করতে চায়, হোক তা নারী কণ্ঠের মাধ্যমে কিংবা পুরুষ কণ্ঠের মাধ্যমে কিংবা আল্লাহর আইনকে বদলে দিয়ে। 'নারীবাদী ধর্মতত্ত্ব' মূলত নির্দিষ্ট কিছু বিষয়কে বাদ দেওয়ার একটি ফিল্টার

---

[১৩৬] See Nadwi, Sh. Akram. *Al-Muhadditthat: The Women Scholars in Islam*, Interface Publications (2013), pp. 5-6.

[১৩৭] For example, Qasim Amin's *The Liberation of Women* (1899).

[১৩৮] Mir-Hosseini, Ziba. *Challenge of Gender Equality* in *Men in Charge? Rethinking Authority in Muslim Legal Tradition*. Ziba Mir-Hosseini, Mulki Al-Sharmani, and Jana Rumminger, ed. Oxford, Oneworld (2015), p. 35.

মাত্র। নারীবাদের কাছে নারী কণ্ঠ বা পুরুষ কণ্ঠ বা যে কণ্ঠের মাধ্যমে আল্লাহর ইচ্ছাকে অনুধাবন করা যায়—এগুলোর কোনোটারই কোনো মূল্য নেই। এরা কখনোই সে দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কথা বলে না। বরং 'নারীবাদী ধর্মতত্ত্ব' হচ্ছে নারীবাদের বুলি আওড়ানো সবচেয়ে জোরালো কণ্ঠ।

সত্যতা

'নারীবাদী ধর্মতত্ত্বের' ধ্বজাধারীরা প্রায়ই বলে যে, ইসলামের কোনো নির্দিষ্ট একক, আদর্শ, চূড়ান্ত এবং বস্তুগত সংস্করণ নেই এবং ইসলামের একটি নির্দিষ্ট সংস্করণ আছে এমনটা ভাবাও বিপজ্জনক, কেননা এটি 'মানুষের নিজস্ব ব্যাখ্যার' বিষয়।[১৩৯] এমন নারীবাদীরা তাদের মতামতকে গুরুত্ববহ করতে 'ইসলাম হলো...', 'কুরআনে বলা আছে...' এমন কথা বলতেও দ্বিধাবোধ করে না।[১৪০] অন্যভাবে বললে, অসংখ্য মুসলিম নারীবাদীর দাবি হলো আল্লাহর ইচ্ছার কোনো নির্দিষ্ট একক ব্যাখ্যা নেই। এ যুক্তি দেখিয়ে তারা ইসলামের একটি নারীবাদী ব্যাখ্যার জন্য জায়গা করতে এবং একে বৈধতা দিতে চায়। কিন্তু এমন যুক্তি মূলত নারীবাদীদের জন্য হিতে বিপরীত হয়ে দাঁড়ায়। কারণ যদি ইসলামের কোনো চূড়ান্ত ব্যাখ্যা না থাকে তাহলে ইসলামের সকল ব্যাখ্যাই সমান বৈধ। এ যুক্তিতে ইসলামের একটি 'নারীবাদী ব্যাখ্যা' যতটা বৈধ, একটি নারীবিদ্বেষী বা পুরুষতান্ত্রিক ব্যাখ্যাও ঠিক ততটাই বৈধ। নারীবাদীরা হয়তো জবাবে বলতে পারে যে অন্যান্যরা এই সুযোগের অপব্যবহার করে নিজেদের ব্যাখ্যাকে নিজেদের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার কাজে লাগিয়েছে, তাই তাদের ব্যাখ্যাকে বৈধতা দেওয়া যাবে না। কিন্তু অসংখ্য নারীবাদীর দাবি অনুযায়ী ইসলামের যদি একক চূড়ান্ত কোনো ব্যাখ্যা না-ই থাকে তাহলে কে নির্ধারণ করবে কারা তাদের ব্যাখ্যায় সৎ এবং কারা নয়? কারই-বা অধিকার আছে অন্যদের নামে এমন অভিযোগ আনার যে তারা ইসলামকে নিজেদের সুবিধায় কাজে লাগিয়েছে?

---

[১৩৯] For example, Kecia Ali describes formulating the *sharī'ah* as "a human product with a human history negotiated in a human context". See Ali, Kecia. *Whose Sharia Is It?*, feminismandreligion.com, 2014. Web. 28 May 2014.

[১৪০] মির হোসেইনি লিখেছেন, 'জনপ্রিয় এবং একাডেমিক ডিসকোর্সে এখনও ইসলামের একক ব্যাখ্যা প্রভাব বিস্তার করে আছে। আমরা প্রায়ই শুনি আলোচনার শুরুতে বলা হয়, 'কোরআন বলছে', 'ইসলাম বলে' বা 'ইসলামি শারিআহ অনুসারে'। যারা এসব বলে তাদের অনেকেই স্বীকার করে না যে, তারা সে নির্দিষ্ট আয়াত বা হাদীসের একটি ব্যাখ্যা নিয়ে বলছে। এর বাইরেও আরও অনেক ব্যাখ্যা আছে। কোরআন পবিত্র বাণী, কিন্তু এ থেকে বের করে আনা আইন মানুষের ব্যাখ্যা।' Mir-Hosseini, Ziba. *Muslim Women's Quest for Equality: Between Islamic Law and Feminism*, Critical Enquiry, Vol. 32, No. 4 (2006), pp. 631-632.

ইসলামকে যেকোনো ব্যাখ্যার জন্য উন্মুক্ত বলে দাবি করাটা ইসলামের সুষ্ঠু এবং পরিশীলিত ধর্মতত্ত্বকে গণকের পাতা পড়ার মতো অস্পষ্ট এবং ভিত্তিহীন বিষয়ের পর্যায়ে নামিয়ে আনে। যে যার মতো ব্যাখ্যা করা শুরু করলে ইসলামের মৌলিক কোনো নীতি থাকে না। এ দাবি নারীবাদের ভিতকেও নড়বড়ে করে দেয়। ফলে নারীবাদের সাথে সন্ত্রাসী, নারীবিদ্বেষী এমনকি ফ্যাসিস্ট মতাদর্শের কোনো পার্থক্য থাকে না। রোরশ্যাক পরীক্ষার (Rorschach test) মতো নারীবাদীরা যদি স্রষ্টার ইচ্ছার ব্যাখ্যাকে ব্যক্তির কল্পনার ওপর ছেড়ে দেয় তাহলে সে ক্ষেত্রে আবারও বলা যায় যে সবচেয়ে জোড়ালো কণ্ঠই জিতবে।

মজার ব্যাপার হলো ইসলামের মতো নারীবাদের কোনো পবিত্র গ্রন্থ নেই, নেই কোনো রীতিনীতি বা অনুশাসন। এমনকি কোনো অনুমোদিত সংস্থাও নেই যারা নির্ধারণ করবে কোনটা সত্যিকারের নারীবাদ এবং কোনটা নয়। ব্যাপারটি যদিও অদ্ভুত কিন্তু এ আলোচনা থেকে এটি পরিষ্কার যে, নারীবাদীরা ইসলামের ক্ষেত্রে যেমনটা দাবি করে নারীবাদ মূলত তার চেয়েও বেশি অসাড়, অস্পষ্ট, বিভ্রান্তিপূর্ণ এবং ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। নারীবাদীদের অবস্থা হলো সে ব্যক্তির মতো যে আপাত ঘোলা জলের মধ্যে দেখার জন্য তার চেয়েও ঘোলা লেন্স ব্যবহার করছে। ঘোলা লেন্স দিয়ে পানির ভেতর দেখার চেষ্টা ব্যর্থই হওয়ার কথা।

কুরআন ইচ্ছামতো ব্যাখ্যা করা যাবে এমন দাবি পুরোপুরি ভিত্তিহীন। কারণ কুরআন নিজেকে স্পষ্ট বা মুবিন হিসেবে আখ্যায়িত করে। কুরআনের অনেক বিষয়ের খুঁটিনাটির ক্ষেত্রে ব্যাখ্যার দুয়ার খুলে দেয়। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, কুরআন এমন ব্যাখ্যার ব্যাপারেও উদার হবে যা কুরআনের স্পষ্ট মূলনীতির সম্পূর্ণ বিপরীতে যায়। অন্যথায় এর অর্থ দাঁড়ায় যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সংবাদদাতা হিসেবে যথেষ্ট যোগ্য নন এবং কুরআনে তিনি তাঁর উদ্দেশ্য সঠিকভাবে প্রকাশ করতে পারেননি। উদাহরণস্বরূপ, কারও এ বিষয়ে দ্বিমত হওয়ার কোনো সুযোগ নেই যে, কুরআন শিরককে সমর্থক করে না কিংবা আমভাবে কুরআন পুরুষদের উত্তরাধিকারসূত্রে সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ দেয় না, বুদ্ধিমত্তায় সে পুরুষ যতই দক্ষ হোক না কেন কুরআনের মূলনীতির বিপরীতে কিছু বলার সুযোগ নেই। সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম বিষয়সমূহ নিয়ে কুরআনে বা হাদিসে আলাদাভাবে বর্ণনা এসেছে। সেগুলোকে ব্যতিক্রম হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এবং সেগুলো কিছু নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে শর্ত সাপেক্ষে কার্যকরী। কুরআনে বেশিরভাগ বিধানই স্পষ্ট, সহজবোধ্য এবং আমভাবে সকল পরিস্থিতিতে তা কার্যকর। খুঁটিনাটি বিষয় কিংবা ব্যতিক্রমগুলো থেকে যেন কোনো প্রকার অস্পষ্টতার সৃষ্টি না হয় তাই সেগুলো স্পষ্ট করে তুলে ধরার জন্য রাসুলের ব্যাখ্যা এবং উদাহরণের ওপর নির্ভর করা হয়।

কোরআন থেকে শিক্ষা নেওয়ার ক্ষেত্রে ইসলামে একটা সুনির্দিষ্ট স্ট্রাকচার আছে। প্রথমত দেখতে হবে রাসুল ﷺ কীভাবে তা ব্যাখ্যা করেছেন। আল্লাহ বলেন,

> 'আমি তোমাদের প্রতি রাসুল পাঠিয়েছি সত্যের সাক্ষ্যরূপে, যেমন সাক্ষ্যরূপে রাসুল পাঠিয়েছিলাম ফিরআউনের প্রতি।' [মুজ্জাম্মিল : ১৫]

অতঃপর প্রথম তিন প্রজন্ম অর্থাৎ সাহাবা, তাবেয়ি (সাহাবিদের ছাত্ররা), তাবে তাবেয়িরা (তাবেয়িদের ছাত্ররা) কীভাবে তা ব্যাখ্যা করেছেন। ইমাম বুখারি (৩৬৫১) ও ইমাম মুসলিম (২৫৩৩) ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :

> 'সর্বোত্তম মানুষ হচ্ছে—আমার প্রজন্ম। এরপর তাদের পরে যারা। এরপর তাদের পরে যারা। অতঃপর এমন কওম আসবে যাদের সাক্ষ্য হলফের পেছনে, হলফ সাক্ষ্যের পেছনে ছোটাছুটি করবে।'

তারপর এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সঠিক আকিদার আলিমদের ব্যাখ্যা।

লক্ষণীয় যে, যেকোনো প্রকার আইনি ব্যাখ্যা প্রদান করার দায়ভার একচেটিয়াভাবে ফকিহদের—এমনটা মানতে অনেক নারীবাদীই নারাজ। কারণ তাদের মতে, এতে করে ফকিহদেরকে ভুলের ঊর্ধ্বে বিবেচনা করা হয়। মূলত কেউই ভুলের ঊর্ধ্বে নয়, সকলেরই ভুল করার প্রবণতা আছে এবং অজ্ঞতা সেই প্রবণতা আরও বাড়িয়ে দেয়। তাই ইসলামের আইনি ব্যাখ্যা প্রদান করার দায়িত্বটা এমন কিছু ব্যক্তির জন্য সংরক্ষিত যাদের এই দায়িত্ব পালনের জন্য ন্যূনতম বুদ্ধিবৃত্তিক যোগ্যতা রয়েছে। যারা কোরআন, হাদিস, ইজমা, কিয়াস, তাহকিক-সহ যাবতীয় বিষয় জেনেশুনে ব্যাখ্যা দিতে পারবেন।

মুসলিম নারীবাদীদের মতে ইসলাম এবং নারীবাদ সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়

'নারীবাদী ধর্মতত্ত্ব' আগে থেকেই ধরে নেয় যে, নারীবাদ এবং ইসলামের মধ্যে কিছু সংগতি বা সামঞ্জস্য রয়েছে। লক্ষণীয় বিষয় হলো, নারীবাদী সংস্কারকগণ নিজেরাই বুঝতে পেরেছে যে, নারীবাদের কিছু কিছু ধারণাকে কেবল ইসলামি গ্রন্থের পুনঃব্যাখ্যার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব নয়। তাই তারা এখন উৎসের (কুরআন এবং হাদিস) ব্যাখ্যা থেকে সরে গিয়ে সরাসরি উৎসকেই প্রশ্ন করা শুরু করেছে। বাস্তবতা হলো, কিছু মানুষ নিজেকে 'মুসলিম নারীবাদী' বলে দাবি করলেই এটা প্রমাণ হয়ে যায় না যে ইসলাম এবং নারীবাদ সামঞ্জস্যপূর্ণ; বরং তাতে প্রমাণ হয় যে মানুষের জ্ঞানে অসংগতি থাকা সম্ভব। মজার বিষয় হলো, এসব নারীবাদীরা প্রতিনিয়ত তাদের কাজের মাধ্যমেই প্রমাণ করে দিচ্ছে যে,

নারীবাদ এবং ইসলাম সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। কেননা নিজেদের আদর্শকে খাপ খাওয়ানোর জন্য তারা ক্রমাগত নিজের মতো করে কোরআনের ব্যাখ্যা করে যাচ্ছে। অর্থাৎ 'নারীবাদী ধর্মতত্ত্বের' বা মুসলিম নারীবাদের গ্রহণযোগ্যতা তো দূরের কথা, এর অস্তিত্বই একটি অসম্ভব ধারণা।

উদাহরণস্বরূপ, আয়েশা চৌধুরী (Ayesha Chaudhry) খোলাখুলিভাবে হাদিসের চেরি-পিকিং বা নিজের পছন্দমতো হাদিস গ্রহণ সমর্থন করেন। তিনি যুক্তি দেখান যে, যেহেতু রাসুল ﷺ একদিক থেকে 'মৌলবাদী, সাম্যবাদী মানুষ' এবং একইসাথে 'একজন পিতৃতান্ত্রিক মানুষ যিনি সপ্তম শতাব্দী আরবে পুরুষতন্ত্রের সাথে স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে জীবনযাপন করেছেন'। একজন মুসলিমের পক্ষে তো আর একইসাথে দুটিই গ্রহণ করা সম্ভব না। তিনি বলেন, 'ইসলামের লিঙ্গ-সমতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে সমর্থনে রাসুলের নির্দিষ্ট কিছু হাদিস ব্যবহার করার মাধ্যমে মুসলিম নারীবাদীরা ঠিক তাই করছে যেমনটা মুসলিম আলিমরা করেছেন পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থনে নববি মানহাজকে ব্যবহার করার মাধ্যমে'।[১৪১] কেসিয়া আলীও (Kecia Ali) যুক্তি দেন যে, সামসময়িক মুসলিমদের সুযোগ রয়েছে হাদিসের নির্দিষ্ট কিছু অংশ গ্রহণ করা যতটুকু সামসময়িক নীতির সাথে কোনোরূপ সংঘাত তৈরি না করে, কিন্তু যখন এটি সে নীতির বিরোধিতা করবে তখন সেই হাদিস প্রত্যাখ্যান করা হবে।[১৪২]

আমরা ইতিমধ্যেই লক্ষ করেছি এই পদ্ধতির ধারাবাহিকতায় এ প্রশ্ন সহজেই ওঠে আসে যে, নারীবাদীদের মতে যদি ইসলামের কোনো একক আদর্শ সংস্করণ না-ই থাকে তাহলে কোন হাদিস গ্রহণ করা হবে এবং কোনটি নয়—তা ঠিক করে দেওয়ার অধিকার কার আছে? আর নিজের ইচ্ছামতো যদি আয়াত, হাদিস গ্রহণ করা হয়; তাহলে কোরআন থেকে কিছু নেওয়ারই-বা কী দরকার? মুসলিম নারীবাদীরা হয়তো জবাবে বলতে পারে যে, নারীবাদের এমন পাঠের মাধ্যমে তারা ইসলামের কোনো নির্দিষ্ট ব্যাখ্যা চাপিয়ে দেয় না; বরং কেবল একটি আলোচনা জনসমক্ষে নিয়ে আসে। এমন থট এক্সপেরিমেন্টের কার্যকারিতা খুবই সীমিত এবং ক্ষতি খুব বেশি। চৌধুরীর মতো নারীবাদীরা বলে যে, রাসুল ﷺ লিঙ্গ-সমতা

---

[১৪১] Chaudhry, Ayesha S. *Producing Gender-Egalitarian Islamic Law – A Case Study of Guardianship (Wilayah) in Prophetic Practice* in *Men in Charge? Rethinking Authority in Muslim Legal Tradition*. Ziba Mir-Hosseini, Mulki Al-Sharmani, and Jana Rumminger, ed. Oxford, Oneworld (2015), p. 93.

[১৪২] Ali, Kecia. *"A Beautiful Example": The Prophet Muhammad as a Model for Muslim Husbands*, Islamic Studies 43 (2) (2004), pp. 273-91. See also Clarke, Lynda. *Hijab According to the Hadith Text and Interpretation* in *The Muslim Veil in North America: Issues and Debates*. Sajida Sultana Alvi, Homa Hoodfar, and Sheila McDonough, ed. Toronto, Women's Press (2003), pp. 214-286.

প্রতিষ্ঠার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু 'তাঁর জীবদ্দশায় এই মিশন তিনি পূরণ করে যেতে পারেননি'। অন্যভাবে বললে, চৌধুরীর মতে রাসুল ﷺ যে বিশেষ মিশনকে পূরণ করার স্বপ্ন দেখেছিলেন তা বাস্তবায়ন করা মুসলিম নারীবাদীদের দায়িত্ব। এটা স্পষ্টতই স্রষ্টার ইচ্ছা অনুধাবনের ধর্মতাত্ত্বিক পদ্ধতির সীমানার বাইরে। এটি আলোচনা কম এবং নিছক বেয়াদবি বলে বেশি মনে হচ্ছে।

মালয়েশিয়ার নারীবাদী সংগঠন সিস্টার্স ইন ইসলামের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা আমিনা ওয়াদুদের মতে, কুরআনে বর্ণিত স্পষ্ট যেসব আয়াতের বিকল্প ব্যাখ্যা নারীবাদীরা খুঁজে পাচ্ছেন না, সেসকল আয়াতকে প্রত্যাখ্যান করা উচিত। তিনি বলেন, 'ব্যক্তিগতভাবে, আমি এমন কিছু আয়াত পেয়েছি যেগুলো অর্থ প্রকাশে অপর্যাপ্ত কিংবা অগ্রহণযোগ্য, যদিও সেসবের ওপর অনেক ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে।' তিনি আরও বলেন, যেখানে ঐশী বাণী হিসেবে কুরআনের বিশেষ কিছু বক্তব্য সমস্যাযুক্ত মনে হবে—'সেখানে সুযোগ রয়েছে কুরআনের বক্তব্যকে প্রত্যাখ্যান করার, জবাব দেওয়ার, এমনকি 'না বলার'।'[১৪৩] ওমাইমা আবু বকর ব্যাখ্যা দিয়েছেন, 'পূর্বে গবেষকরা প্রসঙ্গ কাঠামো হিসেবে কুরআনের সাধারণ 'নীতির' প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে এ সমস্যাটি সমাধান করার চেষ্টা করেছেন। ওয়াদুদ এ ইস্যুটিকে অন্য মাত্রায় নিয়ে গিয়েছেন। তার মতে, কুরআনের 'আক্ষরিক অর্থ' একটি বড় সমস্যাই রয়ে গেছে, এখন এ সমস্যার সাথে লড়াই বন্ধ করার সময় এসেছে।' তিনি আরও বিশ্লেষণ করেন, 'কুরআনের আক্ষরিক অর্থ যখন আমাদের প্রগতিশীল বিকাশ এবং উন্নয়নের বিপরীতে যাবে তখন ওয়াদুদের দৃষ্টিভঙ্গি সে সমস্যা নিরসনে সহায়ক মাধ্যম হিসেবে কাজ করবে'।[১৪৪] আলী আরও বলেন, 'ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য কুরআন নিজেই মুসলিমদেরকে কখনো কখনো এর আক্ষরিক বিধান থেকে দূরে সরে যেতে বাধ্য করে'।[১৪৫]

নারীবাদীরা ক্রমাগত ইসলামের পরিবর্তনের দাবি তুলে। যার কারণে এটাই বারবার প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম এবং নারীবাদীদের সহাবস্থান কখনোই সম্ভব নয়। যেখানে 'নারীবাদী ধর্মতত্ত্বের' অসাড়তার প্রমাণ স্পষ্ট, সেখানে মুসলমানদের জন্য তা কার্যকর কি-না সে প্রশ্নই অযৌক্তিক।

---

[১৪৩] Wadud, Amina. *Inside the Gender Jihad*, Oxford, Oneworld (2006), p. 209.

[১৪৪] Abou-Bakr, Omaima. *The Interpretive Legacy of Qiwamah as an Exegetical Construct* in *Men in Charge? Rethinking Authority in Muslim Legal Tradition.* Ziba Mir-Hosseini, Mulki Al-Sharmani, and Jana Rumminger, ed. Oxford, Oneworld (2015), pp. 60-61

[১৪৫] Ali, Kecia. *Sexual Ethics and Islam: Feminist Reflections on Qur'an, Hadith, and Jurisprudence,* Oxford, Oneworld (2006), p. 55

নারীবাদীরা ধর্মতত্ত্ব অধ্যয়ন করে কেবল তাদের ধারণাকে প্রমাণ করার জন্য

নৈতিকতা

ধর্মতত্ত্ব হলো আল্লাহর ইচ্ছার অধ্যয়ন, মানুষের নয়। এই অধ্যয়নের উদ্দেশ্য হলো, নির্ভুলতা এবং সত্য। এই উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য অধ্যয়নকারীকে কুসংস্কার, পূর্বের আদর্শ বা এজেন্ডা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা জরুরি।

নারীবাদীরা নির্দিষ্ট কিছু পূর্ব ধারণা নিয়ে ধর্মতত্ত্ব অধ্যয়ন করে। যার কারণে ধর্মতত্ত্ব অধ্যয়ন কঠিন হয়ে পড়েছে। স্রষ্টার ইচ্ছা অধ্যয়নে অবশ্যই নৈতিকতার ব্যাপারেও স্রষ্টার ইচ্ছাই শেষ কথা। কেননা নৈতিকতার উৎপত্তি হয় একটি সত্য আদর্শ থেকে। যদি সকল নৈতিকতা মানুষের সহজাত হতো, তাহলে নৈতিকতার ব্যাপারে মানুষের মধ্যে মতানৈক্য থাকত না। সে ক্ষেত্রে বিচার ব্যবস্থার প্রয়োজনই হতো না। যদি সব মানুষ প্রকৃত নৈতিকতা অনুধাবন করতে পারত; তবে কোনো মতাদর্শগত পার্থক্য তৈরি হতো না, এমনকি ওহিও প্রয়োজন হতো না।

নারীবাদীদের নৈতিকতা নির্ধারণের মাপকাঠি বস্তুনিষ্ঠ নয়; বরং ইসলামের বস্তুনিষ্ঠ সত্যের বাইরে। উদাহরণস্বরূপ, আসমা বারলাস প্রকাশ্যে বলেছেন যে কুরআনের শিক্ষা 'নৈতিক ও সাম্যবাদী' কিনা তা নির্ধারণ করার জন্য তিনি সাম্যবাদ ও ন্যায়বিচার সম্পর্কে কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গিকে নারীবাদী তত্ত্বের সাথে তুলনা করে দেখেন।[১৪৬] মীর-হোসেইনি বলেছেন,

> 'মুসলিম সংস্কারবাদী চিন্তাবিদরা মুসলিম আইন এবং মৌলিক নীতিমালাকে ন্যায়বিচার এবং লিঙ্গ সম্পর্কিত আধুনিকতাবাদী ধারণার সাথে সমন্বয় করার চেষ্টা করেছেন।'[১৪৭]

---

[১৪৬] আসমা বারলাস বলেন, 'কোরআনের শিক্ষা নিয়ে অধ্যয়ন করতে গেলে প্রশ্ন আসেই, ইসলামের কোন ব্যাখ্যাটা আমরা আমাদের জন্য গ্রহণ করব? কোরআন থেকেই কোরআনের ব্যাখ্যা নেব? পুরুষতন্ত্র কিংবা নারীবাদী নাকি মিশেল কোনো ব্যাখ্যা? কোন ব্যাখ্যাটি বেশি নৈতিক এবং প্রাসঙ্গিক হবে? বিভিন্ন গ্রুপ বিভিন্ন দাবি করায় উত্তর কঠিন হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ, যারা কোরআনের সাম্যবাদি ব্যাখ্যা করে, অর্থাৎ নারী-পুরুষ, সব মানুষ সমান চিন্তা থেকে ব্যাখ্যা, তারা একে প্রগতিশীল মনে করে। আবার যারা কোরআনের ব্যাখ্যা দেখে পশ্চিমা আদর্শের চোখ দিয়ে তাদের কাছে কোরআনকে জুলুমবাজ মনে হয়। [...] আমার নিজের ব্যাখ্যা হলো দুটোর মিশেল। আমি একই সাথে কোরআনের সাম্যবাদি ও ন্যায়বিচারের ব্যাখ্যাকে গ্রহণ করি [...] আমি আধুনিক ও নারীবাদী জায়গা থেকে কোরআনকে দেখি। এভাবেই আমি কোরআন পড়া শুরু করি, তারপর কোরআন থেকে যুক্তি বের করি"। Barlas, Asma. *"Believing Women" in Islam*, Austin, University of Texas Press (2002), p. 169

[১৪৭] Mir-Hosseini, Ziba. *Challenge of Gender Equality* in *Men in Charge? Rethinking Authority in Muslim Legal Tradition*. Ziba Mir-Hosseini, Mulki Al-Sharmani, and Jana Rumminger, ed. Oxford, Oneworld (2015), pp. 17-18

অন্যরা মানবাধিকারের পশ্চিমা ধারণাকে নিজেদের দর্শন হিসেবে বিবেচনা করে, আর বাকিরা 'সামসময়িক রীতিনীতিকে' নৈতিকতার মানদণ্ড হিসেবে ব্যবহার করে।

নারীবাদীরা যে হতাশা অনুভব করে সে সম্পর্কে ওয়াদুদ কথা বলেছেন। ওয়াদুদ পরামর্শ দেন যে তাদেরকে ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে নারীবাদের পক্ষে কথা বলার ভান করতে হবে, সরাসরি সেক্যুলার লিবারেলের দৃষ্টিকোণ থেকে নয়। তিনি লিখেছেন, সিস্টার্স ইন ইসলামের নির্বাহী পরিচালক জাইনাহ আনোয়ার একবার জিজ্ঞেস করেছিলেন, আমরা দাবি করি যে আমরা একটি জেন্ডার ইনক্লুসিভ ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে কাজ করি, এর পরিবর্তে কেন আমরা বলতে পারি না যে আমরা মানবাধিকারের দৃষ্টিকোণ থেকে লিঙ্গীয় ন্যায়বিচারের জন্য কাজ করি? সত্যি বলতে আমি তার হতাশা বুঝতে পারি।[১৪৮] বস্তুত এসব নারীবাদীরা কেবল ইসলামের ব্যাখ্যাকারী বা পুনর্ব্যাখ্যাকারী হিসেবেই নয়, এমনকি ইসলামের অভ্যন্তরে সেক্যুলার লিবারেলিজমের অনুপ্রবেশ ঘটাতেও পর্দার আড়াল থেকে কাজ করে যাচ্ছে।

ক্ল্যাসিক্যাল ইসলামি ধ্যান-ধারণাকে পুনরুজ্জীবিত করার পরিবর্তে নারীবাদীরা ইসলামি শাসনব্যবস্থা এবং ন্যায়বিচারে সুরক্ষা থেকে মুসলিমদের দূরে সরিয়ে নিচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে, মুসলিম-সমাজকে ঔপনিবেশিক শাসনের বিধ্বংসী প্রভাব থেকে মুক্ত করার পরিবর্তে নারীবাদীরা ঔপনিবেশিক প্রকল্পকে বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে পশ্চিমা বিভিন্ন আদর্শ পুশ করে যাচ্ছে। মুসলিমদেরকে সেক্যুলার লিবারেলিজমের দিকে আকর্ষণ করতে কুরআনকে ঠিক সেভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে যেভাবে অন্যান্য ধর্মের মিশনারিরা কুরআন ব্যবহার করে মুসলিমদেরকে অন্য ধর্মে ধর্মান্তরিত করত। একে 'উট পদ্ধতি' বলা হয়।

ঔপনিবেশিক শাসনের প্রভাব আজও মুসলিম বিশ্বে প্রকট। 'নারীবাদী ধর্মতত্ত্ব' সেই একই মতাদর্শ সমর্থন করে যা মুসলিম বিশ্বের এই অবস্থার জন্য দায়ী। তাই মুসলিম বিশ্বে এর কোনো প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। বরং এদেরকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করা দরকার।

ব্যক্তিত্ববাদ (Individualism)

নারীবাদীদের ধারণ করা লিবারেল নীতির একটি হলো ব্যক্তিবাদ অর্থাৎ নিজের ইচ্ছাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া। যেসব নারীবাদীরা দাবি করে যে ইসলাম পুরুষের

---

[১৪৮] Wadud, Amina. *Inside the Gender Jihad*, Oxford, Oneworld (2006), p. 191

প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট, তারা ব্যাখ্যা করতে পারে না কেন ইসলামে একজন নারীকে তার স্বামীর সময়, অর্থ, এমনকি তার শরীরের ওপর অধিকার দেওয়া হয়েছে। এবং ইসলামের উত্তরাধিকার, স্বামী-স্ত্রীর দায়িত্বসমূহ, পারিবারিক নেতৃত্ব এবং শালীনতার বিধানকেও এরা মেনে নিতে পারে না।

ইসলামি আইন স্বীকার করে যে মানুষ প্রকৃতপক্ষে কোনো দ্বীপ নয়; আমরা নিজেরা নিজেদের জন্ম দিই না, নিজেরা নিজেদের লালনপালন করতে পারি না, নিজে থেকে ভাষা বা যোগাযোগের মাধ্যম শিখতে পারি না। অন্যদের ও পরিবেশের ওপর নির্ভরশীল না হয়ে আমরা চলতে পারি না। ইসলাম নারী ও পুরুষের মধ্যে পারস্পরিক অধিকার এবং কর্তব্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মানুষের পারস্পরিক নির্ভরশীলতাকে সহজ করার চেষ্টা করে। সমাজের কোনো সদস্যকে সুবিধা দেওয়া হলে সেই সাথে আসে জবাবদিহিতা এবং দায়িত্ব। ইসলামে মানুষের নানাবিধ দুর্বলতাকে অধিকারের মাধ্যমে পুষিয়ে দেওয়া হয়। ইসলামে নেতৃত্ব কিংবা ক্ষমতাকে অন্বেষণ করাকে কোনো মহৎ গুণ হিসেবে বিবেচনা করা হয় না। কারণ ইসলামে এটিকে সম্মান বা সুবিধার বদলে একে জবাবদিহিতা এবং দায়িত্বের অবস্থান বলে বিবেচনা করা হয়। আর এভাবেই ভূমিকা যা-ই হোক না কেন সমাজের প্রতিটি মানুষের মধ্যে সমতা বজায় থাকে।

কুরআনে আল্লাহ তাআলা তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন যারা নিজেদের স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করে।[১৪৯] তিনি উদাহরণ হিসেবে বলেছেন, পরকালে মানুষকে 'উম্মাহ' তথা জাতি হিসেবে অভিহিত করে তাদের কৃতকর্মের জন্য জবাবদিহি করা হবে।[১৫০] এবং অন্যায়কারীরা আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান অবস্থায় একে অপরের সাথে তর্ক করবে এবং পরস্পরকে দোষারোপ করবে।[১৫১] কুরআন বলে পুনরুত্থান দিবসে কেউ কেবল নিজের পাপের বোঝাই নয় বরং সাথে যাদেরকে সে পথভ্রষ্ট হতে উৎসাহিত করেছিল তাদের বোঝাও বহন করতে হবে।[১৫২]

---

[১৪৯] "কখনো নয়, নিশ্চয় মানুষ সীমালঙ্ঘন করে থাকে। কেননা সে নিজকে মনে করে স্বয়ংসম্পূর্ণ।" আল-কোরআন (৯৬:৬-৭)

[১৫০] "আর তুমি প্রতিটি জাতিকে দেখবে ভয়ে নতজানু; প্রত্যেক জাতিকে স্বীয় আমলনামার দিকে আহ্বান করা হবে। (এবং বলা হবে) 'তোমরা যে আমল করতে আজ তার প্রতিদান দেওয়া হবে'।" আল-কোরআন (৪৫:২৮)

[১৫১] "কাফিরগণ বলে, আমরা এ কুরআনে কক্ষনো বিশ্বাস করব না, আর তার আগের কিতাবগুলোতেও না। তুমি যদি দেখতে! যখন জালিমদেরকে তাদের প্রতিপালকের সম্মুখে দাঁড় করানো হবে, তখন তারা পরস্পর বাদানুবাদ করবে। যাদেরকে দুর্বল করে রাখা হয়েছিল তারা দাম্ভিকদেরকে বলবে— তোমরা না থাকলে আমরা অবশ্যই মুমিন হতাম।" আল-কোরআন (৩৪:৩১)

[১৫২] "আর অবশ্যই তারা বহন করবে তাদের বোঝা এবং তাদের বোঝার সাথে আরও কিছু বোঝা। আর তারা কিয়ামতের দিন অবশ্যই জিজ্ঞাসিত হবে সে সম্পর্কে, যা তারা মিথ্যা বানাত।" আল-

এই নারীবাদীদের মতে ইসলামের নবীগণকে যখন নবুয়তের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, তখন তারা কতটা 'স্বাধীন' ছিলেন। এই নারীবাদীদের মতে মারইয়াম আ. কতটা 'স্বাধীন' ছিল যখন তাকে তার গর্ভে ঈসা আ.-কে ধারণ করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল।

নারীবাদ সমস্যা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ইসলামের নানা ব্যাখ্যাকে সমর্থন করে, কিন্তু এটি শারিআয় বিদ্যমান আন্তঃসম্পর্ক এবং ভারসাম্যকে উপলব্ধি করতে দারুণভাবে ব্যর্থ। রাসুল ﷺ বলেছেন,

> 'তোমাদের প্রত্যেকেই একেকজন রাখাল। আর তোমাদের প্রত্যেককে তোমাদের পাল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। একজন শাসকও একজন রাখাল এবং তাকে তার পাল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। প্রত্যেক পুরুষ একজন রাখাল, তাকে তার পরিবার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। প্রত্যেক নারী তার স্বামীর ঘর ও সন্তানদের রক্ষক। এভাবে তোমাদের প্রত্যেকেই একেকজন রাখাল এবং প্রত্যেককে তার মেষপাল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।'[১৫৩]

ইসলামে যখন একজন শাসককে জনগণের ওপর কর্তৃত্ব দেওয়া হয়, তখন তাকে সার্বভৌমত্ব দেওয়া হয় না এবং সে যা ইচ্ছা তা করতে পারে না। সার্বভৌমত্ব তো কেবল আল্লাহর। প্রদত্ত কর্তৃত্বের সাথে আসে আল্লাহর আইন বাস্তবায়নের দায়িত্ব। যখন একজন পুরুষকে তার পরিবারের ওপর কর্তৃত্ব দেওয়া হয়, তখন তাকে সার্বভৌমত্ব দেওয়া হয় না, সে যা ইচ্ছা তা করতে পারে না। সার্বভৌমত্ব কেবল আল্লাহর। প্রদত্ত কর্তৃত্বের সাথে আসে আল্লাহর আইন বাস্তবায়নের দায়িত্ব। কর্তৃত্বের যেকোনো ক্ষেত্রে, দায়বদ্ধতা থাকার জন্য কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই থাকতে হবে।

নারীবাদীরা পুরুষের কর্তৃত্বের বিরোধিতা করে এবং নারীর ক্ষমতা বৃদ্ধির পক্ষে কথা বলে। ওয়াদুদ, বারলাস এবং ফাতিমা মারনিসি বিভিন্নভাবে যুক্তি দেখিয়েছেন যে, ইসলাম নারী নেতৃত্বে কোনো বাধা দেয় না, এমনকি পরিবারে নারী-পুরুষ উভয়ের সমান কর্তৃত্ব থাকতে পারে। নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে পুরুষের নারীর ওপর কর্তৃত্বশীল হওয়াটা নারীর জন্য অসম্মানের এবং অপদস্ত হওয়ার সামিল। শারিআহ অনুযায়ী একজন স্ত্রী সকল ক্ষেত্রে তার স্বামীর আনুগত্য করবে যদি না সে তাকে (স্ত্রী) কোনো হারাম কাজ করতে বলে। ওয়াদুদ এবং আসমা

কোরআন (২৯:১৩) 'এতে করে তারা কিয়ামতের দিনে নিজদের পাপের বোঝা পুরোটাই বহন করবে এবং তাদের পাপের বোঝাও যাদেরকে তারা অজ্ঞতা হেতু পথভ্রষ্ট করে। তারা যা বহন করবে, তা কতই-না নিকৃষ্ট!'—আল-কোরআন (১৬:২৫)

[১৫৩] Narrated by Abdullah Ibn Mas'ud (Sahih Bukhari and Muslim)

ল্যামরাবেটের মতে ইসলামের এ আদেশ তাওহিদের সাথে সাংঘর্ষিক। তারা দাবি করে যে এমনটা করলে "আনুগত্য শুধু আল্লাহর জন্য"—তাওহিদের এ দাবির বিরোধিতা করা হয়।[১৫৪] স্বামীর আনুগত্য করা যদি শিরকের সমতুল্য হয়; তবে একজন ছেলের তার মায়ের আনুগত্য করাও শিরকের সমতুল্য, নাগরিক হিসেবে আইনের প্রতি আনুগত্য করাও হবে শিরকের সমতুল্য, এমনকি একজন মুসলিম হিসেবে হজরত মুহাম্মাদের ﷺ আনুগত্য করাও হবে শিরক অথচ কুরআনে রাসুলের আনুগত্য করার স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

নারীবাদীরা কুরআনের ব্যাখ্যায় মুসাওয়াহ'র (সমতা) ধারণাকে অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করে। এর মাধ্যমে তারা পশ্চিমা সাম্যের সংজ্ঞার সাথে কুরআনের সামঞ্জস্য স্থাপন করতে চায়। মজার ব্যাপার হলো, কুরআনে শুধু বিশ্বাস এবং অবিশ্বাসের মতো দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য বোঝানোর জন্যই কেবল মুসাওয়াহ কিংবা এর উদ্ভূত শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়েছে। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাইকে একই রকম বিধান, নিয়ামাহ কিংবা পরীক্ষা দেওয়া হবে—কুরআন এমনটা কখনোই বলা হয়নি। বরং কুরআনে বলা হয়েছে পরকালে মানুষকে কর্মের ভিত্তিতে আলাদা মর্যাদা দেওয়া হবে এবং আলাদাভাবে পুরস্কৃত করা হবে। কুরআনে প্রতিটি মানুষকে ন্যায়বিচারের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এমন অবাস্তব সাম্যের কথা বলা হয়নি যা নারী-পুরুষের মধ্যকার সুস্পষ্ট পার্থক্যকে পুরোপুরি অস্বীকার করে।

'নারীবাদী ধর্মতত্ত্ব' মূলত এমনসব ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত যেগুলোকে নারীবাদীরা আগে থেকেই সত্য বলে ধরে নিয়েছে। মুসলিম নারীবাদ আসলে নারীবাদ-ই। এ কারণে দেখা যায় নারীবাদীরা আল্লাহর ইচ্ছা অনুসরণের চেয়ে মুসলিম নারীবাদের পক্ষে ব্যাখ্যা বের করতে বেশি উদ্গ্রীব থাকে।

উপসংহার

যদি ধর্মতত্ত্বের উদ্দেশ্য হয় আল্লাহর ইচ্ছা সম্পর্কে জানা; তবে সেখানে 'নারীবাদী ধর্মতত্ত্বের' উদ্দেশ্য হলো, নারীবাদীদের ইচ্ছা এবং ধার করা কিছু আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করা। বস্তুত প্রতিকার হিসেবে 'নারীবাদী ধর্মতত্ত্বের' কোনো গ্রহণযোগ্যতাই নেই। নারীবাদ কোনোভাবেই ইসলাম নয়, মুসলিম নারীবাদও নয়। ইসলাম বাদে সবই

---

[১৫৪] See Lamrabet, Asma. *An Egalitarian Reading of the Concepts of Khilafah, Wilayah, and Qiwamah* in *Men in Charge? Rethinking Authority in Muslim Legal Tradition.* Ziba Mir-Hosseini, Mulki Al-Sharmani, and Jana Rumminger, ed. Oxford, Oneworld (2015), p. 81. Also see Wadud, Amina. *Islam Beyond Patriarchy through Gender Inclusive Qur'anic Analysis*, in *Wanted: Equality and Justice in the Muslim Family.* Zainah Anwar, ed. Pataling Jaya, Musawah (2009), pp.95-110.

জাহিলিয়াহ। ইসলামি ধর্মতত্ত্বের প্রতি এর প্রতিক্রিয়া দুটি হলো : প্রথমত, নারীবাদীরা ইসলামের কর্মপদ্ধতিকে কুসংস্কার বলে বা হেয় করে। দ্বিতীয়ত, নারীবাদীরা ধর্মতত্ত্বে নিজেদের পছন্দের জিনিস খোঁজে। অর্থাৎ আগে থেকেই তারা কোনটি ঠিক তা ধরে নেয়। সব বাদ দিয়ে কেবল 'উদ্দেশ্য' দেখলেই নারীবাদী ধর্মতত্ত্বের কিংবা মুসলিম নারীবাদের অসাড়তা প্রমাণ হয়ে যায়। মুসলিম বিশ্বে এর কোনো প্রয়োজন নেই।

> 'তোমাদের কী হলো? তোমরা কেমন ফায়সালা দিচ্ছ? তোমাদের কি কোনো কিতাব আছে, যা তোমরা পাঠ করো? তাতে তোমরা যা পছন্দ কর, তাই পাও?' [কুরআন, ৬৮: ৩৬-৩৮][১৫৫]

[১৫৫] আন্তর্জাতিক বক্তা ও লেখিকা জারা ফারিসের নিজস্ব ওয়েবসাইটে প্রকাশিত *'Do Muslims Need a Feminist Theology?'* অনুবাদ।

পশ্চিমা নারীবাদের মুখোমুখি অটোম্যান নারী

> ‘এখানে প্রতিদিনই নারীদেরকে দৈনন্দিন কাজকর্মের প্রয়োজনে রাস্তায় চলাচল করতে দেখা যায়। হয়তো সংখ্যাটা পুরুষের তুলনায় বেশি হবে না।... আমি এমন কোনো দেশ দেখিনি, যেখানকার নারীরা তুরস্কের নারীদের মতো এতটা স্বাধীনতা ভোগ করে। তাদেরকে কোনো প্রকার অবমাননার শিকার হতে হয় না।... নারীর প্রতি তুর্কিদের উদারতা অন্য সব জাতির জন্য আদর্শ হওয়া উচিত।... আমি সত্যিই মনে করি পৃথিবীর অন্য কোনো নারী এখানকার নারীদের মতো স্বাধীনতা অর্জন করতে পারেনি। তাদেরকে কোনো প্রকার হয়রানির আশঙ্কায় থাকতে হয় না। এখানের নারীরা হয়তো নিজেদেরকে পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মানুষ ভেবে গভীরভাবে শ্বাস নেয়।’—লেডি এলিজাবেথ ক্র্যাভেন, A Journey Through The Crimea To Constantinople, ১৭৮৯.[১৫৬]

লেডি এলিজাবেথ ক্র্যাভেন ছিলেন আঠারো শতকের একজন পর্যটক, নাট্যকার, এবং লেখিকা। অটোম্যান খিলাফতের শাসনামলে তিনি তুরস্ক ভ্রমণ করেছিলেন। ১৭৮৯ সালে সেখানকার নারীদের সম্পর্কে তিনি এ পর্যবেক্ষণ লিখেছিলেন, অর্থাৎ ইউরোপে তখনও নারীবাদের জন্ম হয়নি। মেরি ওয়েস্টনক্র্যাফ্টের বিখ্যাত বই *A Vindication of the Rights of Woman* (১৭৯২) প্রকাশিত হয় আরও তিন বছর পরে। তাঁর তিনশ পৃষ্ঠার এ বইটি হয়ে উঠেছিল আধুনিক নারীবাদ প্রতিষ্ঠার ভিত্তি এবং ঘোষণাপত্র।

লেডি এলিজাবেথ ক্র্যাভেন-সহ অন্যান্য অনেকের পর্যবেক্ষণ থেকে পরিষ্কারভাবেই বলা যায়, অটোম্যান খিলাফতের অধীনে থাকা নারীরা পশ্চিমা নারীদের তুলনায় অনেক বেশি স্বাধীন ছিল। তাদের সুরক্ষার দায়িত্ব ছিল স্বয়ং রাষ্ট্রের। সে সময়ের আদালতের কার্যক্রম, আর্থিক লেনদেন এবং রাজনৈতিক কার্যকলাপের চিত্র থেকেই আমরা দেখতে পাই নারীর অধিকার রক্ষায় অটোম্যান খিলাফত কতটা সক্রিয় ছিল। উল্লেখ্য, নারীর স্বাধীনতা অর্জনের জন্য তখন

---

[১৫৬] Elizabeth Craven (Baroness), *A Journey Through the Crimea to Constantinople: In a Series of Letters from the Right Honourable Elizabeth Lady Craven to His Serene Highness The Margrave of Brandebourg, Anspach, and Bareith*, London.

নারীবাদ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন পরেনি। অথচ কত সহজেই-না নারীবাদীরা আজ মুসলিমদেরকে বোকা বানাচ্ছে!

ইসলামের কারণেই নাকি মুসলিম নারীরা সবসময় তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে। হলিউডের মুভির মতো 'নারীবাদ' যেন ত্রাতা হয়ে এসেছে মুসলিম নারীদেরকে এসব বৈষম্য থেকে মুক্ত করতে। অথচ এ প্রবন্ধটি ১৯২৪ সাল পর্যন্ত টিকে থাকা ইসলামি খিলাফতের অধীনে থাকা নারীদের অধিকার, স্বাধীনতা এবং জীবনের সাথে নারীবাদের জনক পশ্চিমা নারীদের তুলনামূলক আলোচনা। অটোম্যান খিলাফতের ইতিহাস খুব বেশি দিন আগের নয়। খিলাফতের ইতিহাস পর্যালোচনা করলেই দেখা যায় অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য মুসলিম নারীদের নারীবাদের দারস্থ হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। বরং তাদের প্রয়োজন একটি সুগঠিত খিলাফত।

মুসলিম রাষ্ট্র বনাম ইসলামি রাষ্ট্র

মূল আলোচনা শুরুর আগে মুসলিম রাষ্ট্র এবং ইসলামি রাষ্ট্রের সংজ্ঞা ও তাদের মধ্যকার পার্থক্য বুঝে নেওয়া জরুরি। অটোম্যান খিলাফত ছিল একটা ইসলামি রাষ্ট্র। অর্থাৎ ইসলামি শরিআহ ছিল রাষ্ট্র পরিচালনার একমাত্র মানদণ্ড এবং সর্বোচ্চ আইনের উৎস। ছয়শ বছরেরও বেশি সময় ধরে অর্থাৎ বিশ শতকের শুরুর দিকে খিলাফতের পতনের আগ পর্যন্ত তারা ইসলামি শরিআহ অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করেছে। শরিআহর ভিত্তিতেই অটোম্যানদের অধীনস্থ সমস্ত নাগরিকের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ-সহ দৈনন্দিন জীবনের সরকারি এবং ব্যক্তিগত সবকিছু পরিচালিত হতো। শরিআহই সে সময় আফ্রিকা, ইউরোপ, এশিয়ার সমস্ত নারীদের অধিকার, নিরাপত্তা সুরক্ষিত করতে সক্ষম হয়েছিল। এসব নারীদের সবাই যে মুসলিম ছিল তা নয়; বরং ইহুদি, খ্রিষ্টান, গ্রিক, আনাতোলিয়ান, বলকান উপদ্বীপের নারীরাও ছিল।

পাকিস্তান, বাংলাদেশ, তুরস্ক এবং মধ্যপ্রাচ্যের বেশিরভাগ মুসলিম দেশই ইসলামি রাষ্ট্র না। তারা শুধু শরিআহ লঙ্ঘন করে এমন না; বরং ধর্মনিরপেক্ষতাকে নিজের আদর্শ মনে করে এবং সংবিধানে ইসলামকে ঔপনিবেশিক পরবর্তী সময়ের অন্যতম একটি উৎস বলে আখ্যা দেয়। এ দেশগুলোর সরকার চরম মাত্রায় দুর্নীতিগ্রস্ত, সাধারণ জনগণ অত্যাচারে জর্জরিত। এসব দেশকে কোনোভাবেই একটি ইসলামি রাষ্ট্র হিসেবে বিবেচনা করা যায় না। এসব দেশে বসবাসরত সাধারণ মুসলিমরা শুধু একটি ইসলামি শরিআহ-ভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই এ জুলুমতন্ত্র থেকে মুক্ত হতে পারবে।

বৈধ মর্যাদা

পশ্চিমে নারীরা বিয়ের সাথে সাথে নিজস্ব স্বকীয়তা হারিয়ে ফেলত। এমনকি তাদেরকে নিজের নামটি পর্যন্ত হারাতে হতো। নারীরা আদালতে কোনো মামলা দায়ের করার অধিকার রাখত না। তাদের স্বামীদের তাদের পক্ষ থেকে মামলা লড়তে হতো। ইংল্যান্ড এবং বেশিরভাগ ইংরেজি ভাষাভাষী দেশে coverture নীতি অনুসরণ করা হতো। এ নীতি অনুসারে নারীদের মূল্যায়ন করা হতো তাদের বৈবাহিক অবস্থা অনুসারে। একজন বিবাহিত নারীর নিজস্ব কোনো সত্তা ছিল না। স্বামীর পরিচয়ই ছিল তার পরিচয়। সবাই তাদেরকে কেবল feme covert বলে জানত (কিংবা 'বিবাহিত নারী' অথবা 'covered' নারী)। পশ্চিমে দ্বাদশ শতাব্দী থেকে ১৯ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত এ নীতি প্রচলিত ছিল। অথচ একই সময়ে অটোম্যান খিলাফতের অধীনে অসংখ্য মুসলিম-অমুসলিম নারীর ছিল যথাযথ অধিকার, নিরাপত্তা এবং স্বাধীনতা।

> 'বিয়ের পর আইন অনুসারে স্বামী-স্ত্রীকে একক সত্তা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অর্থাৎ বিয়ে মানেই সে নারীর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব, আইনত অস্তিত্ব হারিয়ে যাওয়া। স্বামী ছাড়া সে নারীর সরকারি, সামাজিকভাবে আর কোনো পরিচয় নেই। স্বামীর আওতায় থেকেই যেকোনো ধরনের কাজ করতে সে বাধ্য...।'
>
> —উইলিয়াম ব্ল্যাকস্টোন, আঠারো শতকের ইংরেজ আইনবিদ এবং বিচারক, coverture এর ব্যাখ্যায়।[১৫৭]

Coverture হলো দুধারি তলোয়ার। নারী-পুরুষ উভয়ের জীবনই এতে ক্ষতিগ্রস্ত হতো। এ নীতি অনুসারে স্ত্রীর স্বাধীন ইচ্ছা, অধিকার এবং দায়িত্ব অস্বীকার করা হতো। একটি উদাহরণ দিলে পরিষ্কার হবে। কোনো নারীর নিজে বাদী হয়ে মামলা দায়ের করার অধিকার ছিল না। তার স্বামীর নামে তাকে মামলা দায়ের করতে হতো। স্বামীর জন্য এ নিয়ম সুখকর ছিল না। কেউ যদি কোনো নারীর বিরুদ্ধে মামলা করতে চায়, সেটা করতে হবে সে নারীর স্বামীর বিরুদ্ধে! স্বামীর কাছে স্ত্রীর এমন জবাবদিহিতার বিষয়টিকে নিয়ে ইংরেজি অনেক সাহিত্যে স্যাটায়ার করা হয়েছে। চার্লস ডিকেন্সের বিখ্যাত বই *Oliver Twist* এর একটি চরিত্র ছিল মিস্টার বাম্বল। তাকে বলা হলো, 'আইন অনুসারে আপনার স্ত্রী আপনার অধীনে কাজ করেছে।' উত্তরে মিস্টার বাম্বল বলেছিলেন, "যদি আইন এমনটাই মনে করে, তাহলে আইন শুধু গাধা না, বোকাও। সত্যিই যদি আইনের চোখে এমন

---

[১৫৭] William Blackstone, *Commentaries on the Laws of England* (Vol. 1, 1765, pages 442-445)

কিছু ধরা দেয়, তাহলে আইন অবিবাহিত। আইনের জন্য আমার বদদোয়া রইল, শীঘ্রই যেন তাঁর চোখ খুলে যায়। অভিজ্ঞতা ছাড়া ঠুলি খোলা যায় না।”[১৫৮]

Coverture এর সম্পর্ক ছিল সাধারণ জনগণের সাথে, কোনো অপরাধী এবং অপরাধের সাথে নয়। ইংল্যান্ড এবং আমেরিকার উপনিবেশগুলো তখনো দেশদ্রোহিতা ও জাদুর অপরাধে নারীদের পুড়িয়ে মারত। ১৭৮৪ সাল পর্যন্ত এ অনাচার চলে এসেছে।[১৫৯] যদিও Coverture নাগরিক আইনের সাথে সংশ্লিষ্ট, ব্যতিক্রমও আছে। ১৯৭২ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দুটি অঙ্গরাজ্যে আইন করা হয় যে, অভিযুক্ত নারীরা নিজের অপরাধের আত্মপক্ষ সমর্থনে যদি দাবি করে যে তারা আসলে তাদের স্বামীর আদেশ মেনেছে, সেটা তাঁর পক্ষে আদালতে গ্রহণ করা হবে।[১৬০]

এদিকে অটোম্যান খিলাফতে বিবাহিত বা অবিবাহিত—যেকোনো অবস্থাতেই নারীরা তাদের সব নৈতিক এবং বৈধ অধিকার পেত। অমুসলিম নারীরাও এর বাইরে ছিল না। যার ফলে অমুসলিম নারীরা তাদের নিজস্ব ধর্মীয় আদালতের চেয়ে ইসলামি শরিআহ-ভিত্তিক আদালতে অভিযোগ করতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করত।

অটোম্যান খিলাফতে বয়ঃসন্ধিতে উপনীত হওয়ার পর নারীরা পুরুষের মতোই রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে বিবেচিত হতো। ইসলামি শরিআহ অনুসারে তাদের নিজস্ব পরিচয় ছিল। মৌলিক মানবাধিকারের ক্ষেত্রে তাদের বৈবাহিক অবস্থা কোনো প্রভাব ফেলত না।[১৬১] মুসলিম নারীরা বিয়ের পরেও নিজের বংশপরিচয় বহাল রাখত। গর্বের সাথেই তারা নিজের পরিচয় বহাল রাখত, পরিবার-সমাজে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করত।

অন্যান্য সকল প্রকার বৈধ অধিকারের পাশাপাশি নারীরা চাইলে সহজেই স্থানীয় বিচারকের কাছে অভিযোগ করতে পারত, নিজেদের অধিকার দাবি করতে পারত। তাদেরকে কোনো প্রকার বৈষম্যের শিকার হতে হতো না। অধিকার ভোগে তারা ছিল পুরোপুরি স্বাধীন। এসব অধিকার আদায়ের জন্য তাদের কোনো পুরুষ আত্মীয়ের সাহায্যেরও প্রয়োজন হতো না। নারীরা প্রয়োজনে তাদের স্বামী এবং আত্মীয়দের বিরুদ্ধেও আইনি ব্যবস্থা নিতে পারত। প্রায় সব ক্ষেত্রেই বিচারক

---

[১৫৮] Charles Dickens, *Oliver Twist*, 1838, chapter 51

[১৫৯]www.capitalpunishmentuk.org/burning.html

[১৬০] *The Law: Up from Coverture*, Time Magazine, published Monday, March 20, 1972, accessed at http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,942533,00.html

[১৬১] Jenie R. Ebeling, Lynda Garland, Guity Nashat, Eric R. Dursteler "West Asia" The Oxford Encyclopedia of Women in World History. Ed Bonnie G. Smith. Oxford University Press, 2008. Brigham Young University (BYU). 1 November 2010

নারীর সকল প্রকার বৈধ আইনি অধিকার নিশ্চিত করতেন।[১৬২]

প্রকৃতপক্ষে ইসলামি রাষ্ট্রের আদালত সবসময়ই নারীদের সমস্যা, ট্রেন্ডিং ইস্যুর ওপর নজর রাখত, সমাধানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করত। এমনকি অমুসলিম নারীরাও খিলাফতের অধীনস্থ এসব আদালতে অভিযোগ করতে বেশি পছন্দ করত। অথচ অটোমান সাম্রাজ্যে তাদের আলাদা আদালত ছিল এবং সে আদালতগুলো পরিচালিত হতো তাদের ধর্মীয় আইন অনুসারেই। প্রতিটি সম্প্রদায় তাদের নিজস্ব ধর্মীয় রীতিনীতি এবং সাংস্কৃতিক কার্যক্রম পালন করতে পারত। কোনো প্রকার বাধা বিপত্তি ছাড়াই। প্রত্যেকে তাদের ধর্মীয় গুরুর নেতৃত্বে তাদের আচার অনুষ্ঠান, উত্তরাধিকার আইন, সংস্কৃতি স্বাধীনভাবে পালন করত।[১৬৩]

অর্থনৈতিক নিশ্চয়তা

পশ্চিমা নারীদের বিয়ের পর নিজস্ব সম্পদ বলে আর কিছু থাকত না। তাদের স্বামীরা তাদের সুরক্ষার দায়িত্ব নিত। স্ত্রীর ঋণ স্বামীকেই পরিশোধ করতে হতো। Coverture অনুসারে স্বামী এবং স্ত্রী একক দেহ ও সত্তা হিসেবে বিবেচিত হতো। ফলে স্ত্রী তার নিজস্ব সম্পত্তির ওপর নিয়ন্ত্রণ হারাত এবং স্বামী স্ত্রীর অনুমতি ছাড়াই সম্পত্তির অধিকার ভোগ করত। এ ক্ষেত্রে স্ত্রীর কিছু বলার থাকত না। (বিয়ের আগে অন্য চুক্তি হলে ভিন্ন কথা।)

একজন নারীর চুক্তিবদ্ধ হওয়ারও কোনো অধিকার ছিল না। উনিশ শতকে শর্তসাপেক্ষে নারীকে নিজের সম্পত্তি নিষ্পত্তির অধিকার দেওয়া হয়েছিল। শর্তের মধ্যে একটি ছিল স্বামীর অনুমতি। তারপর নারীকে একটি 'প্রাইভেট পরীক্ষা' দিতে হতো। সে পরীক্ষায় বিচারক নারীকে তার স্বামীর অনুপস্থিতিতে পরীক্ষা করত। তার ওপর স্বামীর পক্ষ থেকে কোনো প্রকার চাপ প্রয়োগ করা হয়েছে কিনা তা জেনে নেওয়া হতো। এ প্রক্রিয়ায় তারা ভীষণ আত্মতুষ্টিতে ভুগত। মনে করত, এভাবে বিবাহিত নারীর অধিকার রক্ষা হয়ে গিয়েছে। অথচ এ সবগুলো প্রক্রিয়া ছিল নারীর নিজের সম্পদ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকারের জন্য!

আইনের দৃষ্টিতে যেহেতু স্বামী-স্ত্রীকে একই ব্যক্তি হিসাবে গণ্য করা হতো, সেহেতু স্বামী, স্ত্রীর ভরণপোষণের দায়িত্ব নিতে বাধ্য ছিল। কোনো মহিলা যদি ঋণগ্রস্ত অবস্থাতেই বিয়ে করত কিংবা বিয়ের পর ঋণ গ্রহণ করত তবে; তার স্বামীকেই সে ঋণ পরিশোধ করতে হতো—স্ত্রীকে নয়।

---

[১৬২] Ebeling, Garland, Nashat, and Dursteler

[১৬৩] Colin Imber, *The Ottoman Empire, 1300-1650: The Structure of Power,* New York: Palgrave Macmillan, 2002

ব্রিটেনে ১৮৭০ সালে 'বিবাহিত নারীর সম্পত্তি আইন' পাশ হলে নারীরা সম্পত্তি কেনা-বেচার অধিকার, মামলা দায়ের করতে পারার অধিকার এবং নিজের ঋণের জন্য দায়বদ্ধ হওয়ার অধিকার লাভ করে। এর আগপর্যন্ত পশ্চিমা নারীরা এসব অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল।

এদিকে, অটোমান খিলাফতের নারীরা সবসময় অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী এবং সক্রিয় ছিল। কিছু কিছু শিল্পে নারীরা এতটাই একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করেছিল যে গিল্ডসদের তাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় সাহায্য নিতে হয়েছিল।

> 'পশ্চিমে তুর্কি স্ত্রীদের দাসী এবং সম্পত্তি মনে করা হয়। এমন ধারণা সর্বৈব মিথ্যা। প্রকৃতপক্ষে, এখানকার নারীদের আইনি মর্যাদা ইউরোপের বেশিরভাগ নারীর তুলনায় অনেক গুণ বেশি। ইউরোপের নারীরাই বরং সম্পত্তির মতো ছিল। এখানে একজন নারী তাঁর নিজস্ব সম্পত্তির ব্যবহার, নিষ্পত্তি এবং উত্তরাধিকার নির্ধারণের পূর্ণ অধিকার রাখে। বিয়ের কারণে কিছুই বদলে যায় না। সে চাইলে সম্পত্তি তাঁর জীবদ্দশায় কাউকে দিয়ে দিতে পারে, উইল করতে পারে। আইনের দৃষ্টিতে সে একজন স্বাধীন এজেন্ট হিসেবে বিবেচিত। সে তার স্বামীর অনুমতি ছাড়াই আদালতে মামলা করতে পারে এবং এ ক্ষেত্রে সে সম্পূর্ণ স্বাধীন। এসব ক্ষেত্রে একজন অটোম্যান নারী তার খ্রিষ্টান বোনদের চেয়ে অনেক বেশি স্বাধীনতা ভোগ করে।'
>
> —জেড ডেকেট ফেরিম্যান, ১৯১১

অটোম্যান খিলাফতে নারীরা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখত। তাদের অনেকে ছিলেন জমি ও সামরিক কেল্লার মালিক, ঋণদাতা, ঋণগ্রহীতা, ব্যবসার মালিক-সহ অনেক কিছুই। অটোম্যান খিলাফতের শাসনামলে বিভিন্ন শ্রেণির নারীর ব্যবসা এবং লেনদেনের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকাটা খুবই সাধারণ ব্যাপার ছিল।[১৬৪]

ইতিহাস বলে, অটোম্যান খিলাফতে উচ্চ বংশীয় নারীরা সাধারণত কঠোরভাবে পর্দা মেনে চলত। তারা পুরুষদের সাথে ব্যবসা পরিচালনা করতেন না। বিদেশি পর্যবেক্ষকদের কাছে সেসব সম্ভ্রান্ত নারীদের পুরুষের সামনে না আসাটা স্বাভাবিক ছিল না। তারা ভাবত নারীরা বুঝি বাধ্য হয়ে পুরুষ কর্মচারী কিংবা এজেন্ট নিয়োগ করে। তারা অটোম্যান নারীদেরকে দেখত সহানুভূতির দৃষ্টিতে, ভাবত তারা কোনো

---

[১৬৪] Mehrdad Kia, *Daily Life in The Ottoman Empire*, Greenwood, 2011

না কোনোভাবে নির্যাতিত।[১৬৫] প্রোপাগান্ডার তোড়ে তারা ভুলে যেত, এ 'নির্যাতিত' নারীরাই ছিলেন এত সম্পদ, বিভিন্ন ব্যবসা ও প্রতিষ্ঠানের মালিক। পশ্চিমা গবেষকরা অবাক হয়ে ভাবত, এত কিছু থাকা সত্ত্বেও কীভাবে তারা সবার চোখের অন্তরালে থেকে যাচ্ছেন! স্থাপত্য শিল্পেও এসব উচ্চবিত্ত নারীরা অবদান রেখেছেন।

অটোম্যান খিলাফতের নারীরা কারুশিল্প, রেশমশিল্প এবং তাঁতশিল্পে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। মসুলের প্রায় নারীর বাড়িতেই তাঁতশিল্পের কাজের জন্য একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ সময় বরাদ্দ থাকত। এটি ছিল অন্যতম বৃহত্তম একটি শিল্প। একপর্যায়ে এ শিল্পে নারীদের একচেটিয়া আধিপত্য তৈরি হয়। একসময় তাঁত গিল্ডসরা বাধ্য হয়ে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ কামনা করে।[১৬৬]

অটোম্যান নারীরা সম্পদ দান করার ব্যাপারে ছিলেন বেশ উদার। আঠারো শতকে সব শ্রেণির অটোম্যান নারীরা মিলে খিলাফতের ২০-৩০% দাতব্য সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। একে ইসলামি পরিভাষায় 'ওয়াকফ' বলে। খিলাফতের অধীনে থাকা সকল অঞ্চলে জনকল্যাণে তারা তাদের ব্যক্তিগত অর্থ খরচ করে স্কুল, হাসপাতাল, স্নানাগার, ঝরনা, রান্নাঘর, ছাত্রাবাস, মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন।[১৬৭]

রাজনৈতিক অংশগ্রহণ

ব্রিটেনে ১৯২৮ সালের আগপর্যন্ত নারী-পুরুষ কারোই সার্বজনীনভাবে ভোট দেওয়ার অধিকার ছিল না। তখন ব্রিটেনে শুধু অত্যধিক ধনী, প্রভাবশালী ব্যক্তিরাই ভোট দিতে পারতেন। অর্থাৎ নারী-পুরুষের একটি বিশালসংখ্যক জনগোষ্ঠী এ অধিকার থেকে বঞ্চিত হতো। ১৯১৮ সাল থেকে প্রথম একুশ বছরের ঊর্ধ্বে পুরুষ এবং ত্রিশ বছরের ঊর্ধ্বে নারীরা ভোট দেওয়া শুরু করে। একুশ বছরের ঊর্ধ্বের সকল নারী-পুরুষ ভোট দেওয়ার অধিকার অর্জন করে ১৯২৮ সালে।

এদিকে, অটোম্যান খিলাফাতে নারী-পুরুষকে রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় হতে হতো। অটোম্যান খিলাফতে ঠিক পুরুষের মতোই নারীরাও 'ডিভানে' পিটিশন দিতে পারত। ডিভান হলো একটি কাউন্সিল যেখানে শুরা সদস্যরা দেশের রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করতেন। নারী-পুরুষ উভয়ই খলিফার হাতে বাইয়াত নিত। বাইয়াত হলো আনুগত্যের শপথ, ভোটের মাধ্যমে ম্যান্ডেট দেওয়ার মতো।

---

[১৬৫] Kia, M.
[১৬৬] Ebeling, Garland, Nashat, and Dursteler
[১৬৭] Ibid

নারী-পুরুষের সামাজিক বিভাজন সবচেয়ে বেশি দেখা যেত উচ্চ শ্রেণির পরিবারগুলোতে। কিন্তু কম আদর্শিক হওয়া ও অর্থনৈতিক টানাপোড়েনের কারণে নিম্নবিত্ত নারীরা ছিলেন কাজের দিক থেকে তুলনামূলক সক্রিয়। তাই তারা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে বেশি জড়িত ছিলেন।[১৬৮] যার কারণে ইউরোপীয়রা অটোম্যান উচ্চ শ্রেণির নারীদেরকে নিপীড়িত মনে করত। বাস্তবতা হলো, ষোলো শতকের শেষের দিকে অটোম্যান সাম্রাজ্যকে বলা হতো 'নারীদের সুলতানিয়্যাত'। সে সময়ে সুলতানদের মায়েরা এবং রাজবংশের অন্যান্য রক্ষণশীল নারীরা হেরেমের পর্দার আড়ালে থেকেও ক্রমান্বয়ে প্রচণ্ড শক্তিশালী এবং প্রভাবশালী হয়ে উঠেছিলেন। হারেমকে ইসলাম কখনোই বৈধতা দেয় না। তবে সেসময় সুলতানিয়্যাতে নারীদের যে ভূমিকা দেখা যায় তাতেই জোরালোভাবে প্রমাণ হয় যে, পর্দার আড়ালে থাকার মানেই নিপীড়ন নয়।

সামাজিক জীবন

পশ্চিমে পুরুষ বা নারী, কারোরই ডিভোর্সের অধিকার বলে কিছু ছিল না। আর যদি আইনগতভাবে ছাড়াছাড়ি করার মতো যথেষ্ট পয়সা থাকে, তাহলে তো ছাড়াছাড়ি হলোই। একবার ছাড়াছাড়ির পর আবার বিয়ে করাটা ওদের জন্য ঠিক মৃত্যুদণ্ডের মতোই ছিল ভয়ানক একটা অবস্থা।

পশ্চিমা-সমাজে ১৮৫৭ সালে বিবাহ-সংক্রান্ত আইন (Matrimonial Causes Act of ১৮৫৭) প্রকাশিত হওয়ার আগপর্যন্ত বিবাহবিচ্ছেদ বৈধ ছিল না। এর আগে কেউ বৈধভাবে বিচ্ছেদ চাইলে তাকে কঠিন আইনি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হতো। কিংবা একটি প্রাইভেট অ্যাক্টের শরণাপন্ন হতে হতো (বিষয়টিকে কেন্দ্র করে হাউজ অফ কমন্সে নারী-পুরুষের একান্ত ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে দীর্ঘদিন প্রকাশ্য বিতর্ক হয়েছে)। আর এ দুটো প্রক্রিয়াই ছিল ব্যয়বহুল। কাজেই শুধু ধনীরাই বৈধভাবে বিবাহবিচ্ছেদ করার সুযোগ পেত।

শুধু তাই নয়, ডিভোর্সপ্রাপ্ত নারী-পুরুষের নতুন করে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার অধিকার ছিল না। এমন বিয়ে প্রথম নিষিদ্ধ করে চার্চ। পরবর্তী সময়ে ১৬০৪ সালে একে আইনে রূপ দেওয়া হয় ও এভাবে বিয়েকে মৃত্যুদণ্ডযোগ্য শাস্তি বলে ঘোষণা করা হয়।[১৬৯]

অটোম্যান খিলাফতে বহুবিবাহ এবং বিবাহবিচ্ছেদ—দুটোই ছিল অপ্রতুল।

---

[১৬৮] Ibid

[১৬৯] Bernard Capp, *Bigamous Marriage in Early Modern England*, University of Warwick, 2009

বিবাহবিচ্ছেদের অধিকার নারী-পুরুষ উভয়ের ছিল। যখন কোনোভাবেই স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক টিকিয়ে রাখা সম্ভব হতো না; কেবল তখনই কোনো দম্পতি এ পথে এগোতেন। সর্বশেষ উপায় হিসেবে তারা বিবাহবিচ্ছেদকে বেছে নিতেন।

জার্মান প্রোটেস্ট্যান্ট মন্ত্রী স্যামোন শোয়েগার ষোলো শতকের শেষের দিকে অটোম্যান সাম্রাজ্য ভ্রমণ করে বলেছিলেন, '০তুর্কি পুরুষরা দেশ শাসন করে এবং তাদেরকে শাসন করে তাদের স্ত্রীরা। তুর্কি নারীরা অন্য যেকোনো নারীর চেয়ে বেশি স্বাধীনভাবে চলাফেরা করে এবং সবচেয়ে বেশি সুযোগসুবিধা ভোগ করে। তাদের মধ্যে বহুবিবাহের প্রচলন নেই। হয়তো তারা চেষ্টা করেছিল এ প্রথাকে জনপ্রিয় করে তোলার, কিন্তু অত্যধিক সমস্যা এবং অর্থের দিকে তাকিয়ে বিষয়টি সামাজিকভাবে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেনি। (কিন্তু তা সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য ছিল)'

অটোম্যান সমাজব্যবস্থায় পরিবারের গুরুত্ব ছিল অনেক। অধিকাংশ বাবা-মাই তাদের সন্তানদের বিয়ের ব্যাপারে ছিলেন খুব সচেতন। কোনো কারণে পাত্র পছন্দ না হলে প্রত্যাখ্যান করার অধিকার নারীদের ছিল। বিবাহের পূর্বে নারীরা পুরুষদের তাদের প্রয়োজনমতো বিভিন্ন শর্ত দিতে পারত। এটা অস্বাভাবিক কিছু ছিল না। শরিআহর আইন অনুসারে বহুবিবাহের অনুমতি ছিল, কিন্তু বাস্তবে বহুবিবাহের হার ছিল খুবই কম। শতকরা পঁচানব্বই জনেরই ছিল একজন করে স্ত্রী।[১৭০]

অটোম্যান ফকিহরা বিয়েকে দেখত নারী-পুরুষের মধ্যকার ভালোবাসা ও বোঝাপড়ার সম্পর্ক হিসেবে, কোনো অধিকারের লড়াই হিসেবে না। তারা স্বামী-স্ত্রীকে একে অপরের পরিপূরক হিসেবে বিবেচনা করতেন।[১৭১] উদাহরণস্বরূপ, একজন মুসলিম বিবাহিত নারীর কর্তব্য হলো, তিনি সর্বাবস্থায় স্বামীর আনুগত্য করবেন যতক্ষণ না স্বামী তাকে হারাম কিছু করতে কিংবা আল্লাহর অবাধ্যতা করতে নির্দেশ দেন। সেসময়কার নারীদের আইনি অধিকার, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ স্পষ্টতই প্রমাণ করে যে মুসলিম পুরুষরা তাদের স্ত্রীদের প্রতি কতটা সৌহার্দপূর্ণ আচরণ করতেন। তারা স্ত্রীদের ওপর মাত্রাতিরিক্ত কিছু কখনো চাপিয়ে দিতেন না। অন্যদিকে শরিআহর দৃষ্টিতে নারী এবং শিশুদের আর্থিক দায়িত্ব যেহেতু পুরুষের, বিবাহবিচ্ছেদের ক্ষেত্রে একজন পুরুষের পদ্ধতি ছিল একজন নারীর চেয়ে আলাদা। যদিও উভয়েরই বিবাহবিচ্ছেদ দাবি করার একটি নির্দিষ্ট পন্থা ছিল। বাস্তবে, অটোম্যান খিলাফতকালে বিচারব্যবস্থা বিবাহবিচ্ছেদের ক্ষেত্রে নারীদের ব্যাপারে বেশ নমনীয় ছিল। বিশেষ করে নারীর অসম্মতিতে যে বিয়ে ঠিক করা হয় সে ক্ষেত্রে। আঠারো শতকে ইস্তাম্বুলে নারীরা

---

[১৭০] Ebeling, Garland, Nashat, and Dursteler
[১৭১] Kia, M.

অস্বাভাবিক মাত্রায় বিবাহবিচ্ছেদের আবেদন করছিলেন। বিষয়টি সামাজিক পর্যবেক্ষকদের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। পরিবার হলো কিছু মানুষের বন্ধন, সম্পর্কের নাম। বিবাহবিচ্ছেদ সবসময় কষ্টের বিষয়, কে করল সেটা জরুরি না। তবুও নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য বিবাহবিচ্ছেদের রাস্তা খোলা ছিল।[১৭২]

গ্রহণযোগ্য কারণ ছাড়া বিবাহবিচ্ছেদের অনুমতি দেওয়া হতো না। যেমন : পারস্পরিক অসামঞ্জস্যতা, অর্থনৈতিক সমস্যা, দাম্পত্য কলহ, শারীরিক নির্যাতন, ব্যভিচার। অনেক সময় স্বামী-স্ত্রী পরিবারে তাদের মৌলিক ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হলে তাকেও গ্রহণযোগ্য কারণ হিসেবে গণ্য করা হতো। আবার কখনো-বা স্ত্রীর স্বামীর বাড়ি পছন্দ না হলে স্ত্রীই বিবাহবিচ্ছেদের পদক্ষেপ নিত। পুত্রসন্তানের জন্ম না হলে কিছু স্বামীকেও এমন সিদ্ধান্ত নিতে দেখা যেত।[১৭৩] বিবাহবিচ্ছেদের পর নারী পুরুষ উভয়েই স্বাধীনভাবে বিয়ের অধিকার রাখত। অটোম্যান খিলাফতের অধীনে থাকা অনেক নারীর ধর্ম কিংবা ঐতিহ্য সাধারণত তাদেরকে বিবাহবিচ্ছেদের অনুমতি দিত না। সে ক্ষেত্রে তারা ইসলাম গ্রহণকে দেখতেন বিষাক্ত দাম্পত্যজীবন থেকে মুক্তির রাস্তা হিসেবে।

মুসলিম নারীদের কি ফেমিনিজম প্রয়োজন?

অটোম্যান সাম্রাজ্য সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে দেয় যে, একজন মুসলিম নারীর আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত অধিকার ভোগ করতে নারীবাদের দারস্থ হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। এ খিলাফত কেবল মুসলিম নারী-পুরুষের অধিকার রক্ষা এবং তাদের সুরক্ষার ব্যবস্থা করেই ক্ষান্ত হয়নি; বরং খিলাফতের অধীনস্থ বিভিন্ন সংস্কৃতি ও ধর্মের প্রত্যেক অমুসলিমের সুরক্ষাও নিশ্চিত করেছিল। অনেক আগ থেকেই ইসলাম নারী-পুরুষের অধিকার, ন্যায়বিচার নিশ্চিত করেছে। ইসলামই আমাদের আদর্শ। ইসলামের এ সমৃদ্ধি পশ্চিমে নারীবাদের জন্মের পরেও বিশ শতক পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। ন্যায়বিচার এবং অধিকার পেতে এনলাইটেনমেন্ট পরবর্তী পাশ্চাত্যের নারীদের মতো মুসলিম নারীদের কখনো প্যাচ ওয়ার্ক করতে হয়নি। কিংবা তাদেরকে লিঙ্গের ব্যাপারে পক্ষপাতদুষ্ট কোনো সমাধান অর্থাৎ নারীবাদ খোঁজার প্রয়োজন হয়নি। ইসলামি রাষ্ট্র ছিল তাদের অধিকারের রক্ষাকবচ। পাশ্চাত্যের নারীদের নারীবাদ প্রতিষ্ঠা করতে হয়েছে। কেননা তাদের কাছে ইসলাম নেই। কিন্তু আমাদের কাছে ইসলাম আছে। কাজেই আমাদের নিজেদের যে প্রশ্নটি করা উচিত, যেখানে সৃষ্টির শুরু থেকে আজ পর্যন্ত প্রতিটি

---

[১৭২] Ebeling, Garland, Nashat, and Dursteler

[১৭৩] Justin McCarthy, *The Ottoman Turks: An Introductory History to 1923* (London, New York: Wesley Longman Limited, 1997)

মুসলিম নারী তাঁর সব রকমের অধিকার ইসলামে খুঁজে পেয়েছে, সেখানে কীভাবে কোনো মুসলিম নারীর মুক্তির জন্য নারীবাদের প্রয়োজন হতে পারে?[১৭৪]

[১৭৪] আন্তর্জাতিক বক্তা ও লেখিকা জারা ফারিসের নিজস্ব ওয়েবসাইটে প্রকাশিত *'Ottoman Women During the Advent of Western Feminism'* প্রবন্ধ অবলম্বনে।

লিঙ্গ ভারসাম্য :
আল্লাহর পরিকল্পনার প্রতি আত্মসমর্পণ

সমাজবিজ্ঞানী পল আমাটো (Paul Amato) বিশ শতকে সংঘঠিত পারিবারিক পরিবর্তনগুলো নিয়ে একটি গবেষণা পরিচালনা করেন।[১৭৫] গবেষণায় বলা হয়, এসব পরিবর্তনের মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদ বা ডিভোর্স হচ্ছে সবচেয়ে বেশি নাটকীয় এবং একইসাথে এর প্রভাবও সবচেয়ে বেশি সুদূরপ্রসারী। বিবাহবিচ্ছেদের শিকার বেশিরভাগ পরিবারের শিশুই দুর্বল আত্মসম্মান, দুশ্চিন্তা এবং বিষণ্ণতায় ভোগে। পিতামাতার সাথে তাদের পর্যাপ্ত যোগাযোগের অভাব থাকে। তাদের জীবনযাত্রার মান হ্রাস পায়। পরবর্তী জীবনে তাদের পিতামাতার সাথে সম্পর্কে চিড় ধরে। এমনকি তাদের নিজেদের দাম্পত্যজীবনেও নানা কলহের সৃষ্টি হয় এবং বিবাহবিচ্ছেদের সম্ভাবনা থাকে অনেক বেশি।

আমাদের নৈতিক দায়িত্ব থেকে বিষয়টিকে সততার সাথে দেখব এবং সব ক্ষেত্রে সঠিক পদক্ষেপ নেব। দু-তিনটি বিবাহবিচ্ছেদের ঘটনায় চিন্তার তেমন কোনো কারণ নেই। কিন্তু যখন বিবাহবিচ্ছেদের সংখ্যাটা ক্রমাগত বেড়েই চলছে, তখন এ বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করা আবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একক পরিবার। এই পরিবারেরই পদস্খলন যখন মহামারির আকার ধারণ করে[১৭৬] তখন সমাজের সবাইকে এক বিরাট ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। ইনশাআল্লাহ, এই সমস্যা সমাধানের প্রয়াসে আমি ইসলামের বিশ্বদর্শন থেকে বর্তমান মুসলিমদের মধ্যকার জেন্ডার ডাইনামিক্সের দিকে আলোকপাত করব।

সঠিক ফ্রেমওয়ার্ক

ইদানীংকালে লিঙ্গ এবং এ সম্পর্কিত বিষয়ে আমাদের আলোচনাগুলো বিভ্রান্তি এবং ভুল বোঝাবুঝিতে পরিপূর্ণ; এই বিষয়টি আমরা অস্বীকার করতে পারব না। মোটাদাগে এর মূল কারণ হলো, বিপরীত বিশ্বদর্শন : ইসলাম এবং সেক্যুলার

---

[১৭৫] https://www.jstor.org/stable/1566735?seq=1

[১৭৬] https://www.soundvision.com/article/divorce-among-american-muslims-statistics-challenges-solutions

লিবারেলিজম।[১৭৭] ইয়াকিন ইন্সটিটিউট এ বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছে,

> 'সামসময়িক আন্দোলনগুলোর আদর্শিক ভিত্তি অনেকাংশেই ইসলামি শরিআহর সাথে সাংঘর্ষিক। আর দুঃখজনকভাবে তরুণ প্রজন্ম এ বিষয়টি বুঝতে ব্যর্থ হয়। তারা এসবের দিকে আকৃষ্ট হয় ক্ষমতায়নের লোভে।'[১৭৮]

বর্তমানে নারীবাদ এবং লিঙ্গ-সমতার মতো সেক্যুলার মতাদর্শগুলো মুসলিম তরুণদের মধ্যে এত মারাত্মকভাবে প্রবেশ করেছে যে, বেশিরভাগ তরুণই এসব ফ্রেইমওয়ার্কের বাইরে থেকে বিষয়গুলো চিন্তা করতে পারে না। অমুসলিমদের মতো আমরা মুসলিমরাও আজ পশ্চিমের স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রিকে বস্তুনিষ্ঠ সত্যের প্রশ্নাতীত উৎস হিসেবে বিবেচনা করতে শুরু করেছি। সেখানকার অধ্যাপকরা সত্যের দিশারি, জ্ঞানের আধার হিসেবে বিবেচিত হয়। অনেকে বৈরাগ্যবাদী (Stoic) হিসেবে প্রশংসিত হয়, আবার কিছু ব্যক্তি সামাজিক ন্যায়বিচারের মূর্তপ্রতীক হয়ে ওঠে।

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা যে সেক্যুলার দর্শন এবং রাজনৈতিক মতাদর্শ দ্বারা পুরোপুরি প্রভাবিত তা আমরা বুঝতে ব্যর্থ হই। পশ্চিমা কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আমরা যা গলাধঃকরণ করি তার বেশিরভাগই হলো এক ঈশ্বরহীন সমাজব্যবস্থার ক্ষয়িষ্ণু অংশবিশেষ। নিত্যপরিবর্তনশীল এই ব্যবস্থার ভিত্তি হলো, মানুষ নিজেই তার অস্তিত্বের নিয়ন্ত্রক (raison d'etre)। এটাই তার জীবনের লক্ষ্য। এভাবেই অ্যাকাডেমিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিভিন্ন সামাজিক এবং রাজনৈতিক তত্ত্ব আমাদের গেলানো হয় এবং শেখানো হয় কীভাবে এসব তত্ত্বের বিপরীতে আসা বিতর্ককে উপেক্ষা করে এগুলোর পক্ষে দাঁড়াতে হয়। এসব তত্ত্বের ভিত্তিগুলো অস্পষ্ট এবং তত্ত্বগুলো এতটাই জটিল যে, বেশিরভাগ শিক্ষার্থীই সেগুলো বুঝতে ব্যর্থ হয়। এসব তত্ত্ব অধ্যয়ন করার সময় খুব অল্প কিছু ক্ষেত্রে আমাদের ব্যক্তিগত কোনো অভিজ্ঞতার সাথে হয়তো এসব তত্ত্বের সাদৃশ্য খুঁজে পাই। আর এর প্রেক্ষিতে চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই আমরা মেনে নিই যে, এসব তত্ত্ব পরম সত্য। আমাদের অনেকেই পশ্চিমের 'সাম্যের' সংজ্ঞা মেনে নিয়েছে। অথচ তা একইসাথে অস্পষ্ট এবং স্ববিরোধী। 'সকলের জন্য সমান অধিকার' এ নৈতিকতায় কিছু

---

[১৭৭] বর্তমান সময়ের অন্যসব প্রভাবশালী প্যারাডাইমগুলো থেকে আলাদা করার জন্য আমি ইসলামকে একটি ওয়ার্ল্ডভিউ বলি। এসব বৈষম্য না থাকলে ইসলামকে আলাদাভাবে ওয়ার্ল্ডভিউ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করার প্রয়োজন ছিল না। কারণ, নিঃসন্দেহে ইসলামই সমস্ত কিছুর উপর চূড়ান্ত সত্য। ইসলাম সেক্যুলার লিবারেলিজমের মতো কোনো লেন্স নয় যার মাধ্যমে আমরা বাস্তবতাকে ব্যাখ্যা করব; বরং ইসলামই বাস্তবতা।

[১৭৮] https://yaqeeninstitute.org/tag/gender-and-islam

বাস্তবমুখী প্রশ্নের উত্তর মিলে না এবং হাস্যকরভাবে ঠিক একই কারণে এই মতাদর্শে মানুষ অন্যায়ের শিকার হয়। সামাজিক সাম্যতার আড়ালে মানবীয় পার্থক্য মুছে ফেলার প্রচেষ্টা চালায় লিবারেলিজম। এর ফলাফল আসলে কি?[১৭৯]

বর্তমানে ওহি মানা ঐচ্ছিক হয়ে উঠেছে। ইচ্ছা হলো মানলাম, ইচ্ছা হলো না মানলাম না। আর এভাবে কখনই ন্যায়বিচার, ভারসাম্য, শৃঙ্খলা এবং শান্তি প্রতিষ্ঠা হবে না। যেমনটা উমর ইবনুল খাত্তাব রা. বলেছেন :

> 'নিশ্চয় আমরা লাঞ্ছিত ছিলাম এবং আল্লাহ ﷻ ইসলামের মাধ্যমে আমাদের সম্মানিত করেছেন। আল্লাহ ﷻ আমাদের যা দিয়ে সম্মানিত করেছেন তা ব্যতীত আমরা যদি অন্য কিছুর মাধ্যমে সম্মানিত হতে চাই, তবে আল্লাহ ﷻ আমাদের লাঞ্ছিত করবেন।'[১৮০]

Catch-২২

উম্মাহর ভাই-বোনদের সবার নিজেকে প্রশ্ন করতে হবে। আর এটাই হলো জেন্ডার ডাইনামিক্সের একমাত্র সমাধান। অর্থাৎ, আমরা যে আল্লাহর আদেশকে লঙ্ঘন করছি তা উপলব্ধি করতে হবে এবং সেই সাথে নিজেদের সংশোধন করতে হবে। 'আগে পুরুষদের নিজেকে পরিবর্তন করা উচিত'—এই দাবিকে আমি বিশ্বাস করি না। এটি একটি অসাড় দাবি এবং এটি ইসলামি নীতিমালার বিরুদ্ধে যায়। সামনে বিষয়টি আমি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করব। তবে এটা সন্দেহাতীত সত্য যে পুরুষরা যদি তাদের দায়িত্ব যথারীতি পালন না করে; তবে নারী-পুরুষ কেউই ন্যায়বিচার,

---

[১৭৯] উদাহরণস্বরূপ, রাসেল কার্কের (Russell Kirk) "*The Injustice of Equality*", কিংবা আইডেন্টিটি পলিটিক্সের উপর জনাথন হাইডের (Jonathan Haidt) কাজগুলো দেখুন। ইসলাম লিঙ্গভেদে নারী পুরুষের পার্থক্যকে সমর্থন করে। এসবের মধ্যে বড় ধরনের পার্থক্যগুলো হচ্ছে নারী পুরুষের মধ্যকার জৈবিক পার্থক্য। উদাহরণস্বরূপ সাধারণত একজন পুরুষ শারীরিকভাবে একজন নারীর তুলনায় বেশি শক্তিশালী হয়ে থাকে। আরও ছোট ছোট ক্ষেত্রে বিভিন্ন পার্থক্য থাকতে পারে, যেমন- একজন অক্ষম পুরুষের সাথে একজন নারীর বিয়ের বিষয়টি ব্যতিক্রম অথবা একজন নারীর তার অত্যাচারী স্বামীকে ছেড়ে যাওয়ার অধিকার ইত্যাদি। সমাজের প্রতিটি স্তরে ইসলাম ন্যায়সঙ্গত সমাধান দিয়ে থাকে। প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে ইসলাম ন্যায়বিচার করে। এটা অবাক করার কোনো বিষয় না, কারণ মানবজাতিকে কুরআন এবং সুন্নাহ সরবরাহ করেছেন ন্যায়ের বিধায়ক ﷻ। তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন, তাই তিনিই আমাদের সবচেয়ে ভালো বুঝেন। নারীবাদের মতো এক-ঢিলে-সব-পাখি-মারার এমন সামাজিক ন্যায়বিচারের তত্ত্বের সাথে ইসলামের দূরত্ব যোজন যোজন। আল্লাহ্ আমাদের জটিলভাবে সৃষ্টি করেছেন এবং যার যার সক্ষমতা অনুসারে দায়িত্ব ও অধিকার দিয়েছেন। বোঝাই যাচ্ছে, সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে গেলে কেন প্রত্যেক মানুষের স্বতন্ত্রতাকে বিবেচনায় আনা উচিত। কোনো থিওরিই আসলে আল্লাহর আইনের চেয়ে যথার্থ হবে না। মানুষ সক্ষম না এ কাজ করতে। জারা ফারিসের লেকচার দেখুন।

[১৮০] আল-মুসতাদরাক: ২১৪; শাইখ আল-আলবানী একে সহীহ বলেছেন।

ভারসাম্য, শৃঙ্খলা এবং শান্তির আশা করতে পারবে না। আল্লাহ ﷻ বলেন,

> 'আল্লাহ কোনো জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা তাদের নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে।' [সুরা আর-রাদ : ১১]

নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে পরিবার ধ্বংসের পেছনে সেক্যুলার মতাদর্শগুলো ভূমিকা অনস্বীকার্য। কেবল নারীরাই বিবাহবিচ্ছেদ কিংবা পারিবারিক কলহের জন্য দায়ী—এমন দাবিও একইসাথে মিথ্যা এবং অন্যায়। আশা করা যায় এ প্রবন্ধ থেকে এটুকু স্পষ্ট হবে যে, নারী-পুরুষ উভয়েই যখন নিজেদের ফিতরাতকে শ্রদ্ধা করতে এবং আপন করে নিতে শিখবে কেবল তখনই ন্যায়, শৃঙ্খলা এবং শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।

স্বাভাবিক নিয়মের প্রতি আত্মসমর্পণ

বহুকাল আগে 'cosmos' শব্দটি সাধারণত মহাবিশ্বকে বোঝাতে ব্যবহৃত হতো। 'Cosmos' গ্রিক শব্দ 'kósmos' থেকে এসেছে, যার অর্থ 'শৃঙ্খলা'; বিশৃঙ্খলার বিপরীত। এ নামকরণের মাধ্যমে এ মহাবিশ্বকে একটি জটিল তবে সুশৃঙ্খল সৃষ্টি হিসেবে স্বীকার করা হয়েছে। মানুষের সর্বজনীন অস্তিত্বের প্রশ্নটিও মহাজাগতিক। আর তা হলো, আমি এখানে কেন?

মারিয়া মন্টেসরি (Maria Montessori) একজন খ্যাতিমান ক্যাথলিক শিক্ষাবিদ। তিনি শিক্ষার নিরবধি পদ্ধতির প্রতিষ্ঠাতা, এই পদ্ধতির নামকরণ করা হয় তার নামে। তিনি পর্যবেক্ষণ করেন যে, একটি শিশুর জন্মের পর থেকেই তার কিছু সহজাত প্রবণতা থাকে। মন্টেসরির মতে, মানুষ জন্ম থেকেই তার সহজাত প্রবণতা বা ফিতরাতকে সম্মান করে। মানুষের সহজাত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তিনি বিস্তারিত লিখেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো নিজেকে জীবনের জন্য প্রস্তুত করা। তার মতে, এ উদ্দেশ্য তখনই কার্যকর হবে যখন আমরা এ সত্য উপলব্ধি করব যে প্রতিটি মানুষই এক সহজাত শক্তি নিয়ে জন্মায়। আর এ শক্তিই প্রতিটি ক্ষেত্রে তাকে পরিচালিত করে। তাকে আত্মোপলব্ধিতে সহায়তা করে। এ কারণেই আমাদের উচিত জন্মগতভাবে পাওয়া এই সহজাত বৈশিষ্ট্যগুলোকে পরিপূর্ণ করার চেষ্টা করা।

বিখ্যাত বই 'To Educate the Human Potential'-এ মারিয়া মন্টেসরি বলেন, 'আমাদের উচিত শিশুদের পুরো মহাবিশ্ব সম্পর্কে ধারণা দেওয়া। মহাবিশ্ব এক অমোঘ বাস্তবতা, যেখানে আপনি সকল প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাবেন। আমরা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে একসাথে চলব। কারণ সবকিছুই মহাবিশ্বের অংশ এবং সমস্ত কিছু একে অপরের সাথে সংযুক্ত হয়ে একটি সম্পূর্ণ সুশৃঙ্খল বিন্যাস গঠন

করেছে। এই ধারণা শিশুর মনকে স্থির হতে, লক্ষ্যহীনভাবে জ্ঞান অনুসন্ধান করা থেকে বিরত রাখবে।'

শৈশব থেকেই আমরা মহাবিশ্বে নিজেদের অবস্থান বোঝার চেষ্টা করি। শিশুর জীবনে বড়দের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাটি হলো শিশুটিকে সত্যের দিকে পরিচালিত হতে সাহায্য করা। তার সহজাত প্রবণতায় হস্তক্ষেপ না করে তাকে বাস্তবতার সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। আবু হুরায়রা রা. আল্লাহর রাসুল ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন : 'প্রতিটি মানুষ মায়ের পেট থেকে পরিশুদ্ধ আত্মা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তার বাবা-মা তাকে ইহুদি, খ্রিষ্টান বা জাদুকর বানায়। তারা উভয়েই যদি মুসলিম হতো তবে সেও মুসলিম হতো।'[১৮১]

প্রতিটি মানুষকেই মুসলিম এবং আল্লাহর বান্দা হিসেবে সৃষ্টি করা হয়। অথাৎ, আমাদের প্রাকৃতিক প্রবণতা হলো আল্লাহর আনুগত্য করা। তাঁর সমস্ত সৃষ্টি যে ভারসাম্যপূর্ণ এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ তা উপলব্ধি করা। একটু থামুন। ভাবুন, 'আনুগত্য' বলতে আমরা কি বুঝি। আল্লাহর বান্দা হওয়ার অর্থ আসলে কী? আনুগত্য হলো ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের প্রথম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

আল্লাহ তাঁর ঐশ্বরিক শক্তি এবং প্রজ্ঞায় যে পরিকল্পনা করেন মানুষের পক্ষে সেটার রহস্য পুরোপুরি উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। এ সত্যকে স্বীকৃতি দেওয়ার মাধ্যমে তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ পায়। যদিও আমাদের পক্ষে পুরোপুরি উপলব্ধি করা সম্ভব নয়, তবুও আমাদের মানতে হবে যে আল্লাহর পরিকল্পনা সম্পূর্ণরূপে নিখুঁত এবং ভারসাম্যপূর্ণ। আমাদের সচেতন থাকতে হবে আমরা যেন এ ভারসাম্যে হস্তক্ষেপ না করি। নয়তো আমরা নিজেরাই নিজেদের ওপর ধ্বংস ডেকে আনব।

আল্লাহ ﷻ সুরা আর-রাহমানে বলেন,

> 'সূর্য ও চন্দ্র আবর্তন করে সুনির্দিষ্ট হিসাব অনুযায়ী। তৃণলতা গাছপালা তাঁরই জন্য সিজদায় অবনত। তিনি আকাশকে করেছেন সমুন্নত, আর স্থাপন করেছেন ন্যায়ের মানদণ্ড। যাতে তোমরা ভারসাম্য লঙ্ঘন না করো। আর তোমরা ন্যায়সংগতভাবে ওজন প্রতিষ্ঠা করো এবং ওজনকৃত বস্তু কম দিয়ো না।' [সুরা আর-রাহমান : ০৫-০৯]

প্রাকৃতিক জগৎ সহজাত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে আচরণ করে। আল্লাহ ﷻ প্রতিটি জীব

---

[১৮১] সহীহ মুসলিম: ২৬৫৯

এবং জড়কে যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন তা ছাড়া অন্যকিছু করার স্বাধীন ইচ্ছা তাদের নেই। অণুবীক্ষণিক এককোষী প্রাণী থেকে শুরু করে অপরিমেয় মহাবিশ্বের সকল কিছু একমাত্র ইলাহ আল্লাহর কাছে মাথা নত করে।

প্রতিটি প্রাণী তাদের পৃথিবীতে আগমনের পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সহজাত বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী অনবরত আল্লাহপ্রদত্ত ভূমিকা পালনে নিয়োজিত থাকে। একটা বাজপাখি বা একটা গাভী অথবা একটা পিঁপড়ার সহজাত বৈশিষ্ট্য প্রজাতিভেদে ভিন্ন। কিন্তু এরা প্রত্যেকেই সহজাত প্রবৃত্তি দ্বারাই নিজ নিজ পরিবেশে পরিচালিত হয়। কেউ খাদক কেউ-বা খাবার। এর মাধ্যমে প্রত্যেকে নিজ প্রজাতির অস্তিত্ব, জীবনের ভারসাম্য, বৈচিত্র্য এবং শৃঙ্খলা বজায় রাখে। যেমনটা সুরা আর-রাহমানে আল্লাহ ﷻ আমাদের বলেন, মহাজাগতিক বস্তুগুলো আল্লাহর ﷻ নিখুঁত নকশা অনুসারে প্রদক্ষিণ করে; যা সহজাত ভারসাম্য এবং শৃঙ্খলার একটি অসাধারণ নিদর্শন।

আল্লাহর ﷻ সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে কেবল মানুষ এবং জিনকেই স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই স্বাধীনতাও সীমিত। এই স্বাধীনতার মানে এই না যে আমরা নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী যা খুশি করব আর তার কোনো কর্মফল ভোগ করতে হবে না।

স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দেওয়ার অর্থ হলো স্রষ্টার আনুগত্য করা কিংবা না করা সৃষ্টির ইচ্ছার ওপর ছেড়ে দেওয়া। এ ইচ্ছাশক্তি মানুষকে সহজাত বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী আনুগত্য করার সুযোগ দেয়। আবার চাইলে সে এর বিপরীতেও চলতে পারে। দুটি কাজেরই ভিন্ন প্রতিক্রিয়া রয়েছে। কিন্তু তবুও আমরা প্রাকৃতিক নিয়মের মধ্যে সীমাবদ্ধ, কেননা আমরা চাইলেও স্রষ্টার পরিকল্পনাকে পুনরায় সৃষ্টি করে সাজাতে পারি না। মানুষ শত চেষ্টা করতে পারে, কিন্তু তার পরিকল্পনা এতে ব্যর্থ হবে এটা নিশ্চিত। স্রষ্টার ভূমিকাকে প্রশ্নবিদ্ধ করার মানুষের এসব ব্যর্থ প্রচেষ্টা কেবল বিশৃঙ্খলারই জন্ম দেয়। স্রষ্টার পরিকল্পনা, প্রাকৃতিক শৃঙ্খলা এবং ভারসাম্যে হস্তক্ষেপ করার প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে আমরা নিজের এবং অন্যদের জীবনে ভারসাম্যহীনতা, অসন্তুষ্টি এবং বিশৃঙ্খলা ডেকে আনি।

আমাদের সহজাত প্রবণতা এমন যে, আমরা সবকিছুর ভারসাম্য অনুধাবন করা ও বজায় রাখার ক্ষেত্রে সতর্ক হব। স্রষ্টাপ্রদত্ত স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি আমাদেরকে 'ইবাদ তথা আল্লাহর ﷻ বান্দা হওয়ার অর্থ বুঝতে সাহায্য করবে এবং আমাদের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করবে। আবার এ ইচ্ছাশক্তিই আমাদেরকে ধ্বংসের পথেও পরিচালিত করতে পারে।

সৌভাগ্যক্রমে, আল্লাহ ﷻ আমাদের স্বাধীন ইচ্ছার সুরক্ষার ব্যবস্থাও করে

দিয়েছেন। অর্থাৎ, তিনি এমন ব্যবস্থা করে দিয়েছেন যে, যখন আমরা সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হই তখন তা আমাদেরকে সংশোধন করে দেবে। আল-আদল ﷻ (ন্যায়বিচারক) আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে ন্যায়ের প্রবণতা দিয়ে তৈরি করেছেন। তিনি আল-মুকসিত ﷻ (সাম্য প্রতিষ্ঠাকারী) আমাদের জন্য ঐশ্বরিক বাণী কুরআন প্রেরণ করেছেন। পাশাপাশি একজন নিখুঁত মানুষের জীবন্ত উদাহরণ প্রদান করেছেন যাতে আমরা আমাদের এ অস্থায়ী দুনিয়ায় সঠিক নির্দেশনা পেতে পারি। যখন আমরা ভুল করতে শুরু করি তখন আমরা বিভিন্ন উপায়ে কল্যাণ, সত্য এবং আল্লাহর ﷻ পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করার দিকে পরিচালিত হই, যা সহজাতভাবে ন্যায়সংগত এবং ভারসাম্যপূর্ণ। আমরা এই রিমাইন্ডারগুলো গুরুত্বের সাথে নিতে পারি বা উপেক্ষা করতে পারি। যখন আমরা উপেক্ষা করাকে নিই তখন আমরা মূলত নিজেদের এবং অন্যদের ওপর অবিচার করি।

যদি আমরা এটুকু বুঝতে পারি যে, আল্লাহর আদেশ অমান্য করার অর্থ মূলত ভারসাম্য এবং শৃঙ্খলার বিরুদ্ধে যাওয়া, তবে আমরা বুঝব যে পাপ নিজেই একটি বিশৃঙ্খলা এবং এটিই মূলত অন্যায়-অবিচারের কারণ। আরবিতে অন্যায়-অবিচার বুঝাতে ظلم (জুলুম) শব্দটি ব্যবহার করা হয়, যা আমরা নিজেদের পাশাপাশি অন্যদের ওপরও চাপিয়ে দিতে পারি।

চলুন এমন একটি উদাহরণ দেখি।

'হায়া' মোটাদাগে এর অর্থ হলো, লজ্জা বা বিনয়। এ শব্দের বাংলা অনুবাদে এর গুরুত্ব কমে যায়। 'হায়া' হলো একটি জটিল এবং সূক্ষ্ম মানবীয় গুণ যা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। তবুও আমাদের বোঝা উচিত যে, 'হায়া' হলো এক সহজাত এবং অর্জিত সুরক্ষা কৌশল, যা আল্লাহ আমাদের সকলকে দান করেছেন।[১৮২] 'আল্লাহ এ গুণকে বিশেষভাবে মানুষের জন্য নির্ধারণ করেছেন। যেন তারা তাদের কামনার বশবর্তী হয়ে পাপ কাজে সহজে জড়িয়ে না পড়ে। তারা যেন বন্য পশুর মতো নির্লজ্জ হয়ে পাপ কাজে ঝাঁপিয়ে না পড়ে।'[১৮৩] 'হায়া' আমাদের স্বাধীন ইচ্ছাকে আমাদের ক্ষতির জন্য ব্যবহার করা থেকে বিরত রাখে। 'হায়া' আমাদের পাপ কাজ থেকে বিরত রাখে। আর আল্লাহর স্বাভাবিক নিয়ম অমান্য করাই কি পাপ নয়?

'হায়া' বা লজ্জাশীলতা একটি সহজাত বৈশিষ্ট্য হওয়ায় এটি আমাদের ফিতরাতের

[১৮২] M.I. Al-Muqaddim. (2015). *Fiqh al-Ḥayâ: Understanding the Islamic Concept of Modesty*. Riyadh: International Islamic Publishing House. p. 29.
[১৮৩] প্রাগুক্ত, p. 25.

অন্তর্ভুক্ত। ফিতরাতের বেশিরভাগই নারী-পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রে সর্বজনীন। যেমন, স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস একটি সার্বজনীন সহজাত বৈশিষ্ট্য। যদিও অনেক ক্ষেত্রে আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা কিংবা আশপাশের অন্যান্যদের (যাদের প্রত্যেকেই স্বাধীন ইচ্ছার অধিকারী) সাথে আমাদের মিথস্ক্রিয়ায় প্রভাবিত হয়ে আমরা সত্য থেকে দূরে সরে যাই বা বিপথগামী হয়ে পড়ি। একইসাথে লিঙ্গ-কেন্দ্রিক প্রবণতাও ফিতরাতের অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহ ﷻ কুরআনে বলেছেন,

> 'আর পুরুষেরা নারীর মতো নয়।' [সুরা আলে-ইমরান : ৩৬]

অসংখ্য আয়াত এবং হাদিসের মাধ্যমে প্রমাণিত[১৮৪] হয় যে, লিঙ্গের অস্তিত্ব জৈবিকভাবে এবং আধ্যাত্মিকভাবে বাস্তব।[১৮৫] ইসলাম নারী-পুরুষ উভয় লিঙ্গের ব্যক্তিদেরকে তাদের পোশাক, যোগাযোগ, আচরণে গ্রহণযোগ্য বৈশিষ্ট্য ধরে রাখার সুস্পষ্ট নির্দেশ দেয়।

নিঃসন্দেহে নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যই 'হায়া' একটি স্বাভাবিক প্রবণতা। কিন্তু লিঙ্গ ভেদে 'হায়া' ভিন্নভাবে প্রকাশ পায়। তাই আল্লাহ ﷻ পুরুষ ও নারী উভয়কেই তাদের লিঙ্গ-নির্দিষ্ট ফিতরার জন্য ব্যাবহারিক সুরক্ষা প্রদান করেছেন। আল্লাহ ﷻ তাঁর রাসুলকে ﷺ নির্দেশ দিয়েছেন,

> 'হে নবী, আপনি আপনার পত্নীগণ ও কন্যাগণকে এবং মুমিনদের স্ত্রীগণকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের ওপর টেনে নেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজ হবে। ফলে তাদেরকে উত্ত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।' [সুরা আহযাব : ৫৯]

আমাদের হিজাবকে পশ্চিমা-দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মূল্যায়ন করা বন্ধ করতে হবে। বরং হিজাবের আসল তাৎপর্য উপলব্ধি করতে হবে। হিজাব হায়ার রক্ষক। এটা মহান রবের পক্ষ থেকে নির্দেশিত একটি সুরক্ষাব্যবস্থা যা আমাদের শালীনতা নিশ্চিত করে। একটি বিখ্যাত হাদিসে বর্ণিত আছে,

> 'রাসুল ﷺ আমাদের সিল্ক, দিবাজ, কাসিয়ি এবং ইস্তাবরাক (বিভিন্ন ধরনের রেশমের পোশাক) পরিধান করতে বা লাল মায়াসির (রেশমের

---

[১৮৪] https://www.bbc.co uk/religion/religions/islam/beliefs/hijab_1.shtml#:~:text=O%20Prophet!,Oft%2D%20Forgiving%2C%20Most%20Merciful.&text=This%20verse%20is%20directed%20to%20all%20Muslim%20women

[১৮৫] https://muslimmatters.org/wp-content/uploads/And-the-Male-Is-Not-Like-the-Female-Sunni-Islam-and-Gender-Nonconformity-M.-Vaid.pdf

বালিশ) ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।'[১৮৬]

সিল্কের নিষেধাজ্ঞা কেবল পুরুষের জন্য প্রযোজ্য, কারণ এটি মূলত মেয়েদের সাজ। একই কারণে মুসলিম পুরুষদের সোনার গহনা পরতে নিষেধ করা হয়েছে। ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, 'আল্লাহর রাসুল এমন পুরুষদেরকে অভিশাপ দিয়েছেন যারা নারীদের অনুকরণ করে এবং এমন নারীদের অভিশাপ দিয়েছেন যারা পুরুষদের অনুকরণ করে।'[১৮৭]

রাসুল ﷺ এমন ব্যক্তিকে অভিশপ্ত বলেছেন, 'আল্লাহ যাকে পুরুষ হিসেবে সৃষ্টি করেছেন কিন্তু পরবর্তী সময়ে সে নিজেকে মেয়েলি সাজে সজ্জিত করল এবং নারীর অনুকরণ করল।'[১৮৮] ইনশাআল্লাহ, 'হায়া'র বিষয়টি পরবর্তী প্রবন্ধগুলোয় আরও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হবে। আপাতত, আসুন আমরা বুঝতে চেষ্টা করি যে আমাদের লিঙ্গ-নির্দিষ্ট প্রবণতাগুলো আমাদের সৃষ্টিকর্তাপ্রদত্ত কার্যকরী এবং ব্যাবহারিক সুরক্ষাব্যবস্থা।

আল্লাহ পুরুষ এবং নারীকে পরস্পরের পরিপূরক হিসেবে সৃষ্টি করেছেন, উভয়েরই উভয়কে প্রয়োজন। এটা আল্লাহর সুষম পরিকল্পনার অংশ। পরিচর্যার প্রবণতা পুরুষের তুলনায় নারীর মধ্যে অনেকগুণ বেশি। কিন্তু তার মানে এই নয় যে পুরুষের মধ্যে পরিচর্যার প্রবণতা একেবারেই অনুপস্থিত। বরং আল্লাহ ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য পরিচর্যার ঝোঁক নারীর দিকে বাড়িয়ে দিয়েছেন। আবার শারীরিক সামর্থ্যের দিকে পুরুষ নারীর তুলনায় এগিয়ে। তার মানে এই নয় যে নারীর মধ্যে শারীরিক সামর্থ্য একেবারেই নেই। বরং আল্লাহ ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য শারীরিক সামর্থ্যের ঝোঁক পুরুষের দিকে বাড়িয়ে দিয়েছেন।

গবেষণায় প্রমাণিত যে, প্রাকৃতিকভাবেই লিঙ্গদ্বয়ের মাঝে ভারসাম্য বিদ্যমান। 'মেটা-এনালাইসিস প্রক্রিয়ায় পূর্ববর্তী গবেষণার বিপুলসংখ্যক ডেটা বিশ্লেষণ করে মনোবিজ্ঞানীরা আবেগের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের বেশ কিছু লিঙ্গভিত্তিক পার্থক্য খুঁজে পেয়েছেন। দেখা গিয়েছে যে, নারীরা তুলনামূলক বেশি সহানুভূতিশীল হয়ে থাকে, যেখানে পুরুষেরা যৌন ঈর্ষার আবেগ বা গাইরাহ নারীদের তুলনায় বেশি শক্তিশালীভাবে অনুভব করে।'[১৮৯] আবার স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি গবেষণায় বলা হয়েছে নারী ও পুরুষের মধ্যে জ্ঞানগত বেশ গুরুত্বপূর্ণ কিছু পার্থক্য

---

[১৮৬] সহিহ বুখারি : ৫৮৪৯

[১৮৭] সহিহ বুখারি : ৫৮৮৫

[১৮৮] জামে আত-তিরমিযি : ২৭৮৪

[১৮৯] https://www.psychologytoday.com/us/articles/201711/the-truth-about-sex-differences

রয়েছে।[১৯০]

২০১৭[১৯১] এবং ২০১৮[১৯২] তে করা Pew Poll গুলো আমাদের লিঙ্গ ভেদে সহজাত বৈশিষ্ট্যের ধারণাকে ভালোভাবেই সমর্থন করে। পুরুষরা নারীর কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে আকৃষ্ট হয়। আবার নারীদের কাছেও তেমনই পুরুষের কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যেকে আকর্ষণীয় বলে মনে হয়। আসলে এটা কোনো গৎবাঁধা নিয়ম না; বরং এটা নারী-পুরুষের সাধারণ প্রবণতা।

যখন আমরা সর্বজনীন এবং লিঙ্গ-নির্দিষ্ট উভয় ক্ষেত্রেই আমাদের ফিতরাকে শ্রদ্ধা করি এবং আপন করে নিই তখন আমরা আল্লাহর পরিকল্পনা এবং স্বাভাবিক নিয়মের কাছে আত্মসমর্পণ করি। আর এটা আমাদের স্বাধীন ইচ্ছাকে সৎপথে পরিচালিত করতে সাহায্য করে। স্বাধীন ইচ্ছা থাকার অর্থ হলো ভালো এবং মন্দের মধ্যে, উপকারী এবং ক্ষতিকরের মধ্যে একটিকে বেছে নেওয়ার ক্ষমতা। কোরআন এবং রাসুলের জীবন থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজেদের ইচ্ছাকে সেই পথে পরিচালিত করা উচিত যে পথ অনুসরণ করলে দুনিয়ায় এবং আখিরাতে সর্বোচ্চ সাফল্য অর্জন করা সম্ভব। আল্লাহর আদেশ পালন করা আমাদের সহজাত প্রবৃত্তির অংশ, যার প্রতি আমরা স্বভাবতই আকৃষ্ট হই। যা আমাদের সত্যের পথে পরিচালিত করে।

শিশুদের পর্যবেক্ষণ এবং অধ্যয়নের মাধ্যমে ফিতরাতের প্রতি শ্রদ্ধা বোঝা যায়। স্রষ্টাপ্রদত্ত সকল সৌন্দর্য এবং পবিত্রতা শিশুর মাঝে আছে। কারণ শিশুরা বাহ্যিক শক্তি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে খারাপ কিংবা ক্ষতিকর কোনো কিছুর প্রতি আকৃষ্ট হয়নি, যা স্বাধীন ইচ্ছাকে খারাপ এবং ক্ষতির দিকে পরিচালিত করবে। শিশুদের পর্যবেক্ষণ করলে আমরা উপলব্ধি করতে পারব আমাদের পরিচয় আসলে কি এবং আমরা কোথা থেকে এসেছি। তারা আমাদের সামনে আমাদের চরিত্রের সহজাত বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরে—সৎ, সহানুভূতিশীল, ন্যায় এবং ফিতরাত পরিচালিত আল্লাহর সৃষ্টি।

স্বভাবতই শিশুরা আল্লাহর আনুগত্য করে। শিশুরা আল্লাহর আনুগত্য করার ব্যাপারে তাদের মধ্যকার সহজাত প্রবণতাকে বাধা দেয় না। শিশুরা যখন বেড়ে ওঠে এবং চারপাশ সম্পর্কে সচেতনতা অর্জন করে; তখন তাদের ফিতরাহ অদৃশ্য হয়ে যায় না। কিন্তু এ প্রবণতাকে সক্রিয় রাখার জন্য প্রতিনিয়ত এমন সব

---

[১৯০] https://stanmed.stanford.edu/2017spring/how-mens-and-womens-brains-are-different.html

[১৯১] https://www.pewresearch.org/social-trends/2017/12/05/americans-see-different-expectations-for-men-and-women/

[১৯২]https://www.pewresearch.org/social-trends/interactives/strong-men-caring-women/

অভিজ্ঞতার মাধ্যমে একে শানিত করতে হবে, যা তার জন্মগত সত্যকে দৃঢ় করবে।

যেহেতু আমাদের স্বাভাবিক স্বভাব বা ফিতরাহ শিশুদের মধ্যে সবচেয়ে সহজে দেখা যায়, তাই আমরা তাদের মধ্যে সার্বজনীন মানবীয় গুণাবলিকে দেখি। এগুলো আমাদের সহজাত গুণাবলি এবং এগুলো সকল কিছুর প্রাকৃতিক নিয়মের অন্তর্ভুক্ত :

—ন্যায়পরায়ণতা (সকল ক্ষেত্রে সততা);

—পারস্পরিক শ্রদ্ধা (অন্যের জন্য সেটাই চাওয়া যা আপনি নিজের জন্য চান);

—সহানুভূতি (অন্যের আনন্দ এবং কষ্টের মধ্যে নিজের আনন্দ এবং কষ্ট দেখা)।

একটি বাচ্চা যখন বড় হতে থাকে তখন সে পরিশীলিত উপায়ে শিখে যে সবকিছুতে সে তার পছন্দ অনুযায়ী নির্বাচন করার অধিকার রাখে। সে শিখে যে নিয়ম ভাঙা যায়। সে বুঝতে পারে তার স্বাধীন ইচ্ছা তাকে অবাধ্য হওয়ার পাশাপাশি আনুগত্য করারও সুযোগ করে দেয়। আর এ কারণেই আমাদেরকে ক্রমাগত তাকওয়া অর্জনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ আমাদের স্বীয় ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করার ক্ষমতা দিয়েছেন। পাশাপাশি তিনি কুরআন এবং নবী-রাসুলগণের মাধ্যমে নিজের পরিচয় তুলে ধরেছেন যাতে করে আমরা সত্য ও ন্যায়ের পথে পরিচালিত হতে পারি।

সুতরাং যখন আমরা নিজেকে প্রশ্ন করি 'আনুগত্য' বলতে কি বুঝায় এবং গভীরভাবে চিন্তা করি আমরা কীভাবে আল্লাহর 'বান্দা' হলাম; তখন আমরা উপলব্ধি করি আত্মসমর্পণের এক অদৃশ্য শৃঙ্খল, যা আল্লাহর তৈরি নিখুঁত নকশার সাথে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে বাঁধা। যখন আমরা আল্লাহর আদেশের কাছে নিজেকে সমর্পণ করি; তখন মূলত আমরা আমাদের ফিতরাহর (সহজাত প্রবৃত্তিরই) অনুসরণ করি। এবং ভালো কাজ করার মাধ্যমে এর মর্যাদা ধরে রাখার চেষ্টা করি; তখনই আমাদের মধ্যে প্রয়োজনীয় মানবীয় গুণাবলির বিকাশ ঘটে। এসব গুণাবলি আমরা যে সত্য নিয়ে জন্মেছি তাকে আরও শক্তিশালী করে। ফলস্বরূপ একটি ন্যায়সংগত, সুসংহত এবং শান্তিপূর্ণ সমাজ তৈরির পথ খুলে যায়।

আমাদের বোঝা উচিত যে, আল্লাহর কাছে নিজেকে পুরোপুরি সমর্পণ করার অর্থ হলো, প্রতিটি কাজে সততার অনুশীলন করা। তাঁর সমস্ত সৃষ্টির প্রতি পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং সহমর্মিতা লালন করা। আমাদের মুসলিম ভাই-বোনদের প্রতি আন্তরিক ভালোবাসা রাখা। অপরদিকে, আল্লাহর অবাধ্যতা আমাদের অন্তরকে ধ্বংস করে দেয়, মানবীয় গুণাবলির বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করে। ফলস্বরূপ আমরা সুসংগঠিত এবং শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনে ব্যর্থ হই। আল্লাহ ﷻ আমাদের সতর্ক করে বলেছেন,

> ‘যারা আমার নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করে তারা বোবা ও বধির, অন্ধকারের বাসিন্দা। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন।’ [সুরা আল-আনআম : ৩৯]

তিনি ﷻ আরও বলেন,

> ‘তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে এক নিদর্শন এই যে, তিনি মাটি থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছ।’
>
> [সুরা আর-রুম : ২০]

এইভাবে, যখন আমরা আল্লাহর ﷻ নকশার স্বাভাবিক নিয়মের বিরুদ্ধে যাই, আল্লাহকে ﷻ অমান্য করি এবং তার আদেশ লঙ্ঘন করি, এর অর্থ হলো তাঁর সমস্ত সৃষ্টির প্রতি শ্রদ্ধা, সমবেদনা, ভালোবাসা, সহানুভূতি অনুশীলন থেকে নিজেদেরকে অক্ষম করে তুলছি। আমাদের অন্তর থেকে এগুলো আর আসবে না। এ মানবীয় মূল্যবোধ এবং গুণাবলি সৃষ্টির শুরু থেকেই নারী-পুরুষ উভয়েই চর্চা করে আসছে। এগুলো স্বাভাবিকভাবেই প্রকাশ পায় যখন নারী-পুরুষ উভয়েই তাদের ফিতরাতকে সম্মান করে। এভাবেই উভয় লিঙ্গের মধ্যে সামঞ্জস্য অর্জিত হয়।

> ‘অতএব আপনি উত্তমরূপে ধৈর্যধারণ করুন করুন।’
>
> [সুরা আল-মাআরিজ : ০৫]

ইসলামের বাস্তবতার দৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে বর্তমান লিঙ্গ-বিষয়ক আলোচনাকে এভাবে দেখলে তীব্র সমালোচনার মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আল্লাহ ﷻ আমাদের এমন সমালোচনার মুখে ধৈর্যধারণ করার তাওফিক দান করুন। কারণ একমাত্র তিনিই ﷻ সবকিছু সম্পর্কে বিস্তারিত জানেন। আমাদের অবশ্যই মনে রাখা উচিত রাসুলকে তাঁর নিজের রক্তের আত্মীয়স্বজনরা অপমান করেছে, হেয় করেছে, এমনকি তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। আমরা যেন অপমান, অপবাদ এবং সমালোচনায় খুব সহজে হাল ছেড়ে না দিই, হতাশ না হয়ে পড়ি। আমাদের সবসময় সত্য বলার এবং বাকি সবকিছু আল্লাহর ﷻ সিদ্ধান্তের ওপর ন্যাস্ত করার আদেশ দেওয়া হয়েছে,

> ‘আর আল্লাহ তাআলা এবং তাঁর রাসুলের নির্দেশ মান্য করো। তা ছাড়া তোমরা পরস্পরে বিবাদে লিপ্ত হয়ো না। যদি তা করো, তবে তোমরা কাপুরুষ হয়ে পড়বে এবং তোমাদের প্রভাব চলে যাবে। আর তোমরা ধৈর্যধারণ করো। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।’ [সুরা আল-আনফাল : ৪৬]

আল্লাহ ﷻ আমাদের একে অপরকে সৎ উপদেশ দেওয়ার তাওফিক দান করুন। আমরা যেন ইচ্ছাকৃত এবং অনিচ্ছাকৃতভাবে একে অপরের নামে মিথ্যা প্ররোচনা করা থেকে বিরত থাকতে পারি। আমরা যেন একে অপরের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং আন্তরিক হতে পারি সেই তাওফিক দান করুন।

পরিশেষে, আমাদের এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, আমরা চাইলেই সবার অন্তর পরিবর্তন করতে পারব না। আল্লাহ ﷻ বলেন,

> 'নিশ্চয় আপনি যাকে ভালোবাসেন তাকে আপনি হিদায়াত দিতে পারবেন না; বরং আল্লাহই যাকে ইচ্ছা হিদায়াত দেন। আর হিদায়াতপ্রাপ্তদের ব্যাপারে তিনিই ভালো জানেন।' [সুরা আল-কাসাস : ৫৬]

এবং তিনি ﷻ আরও বলেন,

> 'তাদেরকে সৎপথে আনার দায়িত্ব আপনার নয়। বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন।' [সুরা আল-বাকারা : ২৭২]

পৃথিবীর বুকে জন্ম নেওয়া সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি আল্লাহর রাসুল ﷺ-ও প্রত্যেকের অন্তর পরিবর্তন করতে পারেননি।

> 'অতএব, আপনি ধৈর্যধারণ করুন। কারণ আল্লাহর ওয়াদা সত্য। যারা বিশ্বাসী নয়, তারা যেন আপনাকে বিচলিত করতে না পারে।' [সুরা আর-রুম : ৬০][১৯৩]

---

[১৯৩] সাবেক নাস্তিক ও নারীবাদী, আন্তর্জাতিক ইসলামি লেখক নূর গোডার নিজস্ব ওয়েবসাইটে প্রকাশিত *Balance of the Sexes: Submission to the Natural Order of Allah's Design* আর্টিকেলটির অনুবাদ।

মাতৃত্বের বিরুদ্ধে যুদ্ধ : মুসলিম নারীবাদীদের অবস্থান[১৯৪]

বিয়ে নাকি ক্যারিয়ার? আধুনিক বিশ্বের অসংখ্য মুসলিম তরুণী এ প্রশ্নে এসে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভোগে। তাদেরকে দিকনির্দেশনা দেওয়ার কেউ থাকে না। একপর্যায়ে তারা কাফিরদের মতাদর্শ অনুসরণ করতে থাকে। এ যাত্রার শেষ হয় দুনিয়া ও আখিরাতে ধ্বংসের মধ্য দিয়ে।

অনেক মুসলিম নারীই তোতাপাখির মতো নারীবাদের বুলি আওড়ায়। জীবনের দীর্ঘ একটা সময় অতিবাহিত হওয়ার পর তারা অবাক হয়ে ভাবে, 'আমি এত একা এবং নিঃসঙ্গ কেন?' এই পয়েন্টে এসে অনেকেই মুসলিম পুরুষদের ভীতু এবং কাপুরুষ বলা শুরু করেন। মেয়েদের সকল পশ্চাৎপদতার পেছনে পুরুষই একমাত্র কারণ ইত্যাদি ভয়াবহ সব অপবাদ দিতে থাকেন। মুসলিম পুরুষরা নাকি 'ক্ষমতাবান' স্বাধীন মুসলিম নারীদের সাথে চলতে ভয় পায়!

আমাদের দ্রুত সজাগ হতে হবে। বর্তমানে আরও বেশি। কেননা ধর্মকে বর্জন হোক বা ফেমিনিজমের 'ইসলামি নাম দিয়ে হোক, অসংখ্য মুসলিম নারী সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও ব্যক্তিজীবনে এসব বিষাক্ত, বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট মতাদর্শ প্রচার করে বেড়াচ্ছেন।

যেসব নারীরা হালাল ক্যারিয়ার বেছে নিয়েছেন, তাদের বিরুদ্ধে আমাদের কোনো কথা নেই। আমার মা ছিলেন ধার্মিক নারী, পেশায় চিকিৎসক। আমি নিজে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক সম্পন্ন করেছি। কলেজ জীবনের সেই সাদাসিধে দিনগুলোতে আমরা অনেক সামাজিক কাজ করতাম, 'বিশ্বকে পরিবর্তন করার স্বপ্ন দেখতাম, নতুন নতুন আইডিয়া নিয়ে কাজ করতাম। চরম আর্থিক দুরবস্থার

---

[১৯৪] লেখাটি লেখা হয়েছে আমেরিকার একজন মুসলিম নারী আইনজীবীর কথার জবাব হিসেবে। আমাদের কেন তা জানা প্রয়োজন? বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটেও অনেক ভাই-বোন ইসলাম এবং নারীবাদের একটি জগাখিচুড়ি রূপ তৈরি করেন। প্রবাসী এক মুসলিম নারীবাদী ও তাঁর সাথের অনেক ভাই-বোন নিজেদের ঈমান খোয়ে ফেলার পথে। তাদের প্রোপাগান্ডার ভুলগুলো সহজ ও সাধারণভাবে বোঝার জন্য ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে আর্টিকেলটি জরুরি মনে হয়েছে।—অনুবাদক।

কারণে অন্য কোনো উপায় নেই এমন অনেক বোন আছেন। তাদেরকে নিয়ে আমাদের কোনো সমস্যা নেই। বরং আমার ক্রোধ এমন এক ব্যবস্থার প্রতি যেখানে ক্যারিয়ারই নারীর একমাত্র মূল্য, এর বাইরে নারী যেন কিছুই নন। ফলস্বরূপ নারীকে আজ এক কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হচ্ছে।

আমি নিজেকেও এ প্রশ্ন নিয়ে লড়াই করতে হয়েছে। ঠিক আছে আমি একজন স্ত্রী এবং মা, কিন্তু এটাই কি যথেষ্ট? নারী হিসেবে আমি যোগ্য তো? বেশ কয়েক বছর পর আমি বুঝতে পেরেছি, আসলে এ প্রশ্নটা নিজেই বিষাক্ত। একজন ভালো স্ত্রী এবং একজন ভালো মা হওয়ার চেয়ে সেরা আর কী আছে? এর চেয়ে বেশি চ্যালেঞ্জিং আর কি হতে পারে? আর এর চেয়ে বেশি পরিপূর্ণতা আর কীসের মাধ্যমে আসতে পারে? একটি সুসংহত, ভালোবাসায় পরিপূর্ণ পরিবারই তো ধীরে ধীরে গড়ে তুলবে একটি সুদৃঢ় মুসলিম উম্মাহ। এর প্রতিষ্ঠায় কাজ করার চেয়ে বেশি কার্যকরী বিষয় আর কী আছে?

নারীবাদ এতে খুশি না। তাদের মতে, আমাদেরকে 'আরও বেশি কিছু' হওয়া প্রয়োজন। এভাবেই নাকি 'নারীদের সম্ভাবনা পূরণ করা যাবে'।[১৯৫] তাদের মতে, নারীর আসলে স্বামী এবং সন্তানকে সময় দেওয়া উচিত না। তাদের বরং উচিত তাদের মূল্যবান সময় দিন, সপ্তাহ, এমনকি বছরও অর্থ, খ্যাতি এবং নেতৃত্ব অর্জনের লক্ষ্যে ব্যয় করা। এভাবে নারীর কিছু অর্জন হয় বটে, কিন্তু হারায় অনেক বেশি কিছু। যেখানে পুরো সিস্টেমই নারীদেরকে এসব শিক্ষা দিতে বদ্ধপরিকর, আমরাই পারি বদলাতে। কেননা, তাদের ষড়যন্ত্র আমাদেরকে নিয়েই। আমরাই পারি ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে রক্ষা করতে।

দুঃখজনকভাবে, কিছু মুসলিম এ কাজই করছেন। এ বিষাক্ত মানসিকতা ছড়িয়ে দিচ্ছেন।

কেন কেউ আমাকে বিয়ে করতে চায় না?

একজন মুসলিম আইনজীবী এবং কর্মী জহরা বিষ্ণু তার কষ্ট ও হতাশা বর্ণনা করে গত সপ্তাহে একটি ফেসবুক পোস্ট লিখেছেন। তার দুঃখের কারণ, তিনি তার এমন ক্যারিয়ারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কোনো পাত্র পাচ্ছেন না। আশ্চর্যের বিষয় ছিল, তার এ অবস্থার জন্য তিনি মুসলিম পুরুষদেরকে দায়ী করেছেন।

---

[১৯৫] মূল শব্দ Empowered. অর্থাৎ যে নারী ক্যারিয়ার ও অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী, সম্পূর্ণ ব্যক্তিস্বাধীনতা লালন করেন এবং সামাজিক প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা রাখেন। সামাজিক, শিক্ষা, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং মানসিক এ পাঁচ ধরনের ক্ষমতায়ন নিয়ে আলোচনা করেন নারীবাদীরা।—অনুবাদক।

সমগ্র মুসলিম জনগোষ্ঠীই নাকি এর জন্য দায়ী।

তিনি একটি গল্প শেয়ার করেছেন। একদিন এক রেস্তোরাঁয় তিনি খাচ্ছিলেন। এমন সময় একজন মুসলিম বাবা তাঁকে দেখে মাত্রই চিনে ফেললেন। আত্মহারা হয়ে তিনি বললেন, তিনি চান তাঁর মেয়েটিও বিলুর মতো হয়ে উঠুক। বিলু অহরহ এমন প্রশংসায় ভাসে। এটা তার কাছে নতুন কিছু না। তবে অবাক করা বিষয় হলো, যে ব্যক্তি তার বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে সে নিজেও নাকি এমন কথাই বলেছে।

সে লোক তাঁকে বলেছিল, "আমি চাই আমার মেয়ে আপনার মতো হয়ে উঠুক। কিন্তু স্বামী হিসেবে আপনার ক্যারিয়ারের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া আমার জন্য সম্ভব হবে না। আমি এটাও চাই না আপনি আমার জন্য নিজেকে পরিবর্তন করুন।" বিলুর কাছে এটা ভণ্ডামি। আমার কাছেও, তবে অন্য কারণে।

একজন বাবা কীভাবে তার মেয়ের জন্য এমন একটা ক্যারিয়ারের স্বপ্ন দেখেন যেখানে ইসলামি নিয়মে বিয়ে করতে, সুস্থ মুসলিম পরিবার গঠনে সমস্যা হবে, সুন্নাহ অনুযায়ী জীবনযাপন বাধাগ্রস্ত হবে? কেন একজন সুস্থ মানসিকতার বাবা চাইবেন তার মেয়ের এমন পরিণতি হোক?

কিন্তু বিলু এবং তাঁর মতো নারীবাদী রোগে আক্রান্ত প্রত্যেকে মনে করেন যে, একজন উদ্যমী কর্মজীবী নারীকে বিয়ে না করতে চাওয়া পুরুষের দোষ কিন্তু কেন? পুরুষরা কেন স্ত্রী থেকে তার চাহিদা পরিষ্কারভাবে বলতে পারবে না? সত্য বলতে বেশিরভাগ পুরুষই চান না, তাদের স্ত্রীদের হাই প্রোফাইল ক্যারিয়ার থাকুক, তারা বাইরে সময় দিক। বেশিরভাগ মুসলিম পুরুষই এমন স্ত্রী চান যারা ইসলামি শরিআহ অনুযায়ী মাতৃত্বের ভূমিকাকে প্রাধান্য দেবে।

বর্তমান বিশ্বে নারীরা তাদের পছন্দ অনুযায়ী বিয়ে করার অধিকার রাখে। এজন্য কেউ নারীদের কোনো সমালোচনা করে না। যারা কম অর্থ উপার্জন করেন, যাদের গ্ল্যামারাস জব নেই তাদেরকে বিয়ে করতে না চাইলেও নারীদের বিরুদ্ধে কেউ আঙুল তুলে না। কেউ মুসলিম নারীকে বলে না, 'হে নারী, জাগ্রত হও! অর্থনৈতিক সুবিধাবঞ্চিত পুরুষকে বিয়ে করো।' উদাহরণস্বরূপ, রিক্তহস্ত দরিদ্র পুরুষকে বিয়ে করার জন্য আবেগী ফেসবুক পোস্ট বা কাঁদো কাঁদো চোখের সাক্ষাৎকার দেওয়া কোনো শর্টফিল্ম দেখা যায় না।

মূল সমস্যা হলো, এরা কেবল অর্থনৈতিকভাবে অগ্রসর নারীদেরকেই মূল্যায়ন করে, তাদেরকেই সেরা মনে করে এবং মনে করে সবার আসলেই তাই করা উচিত। আমরা মুসলিমরা এভাবে কোনো নারীকে মূল্যায়ন করি না। বিলুর বোধদয়

ঠিকই আছে। মুসলিম পুরুষরা, মুসলিম জনগোষ্ঠীও এভাবে মূল্যায়ন করে না, করা উচিত না।

আধুনিক নারীবাদীরা নারীদেরকে সবার ওপরে ক্যারিয়ারকে প্রাধান্য দিতে বলে। এর জন্য তারা সোশ্যাল মিডিয়া, প্রিন্ট মিডিয়া থেকে শুরু করে কোনটার সাহায্য নেয় না? 'ক্ষমতাবান হোন!' এ স্লোগান জপ করে তারা। 'স্বাধীন হোন!', 'মাথায় পুশি হ্যাট/জেনিটালিয়া হ্যাট পরে উইমেনস মার্চে যোগদান করুন', 'বিশ্বকে পরিবর্তন করার জন্য একজন ঠোঁটকাটা নারীকর্মী হয়ে ওঠুন', 'পুরুষতন্ত্রকে হত্যা করুন' পুরুষরা দুষ্ট, বিষাক্ত এবং স্বার্থপর। তারা আপনাকে দাসী বানাবেই। কাজেই স্বামীর আনুগত্য করবেন না। বরং একটি চাকরি খুঁজে বের করুন এবং আপনার বসের আনুগত্য করুন! মজুরির বিনিময়ে দাসী হোন! এটাই স্বাধীনতা। এতে আপনাকে সন্তুষ্ট থাকতেই হবে। কেননা একজন পুরুষ যা করতে পারে তা আপনিও করতে পারছেন। একজন পুরুষ হাই প্রোফাইল ক্যারিয়ার পেতে পারে। তাহলে আপনি কেন নন?

এটা নারীবাদ। ইসলাম ঠিক তার বিপরীত।

তাহলে যে নারী তার ক্যারিয়ারের চেয়ে স্বামী, সন্তান এবং গৃহের প্রতি বেশি নিবেদিত এমন একজনকে স্ত্রী হিসেবে চাওয়া কেন দোষের হবে?

বাসায় তৈরি খাবারের মূল্য

বিলু আরও বলেছিল, 'মানুষ নারীবাদী কর্মীদেরকে দূর থেকে সমর্থন করে ঠিকই কিন্তু নিজেদের স্বাচ্ছন্দ্য থেকে বের হতে তারা রাজি নয়। প্রতিদিন বাড়িতে রান্না করা গরম খাবার তাদের ঠিকই চাই।'

এটাই কি স্বাভাবিক না? সারা দিনের ক্লান্তি শেষে বাড়িতে এসে স্বাচ্ছন্দ্য এবং রান্না করা গরম খাবারের আশা করা কি অযৌক্তিক? কোনো পুরুষের বিয়ে নিয়ে এমন ধারণা পোষণ করা কি প্রমাণ করে যে তিনি নিকৃষ্ট, সেক্সিস্ট[১৯৬] কিংবা নিপীড়ক?

একজন নারী নিজেকেই নিজে জিজ্ঞেস করতে হবে, আসলে তার মূল্য কোথায়? প্রতিদিন অনলাইনে আমরা অনেক হাই প্রোফাইল ক্যারিয়ার-সম্পন্ন নারীর গল্প দেখি। হয়তো তারা ত্রিশ, চল্লিশ কিংবা পঞ্চাশ বছরের দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁছেছে। তারা বিয়ে করেনি, বাচ্চা নেয়নি। এমন অসুস্থ পরিবারের অসুস্থ নারীদের জীবনকাহিনি দেখে আধুনিক মুসলিম মেয়েরা হতাশ হয়। যদি তারা জানত, কত বড় কিছু হারিয়েছে তারা জীবনে!

---

[১৯৬] Sexist : যে ব্যক্তি কেবল লিঙ্গের কারণে বৈষম্য করেন।

তারা আফসোস করবে, করে, 'কেন আমি শুধু একটা চাকরির জন্য আমার জীবনের সেরা সময়গুলো ধ্বংস করেছি? চাইলেই তো আমি ভালোবাসায় পরিপূর্ণ একটি পরিবার গঠন করতে পারতাম। এখন আমি শারীরিকভাবে সন্তান জন্ম দিতে অক্ষম। আমি কখনো একটি বড় পরিবারের অংশ হতে পারব না। এর জন্য কে দায়ী?'

এমন ভবিষ্যৎ কষ্টের, লাঞ্ছনার কে চায় তার সন্তানের সাথে এমন হোক?

নারীর শ্রেষ্ঠত্ব মাতৃত্বে। নারী-মাত্রই চায় সন্তান জন্ম দিতে, মা ডাক শুনতে, তাদেরকে ভালোবাসায় আগলে রাখতে ও মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে। অবাক করা বিষয় হলো, মাতৃত্বের এ পুরো ধারণাকেই খুব বেশি ছোট হিসেবে দেখানো হয়, অবজ্ঞা করা হয়। তারা যেন তাদের যৌবনের সবচেয়ে কর্মক্ষম সময়গুলো ভালো স্ত্রী এবং মা নয়; বরং কর্পোরেট কোম্পানির চাকর হতে ব্যয় করে। এটিই সভ্যতার ধ্বংসের জন্য যথেষ্ট।

পুরুষ নারীর মতো নয় (আপনার পছন্দ না হলে কিছু আসে যায় না)

নারীবাদীদের একটি মজার বিষয় হলো, তারা পুরুষদেরকে জাতিগতভাবে খারাপ মনে করে আবার পুরুষদেরকেই সফলতার মানদণ্ড হিসেবে উপস্থাপন করে যেন নারীরা পুরুষদের মতো করে কাজ করতে পারলেই সত্যিকার অর্থে সফল হয়ে উঠতে পারবে। বিলু বলেছেন, 'আল্লাহ আমার জন্য এ পথ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আমাকে অনেক সময় ধরে কাজ করতে হয়। তা আমি আমার জীবন ও শরীরের বিনিময়ে হলেও করে যাব। এভাবেই আমার জনগোষ্ঠীকে রক্ষা করা সম্ভব।'

কথাটা হাস্যকর। আল্লাহ কী ঠিক করে দিয়েছেন তা আমরা কীভাবে নির্ধারণ করব? টেক্সটে কি এমন বলা আছে? সালাফদের কেউ বলেছেন? পরিবার থেকে দূরে থেকে 'দীর্ঘ সময় কাজ করে জীবন উৎসর্গ' করার এমন ভূমিকাকে ইসলাম কীভাবে সমর্থন করে? ইসলামে কোথায় কোনো মুসলিম নারীকে এমন কিছু করতে বলা হয়েছে? ইসলামে কোথায় এমন কিছুকে উৎসাহিত হয়েছে?

বিলু যে দায়িত্বের কথা বলেছেন, সেগুলো আসলে ইসলাম পুরুষের ওপর আরোপ করেছে পরিবারের সদস্যদের প্রয়োজনীয় জিনিস তাকে সরবরাহ করতে হবে এবং পরিবারের সুরক্ষার জন্য কাজ করতে হবে। নারী নয়, বরং পুরুষদেরকে এ কঠিন দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে যে, তারা তাদের জীবনের বিনিময়ে হলেও তাদের পরিবার, সম্প্রদায় এবং মুসলিম উম্মাহর সুরক্ষা নিশ্চিত করবে। জরুরি এবং নাজুক পরিস্থিতিতে অবশ্যই একজন নারী তাঁর পরিবার এবং সন্তানদের রক্ষা করতে কাজ

করবেন, তবে সাধারণভাবে সর্বাবস্থায় আল্লাহ এ দায়িত্ব নারীর জন্য নির্ধারণ করেননি। এ কাজ মুসলিম পুরুষদের।

পুরুষের কিছু স্বতন্ত্র গুণাবলি আছে, তেমনই নারীরও আছে কিছু স্বতন্ত্র গুণাবলি। পাশাপাশি পুরুষের স্বতন্ত্র কিছু দুর্বলতা আছে এবং নারীরও আছে নারীজাত দুর্বলতা। নারীবাদ প্রচণ্ড চেষ্টা করে সব নারীজাত গুণাবলিকে পুরুষালি রং দিতে এবং পুরুষ ও নারীর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যগুলোর অস্তিত্বকে অস্বীকার করতে। একে একটি যুদ্ধের রূপ দেওয়া হয়েছে। এখানে পুরুষত্ব (বিষাক্ততা) হলো খলনায়ক, সংগ্রামী হলো নারীত্ব (দুর্বলতা)। এখানে সমঝোতা নেই, ভালোবাসা নেই। আছে বিরোধ এবং যুদ্ধ।

ইসলামি শরিআহ এগুলোর ঠিক বিপরীত। লিঙ্গগত পার্থক্য এবং নারী-পুরুষের ভূমিকা নিয়ে ইসলামে একটি সুসংহত এবং সুস্পষ্ট ধারণা রয়েছে। ইসলাম বিয়ে এবং পরিবারকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করে এবং সেখানে নারী পুরুষের ভূমিকা নির্ধারণ করে দেয়। প্রতিটি ব্যক্তির নির্দিষ্ট অধিকার এবং দায়িত্ব রয়েছে, এগুলো অবশ্যই লিঙ্গভেদে আলাদা। স্বামী পরিবারের নেতৃত্ব দেবেন, তিনি তাঁর স্ত্রী এবং সন্তানদের মুত্তাকি, উচ্চ নৈতিকতাসম্পন্ন করে গড়ে তুলতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করবেন। এ কাজের জন্য তিনি আল্লাহর কাছে দায়বদ্ধ। 'নিশ্চয় আল্লাহর পাকড়াও বড় শক্ত।' [সুরা বুরুজ : ১২]

একজন স্ত্রী হলেন তার সাহায্যকারী এবং অনুগত সহযোগী, যে তার কর্তৃত্বকে সম্মান করে এবং একটি আদর্শ মুসলিম পরিবার গঠনের যৌথ মিশনে তাকে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করে। স্বামী পরিবারের নেতৃত্ব দেবেন, এর জন্য তার কাঁধে অনেক কঠিন দায়িত্ব আসে। তাকে অবশ্যই স্ত্রী এবং সন্তানদের পুরোপুরি সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে, দ্বীনের মৌলিক শিক্ষা দিতে হবে এবং কোনো প্রকার অবহেলা না করে সবসময় তাদের প্রয়োজনে উপস্থিত থাকতে হবে। এগুলো একজন মুসলিম স্বামীর দায়িত্ব এবং একজন মুসলিম স্ত্রীর অধিকার। একজন মুসলিম স্ত্রীর দায়িত্ব এবং তাঁর স্বামীর অধিকার হলো তিনি একজন অনুগত সহযোগী হিসেবে তাঁর সঙ্গীকে খুশি করতে স্বামীর অনুপস্থিতিতে নিজের বাড়ি, সন্তান এবং নিজেকে রক্ষা করতে সচেষ্ট হবেন। এটি আল্লাহর মহত্ত্বের একটি উদাহরণ। এটি এমন এক কার্যকর শ্রম বিভাজন যেখানে নারী পুরুষ তাদের সহজাত শক্তিকে পুঁজি করে যথাযথ ভূমিকা পালন করে।

আমরা সাধারণ দৃষ্টিতে যদি দেখি, তাহলেও দেখা যায় ঐশী ইসলামি জীবনব্যবস্থা ধ্বজভঙ্গ নারীবাদের চেয়ে কতটা সুন্দর, কতটা যৌক্তিক।

বিলু আরও বলেছেন—

> 'আমি রেস্তোরাঁর সে লোকটিকে এসব বলিনি, কিন্তু এখানে বলছি। আমি আশা রাখি যে, যারা তাদের মেয়েদেরকে কর্মী এবং নেত্রী হিসেবে গড়ে তুলছেন তারা লেখাটি পড়বেন। কিন্তু তাতে থেমে গেলে হবে না। একদম ময়দানে লড়াই করে চলা নারীদেরকে বিকশিত, সমুন্নত, সমর্থন করতে আপনার ছেলেদেরকেও শিক্ষা দিন। আমরা আমাদের পরিবার এবং সম্প্রদায়কে বাদ দিয়ে পরিবর্তন আনতে পারব না।'

কী? মুসলিমরা তাদের মেয়েদেরকে কেন নারীবাদী কর্মী হিসেবে গড়ে তুলবে? এটাই কেন আদর্শ হবে তাদের জন্য? ইসলাম কীভাবে এসবে উৎসাহিত করে? একজন নারীর তাঁর ক্যারিয়ারের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত আসক্তি কীভাবে ইসলামি হয় যেখানে নারীকে প্রায়ই দেশে-বিদেশে ভ্রমণ করতে হয় মাহরাম ছাড়া বাড়িতে না থেকে পরিবার থেকে দূরে থাকতে হয়, অন্যান্য পুরুষ সহকর্মীর সাথে মিছিলের সামনে দাঁড়িয়ে চিৎকার করতে হয়? তারা যতই অপছন্দ করুক, একজন মুসলিম হিসেবে আমাকে আপনাকে বিষয়টি তুলে ধরতেই হবে।

আমাদের এসব ভুল, সস্তা রেফারেন্স দেখিও না

মিথ্যা এবং ভুল রেফারেন্স দেখানো যেন আজকাল মুসলিম নারীবাদীদের একটি অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। তারা প্রায়ই সাহাবিদের উদাহরণ টেনে এনে নিজেদের ভ্রান্ত কাজগুলোকে বৈধ করার চেষ্টা করে। বিলু লিখেছেন, "আমাকে উৎসাহিত করেছেন উম্মুল মুমিনিনরা, রাসুলের স্ত্রীরা, মুসলিম নারীবাদী আন্দোলনের নেত্রীবৃন্দ এবং কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করে টিকে থাকা বোনেরা। তাদেরকে সুরক্ষা দেওয়া, সমর্থন করা, সমুন্নত করা এবং ভালোবাসা আমাদের ঈমানের অংশ। মুসলিম পুরুষ এবং তাদের ছেলেদেরও এ ব্যাপারে শিক্ষা দেওয়া উচিত।"

দয়া করে কোনো সাহাবিয়্যাতকে এসব জগাখিচুড়ির মধ্যে টেনে আনবেন না। রাসুলের সময়ে কোনো মুসলিম পুরুষ কি এমন কোনো নারীকে বিয়ে করেছিলেন যিনি দীর্ঘ সময় ধরে বাইরে কাজ করতেন? কিংবা যিনি রাস্তায় মিছিলে সরব ছিলেন এবং ইসলামে নারী পুরুষের ভূমিকা নিজের মতো ব্যাখ্যা করতেন?

বিলু যেভাবে রাসুলের স্ত্রীদের নারীবাদী 'কর্মী' এবং 'নেত্রী' হিসেবে আখ্যা দিয়েছে এভাবে তাদের সম্পর্কে বলা অন্যায়, গুনাহ। রাসুল এবং সাহাবিদের প্রজন্মই যেন নারীবাদ ও লিবারেলিজমের জন্ম দিয়েছে। এসব বানোয়াট, ভ্রান্ত ও কুফরি মতাদর্শ ইসলামের ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ প্রজন্মের ওপর চাপিয়ে দেওয়াটা চরম অন্যায় ও ভণ্ডামি।

উম্মুল মুমিনিনরা কি তাদের পরিবার ছেড়ে মাহরাম ছাড়া একা একা কোনো নারী পুরুষের সম্মিলিত সমাবেশে যোগ দিয়ে নারী স্বাধীনতার পক্ষে জ্বালাময়ী বক্তব্য দিয়েছিলেন? পর্দার বিধান নাজিলের পর কি তাদের কেউ যুদ্ধের প্রথম কাতারে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন?

সবগুলো প্রশ্নের উত্তরই হলো 'না'।

আমরা জেনে না জেনে আধুনিক পশ্চিমা নারীবাদীদের দ্বারা অনেক বেশি প্রভাবিত হই। ঐতিহাসিকভাবে মুসলিম নারীরা অধিকাংশই 'মা' এবং 'স্ত্রী' ছিলেন। এ সত্যটাকে যেন আমরা মানতেই চাই না। তাঁরা কেউই নারীবাদী 'নেত্রী', 'কর্মী', 'প্রতিবাদী প্রগতিশীল ছিলেন না। না তাঁদের অধিকাংশই কোনো স্কলার ছিলেন, না ছিল 'নারী স্কলার' কোটা পূরণ করার মতো কোনো সংস্কার।

সত্যি বলতে, খাদিজা রা. একটি ব্যবসার প্রধান নির্বাহী ছিলেন (Fortune 500 CEO), কীভাবে আয়েশা রা.-ও পুরুষদের শিক্ষক হয়েছিলেন—এসব শুনতে শুনতে আমি ক্লান্ত।[১৯৭]

নিঃসন্দেহে খাদিজা রা. একজন ধনী নারী ছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁর সম্পদ মৃত স্বামীর কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিলেন। তিনি নিজে ব্যবসা করেননি বা সশরীরে কোথাও ব্যবসা পরিচালনার জন্যও যাননি। বরং এ কাজে তিনি স্টাফ নিযুক্ত করেছিলেন। বিয়ের পরে তিনি রাসুলের সেবাযত্ন, তাঁর কাজের সমর্থনে পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তিনি স্বামী, ছয় সন্তান-সহ একটা সুন্দর, আদর্শ পরিবার গড়ে তুলেছিলেন। নবুয়তের আগে এবং পরে, পুরোটা সময় ধরেই তিনি ছিলেন রাসুলের একনিষ্ঠ, সবচেয়ে বিশ্বস্ত সহযোগী এবং সমর্থক। তিনি নিজ হাতে খাবার রান্না করে এত উঁচু পাহাড় বেয়ে হেরা গুহায় রাসুলকে দিয়ে আসতেন এরপরও কিনা আপনি তাঁকে 'পুরুষতন্ত্রবিরোধী নারীবাদী' দাবি করেন? আজকের কোনো নারী ব্যবসায়ীর সাথে খাদিজা রা.-এর এ চেহারা ঠিক মেলে না।

নিঃসন্দেহে আয়েশা রা.-এর অগাধ ইলম ছিল। তিনি প্রায় এক-তৃতীয়াংশ হাদিস বর্ণনা করেছেন, মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন। কিন্তু তা ছিল পুরোপুরি পর্দা পালন করে। হাদিস বর্ণনার সময় তিনি থাকতেন পর্দার অপর পাশে, কথা বলতেন নিজের কণ্ঠস্বর পরিবর্তন করে। অনেক সময়ই কথা বলার দায়িত্বে থাকতেন তাঁর

---

[১৯৭] রাসুল বলেন : "সর্বোত্তম মানুষ হচ্ছে আমার প্রজন্ম। এরপর তাদের পরে যারা। এরপর তাদের পরে যারা। অতঃপর এমন কওম আসবে যাদের সাক্ষ্য হলফের পেছনে হলফ সাক্ষ্যের পেছনে ছোটাছুটি করবে।" *সহিহ বুখারি* : ৩৬৫১; *সহিহ মুসলিম* : ২৫৩৩। অর্থাৎ, সাহাবা, তাবেয়ি ও তাবে তাবেয়িদের যুগ।

ভাতিজা।

আজকের মুসলিম নারীবাদী কর্মী এবং প্রচারকরা 'স্বাধীন, ক্ষমতাবান, শক্তিশালী মুসলিমাহ'র নামে যে মানসিকতা লালন করে, সাহাবিয়্যাতরা নিজেদেরকে এমন জায়গায় কল্পনাও করতে পারতেন না। আর তাদের জীবন ও কর্মের সাথে এদের জীবন ও কর্মের কোনোপ্রকার মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। নিজেদের প্রবৃত্তির চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষাকে যখন তখন শারিআহ বলে চালিয়ে দেওয়ার প্রবণতা একেবারেই ভালো নয়।

রাসুলের এ অন্যান্য স্ত্রীদের বেশিরভাগেরই তেমন কোনো সম্পদ ছিল না, প্রাতিষ্ঠানিক কোনো শিক্ষাও ছিল না। ইবাদাতের বাইরে বেশিরভাগ সময়ই তাঁরা রাসুল এবং তাঁর মেহমানদের জন্য রান্না করতেন, বাচ্চাদের দেখাশোনা করতেন এবং গৃহস্থালির কাজকর্ম সামলাতেন। তাঁরা কি উম্মুল মুমিনিনদের অন্তর্ভুক্ত নন? এমনও তো নয় যে আয়েশা রা. গৃহস্থালি কাজ করেননি কিংবা রাসুলের দেখাশোনা করেননি।

এসব নারীবাদীরা কেন মারইয়াম আ.-এর কথা বলে না?

মারইয়াম আ. ছিলেন ঈসা আ.-এর মা। সমগ্র নারীজাতির মধ্যে সবচেয়ে ধার্মিক ছিলেন তিনি। তিনিই একমাত্র নারী যার নাম কুরআনে এসেছে। সুরা আলে ইমরানে আল্লাহ তাআলা বলেন,

> 'এবং যখন ফেরেশতারা বলেছিল, হে মারইয়াম, নিশ্চয় আল্লাহ আপনাকে মনোনীত করেছেন এবং আপনাকে পবিত্র করেছেন এবং আপনাকে বিশ্বের সকল নারীর ওপরে সম্মানিত করেছেন।' [সুরা আলে ইমরান ৪২]

তিনি হলেন সমগ্র নারীজাতির জন্য আদর্শ। ইয়াকিন এবং ইবাদতের বাইরে তাঁর এ মহান সম্মানের একমাত্র কারণ তাঁর মাতৃত্ব। ইসলামে নারীর সম্মান এবং গুরুত্বের মূল কেন্দ্র মাতৃত্ব। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কর্পোরেট কোম্পানিতে চাকরি করা, রাস্তায় রাস্তায় মিছিল করা এবং পরিবার অস্বীকার করার মধ্যে কোনো গৌরব নেই।

তাহলে কেন মুসলিম পুরুষরা তাদেরকে বিয়ে করতে বাধ্য?

পরিশেষে

আধুনিক পশ্চিমা সেক্যুলার-নারীবাদী প্যারাডাইমের ফলাফল হলো, ওপরে যা দেখে এসেছেন তাই। মুসলিম নারীবাদী ও সামাজিক ন্যায়বিচারের ধ্বজাধারী কর্মীরা সবাইকে জোর করে বিশ্বাস করাতে চায় যে, নারী এবং পুরুষরা সকল দিক

থেকেই একই। একসময় তারা বলত, কোনো লিঙ্গের স্বতন্ত্র কোনো ভূমিকা নেই। এখন তারা বলছে, লিঙ্গ বলেই কিছু নেই। সবই নাকি পুরুষতন্ত্রের সৃষ্টি। যুগে যুগে মানবসভ্যতার কেন্দ্র হিসেবে দেখা হয়েছে পরিবারকে। নারীবাদীরা এ পরিবারকেই মনে করে জুলুমের শিকল এবং ধর্ষণের ষড়যন্ত্র। তাদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো যারা, তারাও পরিবারকে অপ্রয়োজনীয় মনে করে। স্ত্রীর ভূমিকা পালন করাকে তারা বলছে, 'ঘরোয়া ন্যাকামি'। মাতৃত্ব কেবল দয়া ও সহানুভূতির নাম 'আসল কাজের' ধারেকাছেও নেই মাতৃত্বের কাজ। আসল কাজ হলো কেবল সেই কাজ, প্রতিমাসে দুইবার পে চেক আসে যেটা করলে।

এটা ইসলাম নয়। শ্রেষ্ঠ তিন প্রজন্মের কোনো নারী ইসলামকে এভাবে দেখেননি।[১৯৮]

[১৯৮]Muslim Skeptic এ প্রকাশিত উম্মে খালিদের লেখা *Muslim Activists Push Toxic Feminism: The War Against Motherhood* এর অনুবাদ।

বাংলাদেশে বাল্যবিবাহ

আমাদেরকে বিয়ের কন্যাদের এমন করুণ ছবি দেখানোর দরকার নেই।—ওয়াশিংটন পোস্ট![১৯৯]

বাংলাদেশের মতো দেশের বাল্যবিবাহের সাথে আমেরিকা বা পশ্চিমা ইউরোপের বিয়েকে মিলিয়ে লাভ নেই। সেখানে মানুষ গড়ে ২৭-৩৫ বয়সের মধ্যে বিয়ে করে। এদের মধ্যকার তুলনা আপেল ও কমলার তুলনার মতো। ওয়াশিংটন পোস্ট দেখানোর চেষ্টা করেছে যে, বাংলাদেশে ১৪, ১৫ ও ১৬ বছরের ছোট ছোট বাচ্চা মেয়েদেরকে তাদের ইচ্ছার বাইরে জোর করে বিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সঠিক তুলনা হবে, পশ্চিমের ১৪-১৬ বছর মেয়েদের সাথে। পিয়ার প্রেসার (বন্ধুবান্ধবের প্রভাব), পপ কালচার, ফ্যাশন, যৌনশিক্ষা ইত্যাদির প্রভাব পশ্চিমের এ বয়েসী অসংখ্য মেয়ে যৌনায়িত হয়, যৌনাচারে লিপ্ত হয়। 'সেক্সটিং'[২০০] সংস্কৃতির প্রভাব দেখুন। ইন্টারনেট, সেল ফোন প্রযুক্তি পশ্চিমের শিশু কিশোরদের যৌনতাকে নাটকীয়ভাবে বদলে দিয়েছে।

১২-১৩ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের যৌনাচারে লিপ্ত হওয়া পশ্চিমে অনেক বেশি স্বাভাবিক। পশ্চিমে একে কোনো সমস্যা হিসেবেই দেখা হয় না। সংযম শিক্ষা দেওয়ার বদলে প্রাইমারি স্কুল থেকে হাইস্কুলে বাচ্চাদের 'নিরাপদ সঙ্গম' শেখানো হয়। ১৮ বছরের নিচে দুজন টিন এজার যদি যথাযথ নিরাপত্তা বিধি অনুসরণ করে সঙ্গমে লিপ্ত হয়, যদি স্ন্যাপচ্যাটে নিজেদের মধ্যেই নিজেদের উলঙ্গ ছবি ঘোরাফেরা করে তাহলেও কোনো সমস্যা নেই। এ কাজ কেবল টিন এজারদের মধ্যে হলেই হবে। বরং এটা নাকি স্বাস্থ্যকর। এভাবেই নাকি মুক্ত-স্বাধীন হওয়া যায়। এখানে বাবা-মা থেকে শুরু করে স্কুল, সমাজ সব এমনই হতে উৎসাহিত করে টিন এজারদেরকে। কিন্তু সুদূর বাংলাদেশে ১৫ বছর বয়েসী কেউ বিয়ে করে, তাতে

---

[১৯৯] ওয়াশিংটন পোস্টের মূল রিপোর্ট: https://www.washingtonpost.com/news/morning-mix/wp/2015/08/28/the-saddest-bride-i-have-ever-seen-child-marrige-is-as-popular-as-ever-in-bangladesh/

[২০০] Sexting (Sex Texting) মানে হলো চ্যাটে যৌন উত্তেজনাপূর্ণ কথা বলা, নিজেদের যৌন আবেদনময়ী ছবি, ভিডিও একে অপরের সাথে শেয়ার করা। অবিবাহিত অবস্থায় প্রেম বা তথাকথিত বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে এ ধরনের ঘটনা ঘটে। তবে টিএইজ বাচ্চাদের মধ্যে এ আচরণ প্র হয়ে উঠেছে।—অনুবাদক।

ওয়াশিংটন পোস্টের খুব কষ্ট হয়। এটা নাকি একজন মেয়ের সম্মানের ওপর নির্দয় আক্রমণ। অথচ টিন এজার বালিকাদের যৌন সক্ষমতা এখানে কোনো সমস্যা বলে মনে হচ্ছে না।

কম বয়সে বিয়ে করার কারণে যদি শিক্ষার ক্ষতি হবে আশঙ্কা করা হয়, সে ক্ষেত্রেও আমরা পশ্চিমা তরুণীদের উদাহরণ আনতে পারি। তারা ঠিক কতটা পড়ালেখা করে? পশ্চিমের সমাজ সম্পর্কে ন্যূনতম ধারণা আছে এমন যে-কেউই স্বীকার করবে, এখানের তরুণ-তরুণীরা এক অদ্ভুত সংস্কৃতির সাথে জড়িয়ে আছে। তাদের প্রায় সারাটা দিন যায় ডেটিং, ঘোরাঘুরি, সেক্সটিং, প্রেম[২০১] ইত্যাদি করে। তখন কারও মনে হয় না এতে পড়ালেখা ও ক্যারিয়ারের ক্ষতি হচ্ছে।

শেষমেশ আপনি যদি তাদের সম্মতির ব্যাপারে আপত্তি তোলেন, আপনার যদি মনে হয় এমন বিয়েতে তাদের সম্মতি থাকে না, আমি বলব এটি পুরোটাই প্রেক্ষাপট ও দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপার। আমি বাই ডিফল্ট ধরে নেবো না যে, এ বয়েসী কোনো মেয়েই বিয়ে করতে চায় না। স্কুল কলেজে প্রেম করে বেড়ানো অনেক মেয়েই কিংবা জীবনসঙ্গীর সাহচর্য পেতে চায়। কিন্তু নৈতিকতা, সমাজ তাকে বাধা দিচ্ছে। এমন অনেকেই আছে যাদের বিয়ে দিলে তারা খুশিই হবে। তাদের বয়স ১২-১৬ বছরই। কিন্তু এগুলো কেউ তুলে আনে না। বাংলাদেশের মতো অনেক দেশেই স্যাটেলাইট টিভি বা ইন্টারনেটের কারণে সামাজিকভাবে পশ্চিমা সংস্কৃতি গ্রহণযোগ্য হয়ে যাচ্ছে। সেখানকার টিন এজাররা পশ্চিমা টিন এজারদের মতোই ক্যাজুয়াল ডেটিং করছে, গার্লফ্রেন্ড-বয়ফ্রেন্ড সম্পর্কে জড়িয়ে যাচ্ছে, এমন অনেক কিছু। এগুলোকে যদি কেউ উন্মাদ আনন্দ, ‘স্বাধীনতা’ নামক ফালতু ধারণার সাথে জড়িয়ে ফেলে তাহলে কিছু করার নেই। কিন্তু এ বিষয়টিকে বাদ দিলে, আমরা যদি তাদের কাজকে হিসেব করি, তাহলে কম বয়সে বিয়েতে সমস্যা কোথায়? ঠিক কী কারণে একই কাজ পশ্চিমা নিয়মে করলে উন্নত, সভ্য? ক্যাজুয়েল সেক্সের[২০২] সংস্কৃতি খুব ভয়াবহভাবে ছড়িয়ে যাচ্ছে মুসলিম বিশ্বের টিন এজারদের মধ্যে। এ কারণে মুসলিম পরিবারগুলো আতঙ্কিত হয়ে তাদের সন্তানদেরকে দ্রুত বিয়ে দিয়ে দিচ্ছে। আগে হয়তো পড়াশোনাকে বেশি গুরুত্ব দিত বাবা-মা ও সন্তান উভয়েই। দিনকে দিন দুদিকেই তা কমছে।

---

[২০১] হাইস্কুল ছাত্রছাত্রীদের নাচের অনুষ্ঠানকে Prom বলা হয়।–অনুবাদক।

[২০২] খুব বেশি চেনাজানা নেই, কোনো প্রকার সম্পর্ক নেই এমন যে কারও প্রস্তাবে তাঁর সাথে শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হওয়াকে Casual Sex বলে। এখানে সেক্স একটি সাধারণ আনন্দ, যেটা যে কারও থেকে পাওয়া যায়। বন্ধু, পরিচিত কিংবা অপরিচিত যে কেউ। ফ্রি সেক্সের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ধারণ করে এটা। এর মাধ্যমে যৌনতাকে আবেগ থেকে মুক্ত করে দেওয়া হয়, যে কারও জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়।–অনুবাদক।

সমস্যা হলো, বিষয়টি অনেক জটিল। ওয়াশিংটন পোস্ট নিজেদের একগুঁয়ে নীতির কারণে তৃতীয় বিশ্বের একটি উদাহরণ এথনোসেন্ট্রিক[২০৩] ও সরলভাবে উপস্থাপন করল, সাথে সাথে একটি প্রোপাগান্ডা যুক্ত করে দিলো—কন্যার করুণ চেহারার ছবি। এ রিপোর্টে কন্যার কোনো কথাই আসেনি বা অন্য কোনো কন্যার কোনো মন্তব্যও জানতে চাওয়া হয়নি। আমাদেরকে যাই দেখানো হয় তা পশ্চিমা ফটোগ্রাফারের দৃষ্টিভঙ্গি ও আদর্শিক চেতনায় সেন্সর হয়ে আসে।

পরিষ্কার করে বলে রাখা ভালো, আমি বাংলাদেশ কিংবা তেমন দেশগুলোতে বিয়ের সব সংস্কৃতিকে সমর্থন করি না। যেমন, জোর করে কোনো মেয়েকে বিয়ে দেওয়া ইসলামের সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক। আমার লেখার উদ্দেশ্য হলো, পশ্চিমা মিডিয়ার ভণ্ডামি, ডাবল স্ট্যান্ডার্ড এবং স্টেরিওটাইপিংকে তুলে ধরা। আর এসব করার অন্যতম কারণ নিজেদের সংস্কৃতিকে বড় মনে করা এবং মুসলিম সংস্কৃতিকে নীচু মনে করা।[২০৪]

---

[২০৩] Ethnocentric মানে হলো নিজের সংস্কৃতির কিছু ধারণাকে কেন্দ্র করে অন্য সকল সংস্কৃতিকে বিচার করা। এ ক্ষেত্রে বেশিরভাগ সময়ই নিজের সংস্কৃতিকে সেরা বলে গণ্য করা হয়।—অনুবাদক।

[২০৪] দাঈ, লেখক এবং আলাসনা ইন্সটিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা ড্যানিয়েল হাক্কিকাতজুর নিজস্ব ওয়েবসাইটে প্রকাশিত *Child Marriage in Bangladesh* এর রূপান্তর।

আমাদের নারীরা : উম্মাহর প্রাণ

আল্লাহ এমনি এমনি আমাদেরকে মুসা আ. ও ফিরাউনের সংঘাতের কথা বলেননি। উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ তুলে ধরেছেন সংঘাতের স্বরূপ,

> 'আর আমি চাইলাম সেই দেশে যাদেরকে দুর্বল করে রাখা হয়েছিল তাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে এবং তাদেরকে নেতা বানাতে, আর তাদেরকে উত্তরাধিকারী বানাতে।' (সুরা আল-কাসাস : ৫)

এ শক্তির হাতবদল আল্লাহ শুরু করেছেন একজন নারীর হাতে,

> 'আর আমি মুসার মায়ের প্রতি নির্দেশ পাঠালাম, 'তুমি তাকে দুধ পান করাও। অতঃপর যখন তুমি তার ব্যাপারে আশঙ্কা করবে, তখন তাকে দরিয়ায় নিক্ষেপ করবে। আর তুমি ভয় করবে না এবং চিন্তা করবে না। নিশ্চয় আমি তাকে তোমার কাছে ফিরিয়ে দেবো এবং তাকে রাসুলদের অন্তর্ভুক্ত করব'।' (সুরা আল-কাসাস : ৭)

ইসলামের শত্রুদের সাথে আমাদের যুদ্ধের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হলো—নারী। জয় বা পরাজয় আসে নারীদের হাত ধরেই। এসব শুধু বক্তব্য আর কবিতাই নয়; বরং এক কঠিন বাস্তবতা। আমাদের অবশ্যই এদিকে গভীর মনোযোগ দিতে হবে।

এই শ্রেষ্ঠ উম্মাহ, শ্রেষ্ঠ জাতির পুরুষরা কোথায়? তাদের অনেকেই জেলে, অনেককে দেশ থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে, অনেকে সংগ্রাম করে যাচ্ছে। কে তাদের পরিবারকে রক্ষা করে, সন্তানদেরকে লালনপালন করে এবং জাতি গঠন করে? নারীরাই এর মূল কারিগর। সকল প্রশংসা আল্লাহর, নারীদের মাঝে অল্পকিছু খুঁত ও সমস্যার উপস্থিতি থাকা সত্ত্বেও নারীদের পক্ষ থেকে ইসলামের দাওয়াহ আজ অবধি ভালোভাবেই সফল।

আমাদের নারীরা দ্বীন থেকে সরে যাচ্ছে। আমাদের সমাজ যখন নারীদের ওপর বিভিন্ন ধরনের সীমা আরোপ করে দিয়েছে, শরিআহর দেওয়া অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে, তখন থেকেই সংঘাত শুরু। উদাহরণস্বরূপ শিক্ষার অধিকার কেড়ে নেওয়া, সম্পদ থেকে বঞ্চিত করা, তাকে নীচু চোখে দেখা এবং তাঁর ওপর সকল

জাহিল বিষয়-আশয় চাপিয়ে দেওয়া ইত্যাদি। আর এসবের সুযোগ নিয়েছে লিবারেল জাহিলিয়াহ। তারা নিরীহ নারীদেরকে ব্যবহার করে স্বার্থ হাসিল করে নিয়েছে। এসব শয়তানরা নারীদেরকে মিউজিয়ামের শো পিচ কিংবা বাইজির মতো প্রদর্শনীর বস্তুতে পরিণত করে। তাই আমাদের মতো দাঈদের জন্য দুটো চ্যালেঞ্জ সামনে আসে—সামাজিক জাহিলিয়াহ ও লিবারেল জাহিলিয়াহ। দুটো জাহিলিয়াহ থেকেই আমাদের বোনদের বাঁচানো আমাদের দায়িত্ব। ইসলামই সঠিক পথ। আমাদের নারীদেরকে আমাদের সর্বোচ্চ সম্মান দিতে হবে, তাদেরকে উৎসাহ জোগাতে হবে, তাদের কাজের মূল্য দিতে হবে, শরিআহর সীমার মধ্যে থেকে তাদের শিক্ষা, কাজকর্মের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে, তাঁর সম্পদ ও উত্তরাধিকারের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। এভাবেই নারীমুক্তি আসবে।

শয়তানের রাস্তাকে রুদ্ধ করে দিতে হবে। সে কেবল বিয়েতে বেশি মোহরানা না, যৌতুক পর্যন্ত এনে দিয়েছে। আমাদেরকে ইসলামের স্লোগান তুলে ধরতে হবে। যৌতুককে পুরোপুরি ধ্বংস করে দিয়ে, মোহরানার ক্ষেত্রে কম মোহরানায় উৎসাহিত করতে হবে, "কম মোহরানা, বেশি বারাকাহ"। জিনার প্রসার হচ্ছে, নারী-পুরুষ পারস্পরিক বোঝাপড়া থাকা সত্ত্বেও সামাজিক এসব বাধার কারণে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারছে না। মোহরানা কমিয়ে এনে আমাদেরকে এসব অনাচারের রাস্তা বন্ধ করতে হবে। ভ্রান্ত সামাজিক কুপ্রথা থেকে বের হয়ে আসতে হবে। সামাজিক, বংশীয় অবস্থান একই থাকতেই হবে—বিষয়টি সত্য নয়। কুরাইশের মতো সম্ভ্রান্ত বংশের নারী যাইনাব বিনতে যাহাশের সাথে রাসুল ﷺ নিজ হাতে আজাদ দাস যায়েদ বিন হারিসের বিয়ে দিয়েছেন। অনেককেই দেখেছি, দরকার হলে মেয়েকে আইবুড়ো করে রাখবে, কিন্তু তারপরও অন্য বংশ, দেশ হলে বিয়ে দেবে না। আর একটু নিচে হলে তো কথাই নেই। এদেরকে শরিআহর ভাষায় বলা হয়েছে, জালিম অভিভাবক। তারা শরিআহর সাথে সাংঘর্ষিক কাজ এবং বোকামির কারণে অভিভাবকত্ব হারায়।

নারীরাই উম্মাহর শক্তি। নারীদের স্বল্পতাই আমাদের পরাজয়। নারীদের প্রতি আমাদের গভীর মনোযোগ দিতে হবে, তাদের খেয়াল রাখতে হবে। আমরা এ পথের পুরুষদেরকে পরাজিত হতে দেখেছি, কিন্তু আমাদের বোনরা কখনো পরাজিত হননি। তাদের মধ্যে আমরা প্রবল ধৈর্য, কঠিন ইখলাস, ঈমান এবং স্থিরতা দেখেছি। ফিলিস্তিনের মা-বোনরা তো আল্লাহর মিরাকল। তাদের অনেকের সংগ্রাম, ধৈর্য, দৃঢ়তা শত মুজাহিদের চেয়েও বেশি। আরব উপদ্বীপেও আমরা এমন অনেক নারী দেখেছি। তারা পুরুষের চেয়ে বেশি শক্তিশালী, জিহাদ ও মুজাহিদদেরকে সাহায্য করার ক্ষেত্রে অনেক পুরুষকেও তারা লজ্জায় ফেলে দিয়েছেন। সকল প্রশংসা মহামহিম আল্লাহর। পশ্চিমেও অনেক অনারব ভাইয়ের

স্ত্রীদের মাঝে আমরা পাহাড়সম ঈমান দেখেছি। তাদের মতো ঈমান পশ্চিমের বেশিরভাগ ভাইদের মধ্যে দেখিনি। আরব শরণার্থীদের মধ্যে নারীদের ঈমান, ইখলাসের আধিক্য খুবই সাধারণ। বোনরা আমাদের কাছে এসে অভিযোগ করেন যেন আমরা তাদের স্বামীকে আরও বেশি আমল করতে বলি। তারা যে তাদের পরিবারের ঈমান-আমল নিয়ে এত বেশি সচেতন, এটাই তাদের ঈমানের প্রমাণ। তারা আল্লাহর কাছে নিঃসন্দেহে অনেক পুরুষের চেয়েও বেশি সম্মানিত।

পশ্চিমা শয়তানরা পর্দানশীন নারীর অবস্থান ও পর্দা নিয়ে যে পরিমাণ উঠেপড়ে লেগেছে, সেটাই আমাদেরকে বুঝিয়ে দেয় তারা আসলে কী নিয়ে বেশি ভীত। উম্মাহর নারীদেরকে তারা যদি শেষ করে দিতে পারে, তাহলে উম্মাহ শেষ হয়ে যাবে। ফ্রান্স এত সমস্যা থাকতে হিজাব নিয়েই কেন উঠেপড়ে লাগল, এত অনাচার থাকতে কেন হিজাবই তাদের নিষিদ্ধ করা লাগল তার কারণ সহজেই বোঝা যাচ্ছে। অনেক দেশ করেছে, খুব শীঘ্রই অনেক পশ্চিমা দেশ ফ্রান্সের দেখানো পথেই হাঁটবে। তারা কোটি কোটি ডলার খরচ করে দিনের পর দিন রিসার্চ করে কীভাবে পরিবারপ্রথা ভেঙে দেওয়া যায়, মুসলিম নারীকে 'উদার' বানিয়ে প্রদর্শনীর বস্তু বানানো যায়, ঈমান কেড়ে নেওয়া যায়। বোঝাই যাচ্ছে, নারী ইসলামের শেষ দুর্গ, শক্তিশালী কেল্লা। এ যুদ্ধ এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই।

আমাদের নারীদেরকে শিক্ষিত হতে হবে। শিক্ষাই নারীকে পরাজয়ের হাত থেকে রক্ষা করবে। অশিক্ষিত নারী নিজেই নিজের শত্রু। সে তাঁর স্বামী, ঘর ও সমাজের জন্য ক্ষতিকর। আমাদেরকে তাদের অধিকার সংরক্ষণ করতে হবে। দাঈ, আলিম ও মুমিনদের দায়িত্ব হলো সামাজিক কুপ্রথা থেকে শরিআহর বিষয়গুলোকে আলাদা করে মানুষকে বোঝানো। সামাজিক কুপ্রথাই লিবারেল জাহিলিয়াহর হাতিয়ার। এটা ব্যবহার করেই তারা নারীদেরকে টেনে নিয়ে যায় তাদের মিশমিশে অন্ধকারে।

আমাদের সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা, ভালোবাসা এবং প্রশংসা আমাদের মুমিনা মা, বোন ও কণ্যাদের জন্য। আমাদের ধৈর্যশীলা স্ত্রীদের জন্য আমাদের অনেক ভালোবাসা, দোয়া এবং কৃতজ্ঞতা। তারা বাদে আমরা কিছুই না, আমাদের সন্তানদের কোনো ভবিষ্যৎ নেই তাদেরকে ছাড়া, তাদের অগ্রসরমান পদচারণা ছাড়া আমরা পরাজিত।[২০৫]

---

[২০৫] Kalamullah.com এ প্রকাশিত শাইখ আবু কাতাদাহর '*Our Women: The Essence of the Ummah*' প্রবন্ধটির বঙ্গানুবাদ।

তারা চার

ইসলামের ইতিহাসে প্রথম যিনি ঈমান এনেছিলেন তিনি হলেন খাদিজা রা.। তিনিই ছিলেন প্রথম মুমিন। ইবনে কাসির রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'যদি দুটি বিষয় এক করে দেখা হয় তাহলে বোঝা যায়, খাদিজা রা. ছিলেন এই কাফিলার প্রথম অভিযাত্রী। তিনি ছিলেন পুরুষদের চেয়েও অগ্রগামী।' তিনি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর ওপর ঈমান আনা প্রথম মানুষ। খাদিজার রা. কোন গুণটি তাকে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছে? কেন তিনি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ চারজন মহিলার একজন? এটি কি তার ক্যারিয়ারের জন্য? নাকি তার ইলমের জন্য? আমাদের বোনদের বিষয়টি নিয়ে বিশেষভাবে ভেবে দেখা উচিত।

মারইয়াম আ., আসিয়া আ., ফাতিমা রা.—এ চারজন নারীর মধ্যে আমরা সাধারণ যে বৈশিষ্ট্য দেখি তার মধ্যে প্রথমটি হলো, তারা প্রত্যেকেই দৃঢ় ঈমানের অধিকারী ছিলেন। তাদের আল্লাহর ওপর আস্থা ছিল খুবই শক্তিশালী। আল্লাহর প্রতি তাদের বিশ্বাস ইয়াকিনের পর্যায়ে চলে গিয়েছিল। ইয়াকিন হলো ঈমানের এমন পর্যায় যেখানে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। পৃথিবীতে এমন কিছু নেই যা তাদের ঈমানকে টলাতে পারে। এটি এমন অবস্থা যখন মানুষ যা দেখে বা শোনে তার চেয়েও বেশি সে আল্লাহকে বিশ্বাস করে। বিষয়টি এমন যে আপনি সালাতে আপনার সামনে আল্লাহকে দেখছেন কিন্তু তিনি সেখানে নেই। চারজনই সে পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিলেন।

আমরা যেকোনো একজনের কথাই বলি। ধরুন আসিয়া রা.। তিনি ছিলেন ফিরআউনের স্ত্রী। একজন নারী চাইতে পারে এমন সবকিছু উনার সামনে ছিল। একজন দুনিয়াদার নারী অনেক সম্পদ, বিলাসী জীবন, ক্ষমতাবান স্বামী, দাস-দাসী চাইতে পারে। এমন সবকিছুই তাঁর ছিল। কিন্তু আসিয়া রা. সবকিছুই আল্লাহর জন্য ছেড়ে দিয়েছিলেন। আল্লাহ তাকে এমন একটি প্রাসাদে রেখেছিলেন পার্থিব দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর চেয়ে বিলাসী আর কিছুই ছিল না। কিন্তু তিনি আল্লাহকে বললেন,

'আল্লাহ, আমি জান্নাতে তোমার পাশে একটি বাড়ি চাই।'

[সুরা আত-তাহরিম : ১১]

আল্লাহ তাকে সম্পদ, ক্ষমতাবান স্বামী সব দিয়েছেন। কিন্তু নাহ! তিনি এসবকে পায়ে ঠেলেছেন। বরং তিনি সেই স্বামী থেকেই আশ্রয় চেয়েছেন,

'হে আল্লাহ, আমাকে ফিরআউনের কর্মকাণ্ড থেকে হিফাজত করুন।'

[সুরা আত-তাহরিম : ১১]

তাঁর এমন ত্যাগ ও আল্লাহর প্রতি এমন আস্থাই তার ইয়াকিন প্রকাশ করে। খেয়াল করুন, আসিয়া আ. কিন্তু খুবই খারাপ ও জঘন্য পরিবেশে থাকতেন। তার চারদিকেই ছিল সবাই কাফির ও জালিম। এতকিছু সত্ত্বেও তিনি তাঁর অন্তর আল্লাহর সাথে জুড়ে দিয়েছিলেন। এটিও শক্তিশালী ঈমানের লক্ষণ। অবস্থা যাই হোক, আপনিই বিজয়ী হবেন। আল্লাহ আপনার প্রতি সৎ থাকবেন। বাকিদের ব্যাপারটাও এমন। সুতরাং তাদের প্রথম বৈশিষ্ট্য হলো তারা ইয়াকিনের পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিলেন।

দুই নম্বর যে বৈশিষ্ট্য আমরা দেখি তা হলো, তারা প্রত্যেকেই একজন ভালো মা ও একজন ভালো স্ত্রী ছিলেন।

নারীবাদী বা নারীবাদী চিন্তা লালনকারী বোনদের হয়তো এ কথাটি ভালো লাগবে না। কিন্তু বাস্তবতা এটাই। তারা কেউই তাদের ক্যারিয়ারের জন্য সমাদৃত ছিলেন না। তাদের মধ্যকার সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো তারা ভালো মা ও ভালো স্ত্রী ছিলেন। আসিয়া আ. ও মারিয়াম আ.—দুজনই দুজন রাসুলের অর্থাৎ মুসা আ. ও ঈসার আ. মা ছিলেন। খাদিজা রা. সম্মানিত হয়েছিলেন রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে সাহায্য করে। তিনি তাঁর ব্যবসার জন্য সমাদৃত হননি। বরং এ ব্যবসা তার কোনো কাজে আসেনি। তিনি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর একজন ভালো স্ত্রী ছিলেন। তিনি চরম দুরাবস্থায়ও রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে সাহায্য করে গিয়েছেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ সবসময় খাদিজা রা. কে পাশে পেয়েছেন।

ফাতিমাও রা. ছিলেন ব্যতিক্রমধর্মী স্ত্রী। একটা উদাহরণ দিই। আলী রা. শুনলেন যে রাসুল ﷺ বেশ কিছু দাস পেয়েছেন। তিনি ও ফাতিমা রা. মনস্থির করলেন, তারা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে যাবেন ও দাস চাইবেন। ফাতিমার রা. খুব কষ্ট হচ্ছিল ঘরের কাজ করতে। তো তারা আয়েশার রা. কাছে তাদের সমস্যা খুলে বললেন। ফাতিমাকে রা. খুব কঠিন পরিশ্রম করতে হতো। পানি তোলা, পেষণ-সহ অনেক কঠিন সব কাজ। পরবর্তী সময়ে আয়েশা রা. রাসুল ﷺ-কে জানানোর পর তিনি আলি রা.-এর বাসায় যান। আলি রা. হাদিসটি বর্ণনা করছেন। তিনি বললেন, "আমরা যখন ঘুমানোর জন্য বিছানায় গেলাম তখন রাসুল ﷺ এসে হাজির হলেন। আমরা তাকে দেখে ওঠে দাঁড়ালাম। কিন্তু রাসুল ﷺ বললেন, 'যেখানে আছ সেখানেই থাকো'। তারপর রাসুলুল্লাহ ﷺ আমাদের মাঝখানে এসে

বসলেন। তিনি আমাদের দুজনকেই স্পর্শ করে ছিলেন।

আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় যে রাসুল ﷺ ফাতিমাকে রা. এতই ভালোবাসতেন যে তিনি বলেছিলেন, 'ফাতিমা আমার অংশ। যা তাকে কষ্ট দেয় তা আমাকেও কষ্ট দেয়। যা তাকে আনন্দ দেয় তা আমাকেও আনন্দ দেয়।' ফাতিমা রা. ছিলেন রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর একমাত্র জীবিত সন্তান। তাই রাসুলুল্লাহ ﷺ চাইতেন উনার মেয়ে যেন সর্বোত্তম জীবন পায়, সবচেয়ে ভালো কিছুই অর্জন করে।

রাসুল ﷺ-এর কাছে দাস ছিল। কিন্তু তিনি কি দিয়েছিলেন? তিনি বললেন, 'আমার কাছে তোমার জন্য দাসের চেয়েও ভালো কিছু আছে। তুমি ঘুমাতে যাওয়ার আগে ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ, ৩৩ বার আল্লাহু আকবার পড়ে নাও। এটাই তোমার জন্য ভালো।' ফাতিমা রা. পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো মানুষটির সবচেয়ে ভালো কন্যা। রাসুল ﷺ জানতেন হাত খসখসে হয়ে যাওয়া পর্যন্ত ফাতিমা রা. ঘরের কাজ করতেন। তার হাতের চামড়া মোটা হয়ে গিয়েছিল। তা সত্ত্বেও রাসুল ﷺ বলেছেন, 'যা করছ তাই করতে থাকো।' তাকে দাসের বদলে আমল শিখিয়ে দিলেন।

আলি রা. পরবর্তী সময়ে বলেন, ফাতিমা রা. এত কঠোর পরিশ্রম করতেন যে হাত প্রায় ছিঁড়ে যাওয়ার অবস্থা হওয়া পর্যন্ত তিনি ময়দার চরকা ঘুরাতেন। ঘাড়ে দড়ির দাগ পড়া পর্যন্ত তিনি কুয়া থেকে পানি তুলতেন। পোশাক নোংরা হয়ে যাওয়া পর্যন্ত তিনি ঘর পরিষ্কার করতেন। চেহারায় ধোঁয়ার ছাপ ফেলা পর্যন্ত তিনি রান্না করতেন। ইনিই সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষটির মেয়ে। রাসুলুল্লাহ ﷺ জানতেন তাঁর কী অবস্থা। বিনিময়ে তিনি কী পেলেন? তিনি হয়ে উঠলেন পৃথিবীর ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ নারীদের একজন। জ্ঞানের মাপকাঠিতে আয়িশা রা. ছিলেন খাদিজা রা. ও ফাতিমা রা. থেকে অনেক ওপরে। কিন্তু তাও তিনি খাদিজা রা. ও ফাতিমার রা. সমকক্ষ হতে পারেননি।

বোনেরা! আপনাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবুন। আপনারা কোন বিষয়টিকে প্রাধান্য দেবেন ভেবে দেখুন। আপনাদেরকে অবশ্যই জ্ঞানার্জন করতে হবে। আমরা ইসলামি প্রতিক্রিয়াশীল হব না। কিন্তু আপনারা জেনে নিন, কোথায় আপনাদের সত্যিকার সম্মান। কোথায় আপনাদের পুরস্কার। সবাই সবার দায়িত্ব পালন করুন, সর্বোচ্চ জ্ঞানার্জন করুন। কিন্তু প্রাধান্যের জায়গাগুলোকে হারিয়ে ফেলবেন না। তাই আসুন সে পথেই হাঁটি যে পথে চলে গিয়েছেন খাদিজা রা., ফাতিমা রা., আসিয়া রা., মারইয়াম রা.। আল্লাহ তাদেরকে কবুল করুন। আমিন।[২০৬]

---

[২০৬] শাইখ আবু নাওয়ারের লেকচারের অংশবিশেষ।

!

বই সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন

বইটি

- ○ পড়া যেতে পারে
- ○ পড়ার অযোগ্য
- ○ পড়া প্রয়োজন

বইটি আপনার চিন্তা জগতে

- ○ কোনো পরিবর্তন আনেনি
- ○ হালকা পরিবর্তন এনেছে
- ○ আলোড়ন তুলেছে

নারীবাদের বাস্তবতা

- ○ আপনি আগে যা জানতেন তা-ই পুনরাবৃত্ত হয়েছে
- ○ কিছু নতুন তথ্য দিয়েছে
- ○ আপনার দৃষ্টিভঙ্গি আমূল পরিবর্তন করেছে

আপনার আশপাশের, পরিচিতজনদের বইটি

- ○ পড়া উচিত নয়
- ○ পড়া যেতে পারে
- ○ অবশ্যপাঠ্য

বইয়ের একটা রিভিউ

- ○ দেওয়া ভালো
- ○ দেওয়া উচিত
- ○ অবশ্যই দেওয়া প্রয়োজন

মারিয়াম তানহা

জন্মগ্রহণ করেছেন কুমিল্লায়। ফেনী গার্লস ক্যাডেট কলেজ থেকে এসএসসি ও এইচএসসি পাশ করে এখন চট্টগ্রাম প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় বর্ষে অধ্যয়নরত আছেন। মুসলিম নারীদের ফিতনা ও ব্যক্তিগত সমস্যাগুলো নিয়ে কাজ করা প্রয়োজন মনে করেন তিনি। স্বপ্ন দেখেন ইসলামি খিলাফতের অধীনে নারীদের পূর্ণাঙ্গ অধিকারের।

ফেমিনিজম। নারী অধিকারের চটকদার বুলিসর্বস্ব এই তথাকথিত মুভমেন্টের দাবিদাওয়াগুলো শুনতে মধুর হলেও এই নামের আড়ালেই রয়েছে জমাটবাঁধা অন্ধকার। এইসব অন্ধকারের পর্দা উন্মোচন করেছে এই বই। তথাকথিত নারী স্বাধীনতার নামে বিশ্বজুড়ে নারীদের নৈতিক অধঃপতন, নারীমুক্তির দেশে নারী নির্যাতনের নোংরা চেহারা, হিজাব নিয়ে পশ্চিমের বর্ণবাদী রাজনীতি, লিবারেলিজম কেন হিজাব-নিকাবে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, পুরুষতন্ত্রের মিথ্যা জুজুর ভয় দেখিয়ে ফেমিনিজমের ভিকটিম কার্ড খেল, পশ্চিমা সাহিত্য ও পপ কালচারে নারীবাদ ও ইসলামবিদ্বেষের ভয়াবহ রূপ, উত্তর ঔপনিবেশিক মুসলিম নারীবাদ, নারীবাদী ধর্মতত্ত্ব বা ইসলামি নারীবাদের নামে ইসলামের শাশ্বত চিন্তার ধারাবাহিকতায় নগ্ন হস্তক্ষেপ, লিঙ্গ ভারসাম্য বা লৈঙ্গিক সমতার নামে সৃষ্টিকর্তার চিরাচরিত নিয়মে ব্যাঘাত ঘটানো-সহ এ প্রসঙ্গের বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচিত হয়েছে এই বইয়ে। এসব আলোচনা মূলত বিশ্ববিখ্যাত স্কলারদের বইপত্র, প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও বক্তৃতা-বিবৃতি থেকে বেছে বেছে সংকলন করেছেন লেখিকা মারিয়াম তানহা।

www.fountain.pub